বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

weÁvb

Aóg †kÖwY

রচনা

প্রফেসর ড. শাহজাহান তপন

প্রফেসর ড. সফিউর রহমান

প্রফেসর এস এম হায়দার

প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহানআরা

ড. এস এম হাফিজুর রহমান

†gvnv¤§` b‡i আলম সিদ্দিকী

ড. মোঃ আব্দুল খালেক

গুল আনার আহমেদ

m¤úv`bv

অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান

RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯—K †evW©, XvKv

RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯—K †evW
69-70, gwZwSj ewYwR¨K GjvKv, XvKv-1000
KZK cKwkZ|

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : , ২০১২

cvV¨c¯ÍK **প্রণয়নে সমন্বয়ক**
মোঃ মোখলেসউর রহমান

Kw¤úDUvi K‡¤úvR
পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রা:) লি:

c”Q`
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
মশিউর রহমান অনির্বাণ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপ¯—ক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামল্যে বিতরণের জন্য

---

g`‡Y:

cm•M-K_v

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোতমুখী উন্নয়নের cekZ| আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার cwicY বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক ¯—‡i অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে D"PZi শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ ¯—‡ii শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত cUfwgi প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক ¯—‡ii শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক gj¨‡evwa থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃ ù Z প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য ev¯—evq‡b শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক ¯—‡ii cwq mKj cwV¨c¯—K। উক্ত cwV¨c¯—K প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও ce অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। cwV¨c¯—K¸‡jvi বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে gj¨vqb‡K সৃজনশীল করা হয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য n‡"Q প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা m¤ú‡K অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। gjZ এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে **বিজ্ঞান** শীর্ষক cwV¨c¯ÍKwU প্রণয়ন করা হয়েছে। cwV¨c¯ÍKwU শিক্ষার্থীদের নিকট আনন্দ দায়ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি হাতে কলমে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ দেওয়া হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে cwV¨c¯ÍKwU রচিত হয়েছে। কাজেই cwV¨c¯ÍKwUi আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো MVbgjK ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। cwV¨c¯ÍK প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে c¯ÍKwU রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে cwV¨c¯ÍKwU‡K আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

cwV¨c¯ÍKwU iPbv, m¤úv`bv, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। cwV¨c¯ÍKwU শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

c‡dmi †gvt †gv¯—dv Kvgvj Dwïb
†Pqvig¨vb
RvZxq wk¶vµg I cwV¨c¯—K †ewW, XvKv

mwPcÎ

Aa¨vq	Aa¨v‡qi wk‡ivbvg	cô v
c_g	cwYRM‡Zi †kwYweb¨vm	1-11
wØZxq	Rx‡ei বৃদ্ধি I eskMwZ	12-20
ZZxq	e¨vcb, AwfmeY I c‡¯^`b	21-30
PZ_	Dw™‡` esk বৃদ্ধি	31-40
cÂg	mgš^q I wbtmiY	41-49
lô	cigvYi MVb	50-59
সপ্তম	cw_ex I gnvKl	60-68
Aóg	ivmvqwbK weweµqv	69-79
beg	eZbx I Pjwe`¨r	80-88
`kg	A¤- ¶viK I jeY	89-99
GKv`k	Av‡jv	100-108
Øv`k	gnvKvk I DcMn	109-117
Î‡qv`k	Lv`¨ I cwó	118-134
PZ`k	cwi‡ek Ges ev¯‘তন্ত্র	135-142

প্রথম অধ্যায়

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

পৃথিবীতে অসংখ্য বিচিত্র ছোট বড় প্রাণী বাস করে। এদের মধ্যে রয়েছে নানা রকম মিল ও অমিল। এই বৈচিত্র্যময় cwYK‡j রয়েছে অণুবীক্ষণিক প্রাণী, অ্যামিবা থেকে শুরু করে বিশাল আকারের তিমি। প্রাণীর বিভিন্নতা নির্ভর করে পরিবেশের বৈচিত্র্যের উপর। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও বাসস্থানে প্রাণিবৈচিত্র্য ভিন্ন রকম হয়। বিশাল এই প্রাণিজগৎ m¤ú‡K জানা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সহজে সু-k•Lj fv‡e বিশাল প্রাণিজগৎকে জানার জন্য এর web¨¯ÍKiY প্রয়োজন, আর web¨¯Í করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে। শ্রেণিবিন্যাস প্রাণিজগৎকে জানার পথ সহজ করে দিয়েছে।

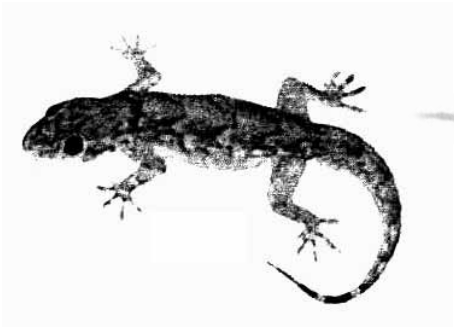

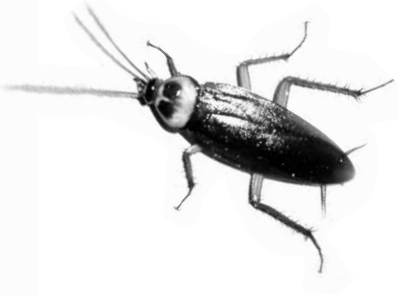

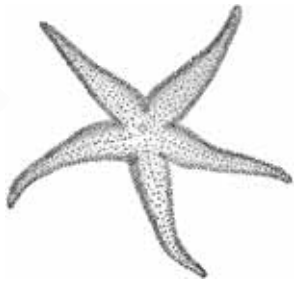

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব।
- মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব।
- জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১

তোমরা তোমাদের চারপাশের ছোট-বড় নানা বৈচিত্র্যcYপ্রাণী দেখতে পাও। তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণিতে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রাণিজগত m¤ú‡K নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর। তোমার দেখা প্রাণীগুলো দেখতে কী একই রকম? এদের সবগুলোরই কি মেরুদণ্ড আছে? এরা সবাই কি একই পরিবেশে বাস করে? এরা সবাই কি একই রকম খাবার খায়? এরা কি একই রকমভাবে চলাফেরা করে?

এবার তুমি নিচের উত্তরগুলোর সাথে তোমার চিন্তাকে মিলিয়ে নাও। আমাদের চারপাশে আমরা যে প্রাণীগুলোকে দেখি তারা সবগুলো দেখতে এক রকম হয় না। এদের দেহের আকৃতি, গঠন ও অন্যান্য জৈবিক কাজকর্মের প্রকৃতিও ভিন্ন। এদের কোনোটির মেরুদণ্ড আছে, আবার কোনোটির মেরুদণ্ড নেই। এদের কোনোটা মাটিতে, কোনোটা পানিতে, কোনোটা গাছে বাস করে। এদের খাদ্যও বিভিন্ন প্রকারের হয়। এরা বিভিন্ন অঙ্গ দিয়ে চলাফেরা (সিলিয়া, পা, উপাঙ্গ ইত্যাদি) করে, আবার কোনোটার চলনশক্তি নেই।

পৃথিবীতে এ রকম ^e‖PÎ¨cY প্রাণীর সংখ্যা আমাদের সঠিক জানা নেই। আজ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিপুল সংখ্যক প্রাণীর গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উপায় হলো শ্রেণিবিন্যাস। প্রাণিদেহে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে মিল, অমিল ও ci¯ú‡ii মধ্যে যে m¤úK রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। এদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন ¯Íi বা ধাপে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়। জীবজগৎকে এই ধাপে ধাপে ‖eb¨¯Í করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে। প্রয়োজনের তাগিদে বর্তমানে জীববিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা গড়ে উঠেছে। এর নাম শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যা।

প্রজাতি হলো শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে নিচের ধাপ বা একক। যেমন- মানুষ, কুনোব্যাঙ, কবুতর ইত্যাদি এক একটি প্রজাতি। কোনো প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করতে হলে সেই প্রাণীকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধাপে ধাপে সাজাতে হয়। এই সকল ধাপের প্রত্যেকটিকে যথাযথভাবে ‖eb¨¯Í করতে হয়।

শ্রেণিবিন্যাসের ইতিহাসে অ্যারিস্টটল, জন রে ও ক্যারোলাস লিনিয়াসের নাম উলেখযোগ্য। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াসকে শ্রেণিবিন্যাসের জনক বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম প্রজাতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন এবং দ্বিপদ বা দুই অংশ বিশিষ্ট নামকরণ প্রথা প্রবর্তন করেন। একটি প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম দুই অংশ বা পদবিশিষ্ট হয়। এই নামকরণকে দ্বিপদ নামকরণ বা বৈজ্ঞানিক নামকরণ বলে। যেমন- মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম - *Homo sapians.* বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটিন অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখতে হয়।

এবার তুমি তোমার নিজের খাতায় নিচের ছকটি আঁক। এবার ছকটি ciY কর।

প্রাণীর নাম	বাসস্থান	গঠন	উপকারিতা	অপকারিতা
বানর				
কেঁচো				
ঝিনুক				
পাখি				
মাছ				

নতুন শব্দ- শ্রেণিকরণ বিদ্যা, দ্বি-পদ নামকরণ, প্রজাতি।

পাঠ ২-৫

প্রাণিজগৎকে কিংডম বলা হয়। বর্তমানে আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসে প্রোটোজোয়া প্রাণীদের আলাদা উপজগৎ (Sub kingdom)-এ ভাগ করা হয়। অন্যান্য প্রাণীদেরকে অ্যানিম্যালিয়া (Animalia) জগতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অ্যানিম্যালিয়া জগতকে নয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে।

১। পর্ব - পরিফেরা (Porifera)

স্বভাব ও বাসস্থান : পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা সাধারণভাবে ¯úÄ নামে পরিচিত। পৃথিবীর সর্বত্রই এদের পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। তবে কিছু কিছু প্রাণী স্বাদু পানিতে বাস করে। এরা সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(১) এরা সরলতম বহুকোষী প্রাণী।

(২) এদের দেহপ্রাচীর অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত। এই ছিদ্রপথে পানির সাথে অক্সিজেন ও Lv`¨e¯‘ প্রবেশ করে।

(৩) এদের কোনো পৃথক সুগঠিত কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র থাকে না।

উদাহরণ : ¯úbwRjv, স্কাইফা

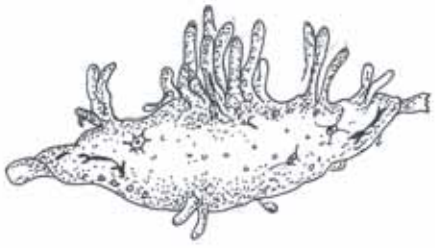

চিত্র ১.১ : ¯úbwRjv

২। পর্ব- নিডারিয়া (Cnidaria) : এই পর্ব B‡Zvc‡e সিলেন্টারোটা নামে পরিচিত ছিল।

স্বভাব ও বাসস্থান : পৃথিবীর প্রায় সকল AÂ‡j এই প্রজাতির প্রাণী দেখা যায়। এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। তবে অনেক প্রজাতি খাল, বিল, নদী, হ্রদ, ঝরনা ইত্যাদিতে দেখা যায়। এই পর্বের প্রাণীগুলো বিচিত্র বর্ণ ও আকার-আকৃতির হয়। এদের কিছু প্রজাতি এককভাবে আবার কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে কলোনি গঠন করে বাস করে। এরা সাধারণত পানিতে ভাসমান কাঠ, পাতা বা অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে দেহকে আটকে রেখে বা মুক্তভাবে সাঁতার কাটে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(১) এদের দেহ দুটি ভ্রূণীয় †Kvl¯Íi দ্বারা গঠিত। দেহের বাইরের দিকের ¯ÍiwU এক্টোডার্ম এবং ভিতরের ¯ÍiwU এন্ডোডার্ম।

(২) এদের দেহ গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। এটা একাধারে পরিপাক ও সংবহনে অংশ নেয়।

(৩) একটোডার্মে নিডোবাস্ট নামে এক ^ewkó¨cY কোষ থাকে। এই কোষগুলো শিকার ধরা, আত্মরক্ষা, চলন ইত্যাদি কাজে অংশ নেয়।

উদাহরণ : হাইড্রা, ওবেলিয়া।

চিত্র ১.২ : হাইড্রা

৩। পর্ব- প্লাটিহেলমিনথিস (Platyhelminthes)

স্বভাব ও বাসস্থান : এ পর্বের প্রাণীগুলোর জীবনযাত্রা বেশ বৈচিত্র্যময়। এ পর্বের বহু প্রজাতি বহিঃপরজীবী বা অন্তঃপরজীবী হিসেবে অন্য জীবদেহের বাইরে বা ভিতরে বসবাস করে। তবে কিছু প্রজাতি মুক্তজীবী হিসেবে স্বাদু পানিতে আবার কিছু প্রজাতি লবণাক্ত পানিতে বাস করে। এই পর্বের কোনো কোনো প্রাণী ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(১) এদের দেহ চ্যাপ্টা, এরা উভলিঙ্গ ও অন্তঃপরজীবী।

(২) দেহ কিউটিকেল দ্বারা আবৃত।

(৩) দেহে চোষক ও আংটা থাকে।

চিত্র ১.৩ : ফিতাকৃমি, যকৃত কৃমি

(৪) দেহে শিখা কোষ নামে বিশেষ কোষ থাকে, এগুলো রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

(৫) পৌষ্টিকতন্ত্র AmমúY|

উদাহরণ : ফিতাকৃমি, যকৃত কৃমি।

৪। পর্ব : নেমাটোডা (Nematoda) : অনেকে একে নেমাথেলমিনথিস বলে।

স্বভাব ও বাসস্থান : এই পর্বের অনেক প্রাণী অন্তঃপরজীবী হিসেবে প্রাণীর অন্ত্র ও রক্তে বসবাস করে। আবার এ পর্বের অনেক প্রাণীই মুক্তজীবী। এরা পানি ও মাটিতে বাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(১) দেহ নলাকার ও পুরু ত্বক দ্বারা আবৃত।

(২) পৌষ্টিক নালি mমúY, মুখ ও পায়ু ছিদ্র উপস্থিত।

(৩) শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।

(৪) সাধারণত একলিঙ্গ।

(৫) দেহ গহ্বর অনাবৃত ও প্রকৃত সিলোম নাই।

উদাহরণ : কেঁচো কৃমি, ফাইলেরিয়া কৃমি।

চিত্র ১.৪ : গোলকৃমি

গুরুত্ব : এই পর্বের অধিকাংশ প্রাণী পরজীবী হিসেবে বিভিন্ন প্রাণী ও মানবদেহে বাস করে নানারকম ক্ষতি সাধন করে।

৫। পর্ব- অ্যানেলিডা (Annelida)

স্বভাব ও বাসস্থান : পৃথিবীর প্রায় সকল নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণমন্ডলীয় AÂ‡j এ পর্বের প্রাণীদের পাওয়া যায়। এদের বহু প্রজাতি স্বাদু পানিতে এবং বহু প্রজাতি সমুদ্রে বাস করে। এই পর্বের বহু প্রাণী স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বসবাস করে। কিছু প্রজাতি পাথর ও মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসবাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(১) এদের দেহ নলাকার ও খন্ডায়িত।

(২) নেফ্রিডিয়া নামক রেচন অঙ্গ থাকে।

(৩) প্রতিটি খন্ডে সিটা থাকে। সিটা চলাচলে সহায়তা করে।

উদাহরণ : কেঁচো ও জোঁক।

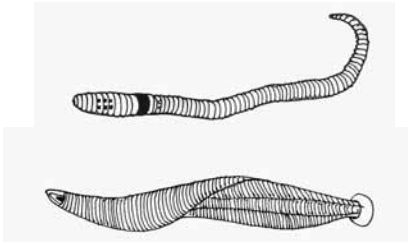

চিত্র ১.৫ : কেঁচো, জোঁক

৬। পর্ব- আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)

স্বভাব ও বাসস্থান : এই পর্বটি প্রাণিজগতের সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব। এরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সকল পরিবেশে বাস করতে সক্ষম। এদের বহু প্রজাতি অন্তঃ ও বহিঃ পরজীবী হিসেবে বাস করে। বহু প্রাণী স্থলে, স্বাদু পানি ও সমুদ্রে (চিত্র ১.৫ : কেঁচো, জোঁক) বাস করে। এ পর্বের অনেক প্রজাতির প্রাণী ডানার সাহায্যে উড়তে পারে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(১) দেহ খন্ডায়িত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান।

(২) মাথায় একজোড়া পুঞ্জাক্ষি ও অ্যান্টেনা থাকে।

(৩) নরম দেহ শক্ত কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত।

(৪) এদের দেহের i³cY গহ্বর হিমোসিল নামে পরিচিত।

উদাহরণ : প্রজাপতি, চিংড়ি, আরশোলা, কাঁকড়া।

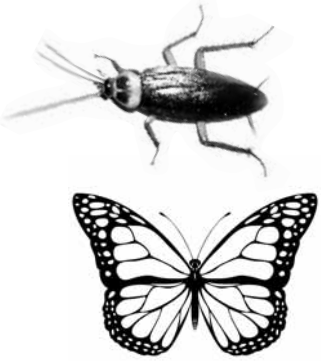

চিত্র ১.৬ : আরশোলা, প্রজাপতি

৭। পর্ব- মলাস্কা (Mollusca)

স্বভাব ও বাসস্থান : এ পর্বের প্রাণীদের গঠন, বাসস্থান ও স্বভাব ^e‖PÎ¨cY| এরা পৃথিবীর প্রায় সকল পরিবেশে বাস করে। এরা সামুদ্রিক এবং সাগরের বিভিন্ন ¯Í‡i বাস করে। কিছু কিছু প্রজাতি পাহাড় AÂ‡j, বনেজঙ্গালে ও স্বাদু পানিতে বাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(১) এদের দেহ নরম। নরম দেহটি সাধারণত শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত থাকে।

(২) পেশিবহুল পা দিয়ে এরা চলাচল করে।

(৩) ফুসফুস বা ফুলকার সাহায্যে শ্বসনকার্য চালায়।

উদাহরণ : শামুক ও ঝিনুক।

চিত্র ১.৭ : শামুক

৮। পর্ব- একাইনোডারমাটা (Echinodermata)

স্বভাব ও বাসস্থান : এ পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক। এদের স্থলে বা মিঠা পানিতে পাওয়া যায় না। এরা অধিকাংশ মুক্তজীবী।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(১) এদের দেহত্বক কাঁটাযুক্ত।

(২) দেহ পাঁচটি সমান ভাগে বিভক্ত।

(৩) এদের পানি সংবহনতন্ত্র থাকে এবং নালী পদের সাহায্যে চলাচল করে।

(৪) cY‖½ প্রাণীতে মাথা, অক্ষীয় ও পৃষ্ঠদেশ নির্ণয় করা যায় না।

উদাহরণ : তারামাছ, সমুদ্র শশা।

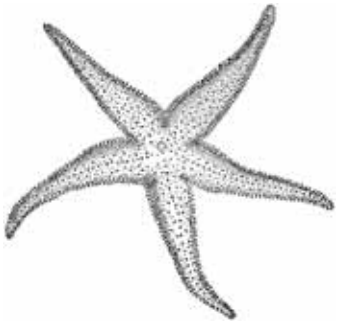

চিত্র ১.৮ : তারামাছ

নতুন শব্দ : সিলোম, সিলেন্টেরন, হিমোসিল, সিটা, পানি সংবহনতন্ত্র, শিখাকোষ।

পাঠ ৬-৮

৯। পর্ব-কর্ডাটা (Chordata)

স্বভাব ও বাসস্থান : এরা পৃথিবীর সকল পরিবেশে বাস করে। এদের বহু প্রজাতি ডাঙ্গায় বাস করে। জলচর কর্ডাটাদের

মধ্যে বহু প্রজাতি স্বাদু পানিতে অথবা সমুদ্রে বাস করে। বহু প্রজাতি বৃক্ষবাসী, মরুবাসী, মেরুবাসী, গুহাবাসী ও খেচর জীবনযাপন করে। কর্ডাটা পর্বের বহু প্রাণী বহিঃপরজীবী হিসেবে অন্য প্রাণীর দেহে সংলগ্ন হয়ে জীবনযাপন করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(১) নটোকর্ড হলো একটা নরম নমনীয়, দণ্ডাকার দৃঢ় অখণ্ডায়িত অঙ্গ। এই পর্বের কোনো কোনো প্রজাতির প্রাণীর সারা জীবন অথবা ভ্রূণ অবস্থায় পৃষ্ঠীয়দেশ বরাবর নটোকর্ড অবস্থান করে।

(২) পৃষ্ঠদেশে একক, ফাঁপা মেরুরজ্জু থাকে।

(৩) সারা জীবন অথবা জীবন চক্রের কোনো এক পর্যায়ে পার্শ্বীয় গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র থাকে।

উদাহরণ : মানুষ, কুনোব্যাঙ, রুই মাছ।

কর্ডাটা পর্বকে তিনটি উপপর্বে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. ইউরোকর্ডাটা (Urochordata)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. প্রাথমিক অবস্থায় ফুলকা রন্ধ্র, পৃষ্ঠীয় ফাঁপা মেরুরজ্জু থাকে।

২. এদের লেজে নটোকর্ড থাকে।

উদাহরণ : অ্যাসিডিয়া।

চিত্র ১.৯ : অ্যাসিডিয়া

খ. সেফালোকর্ডাটা (Cephalochordata)

১. নটোকর্ড এদের দেহের সম্মুখভাগে অবস্থান করে।

২. সারাজীবনই নটোকর্ডের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

উদাহরণ : ব্রাঙ্কিওস্টোমা

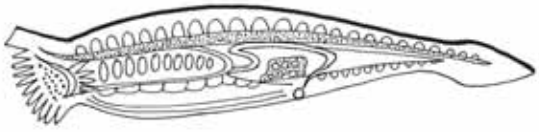

চিত্র ১.১০ : ব্রাঙ্কিওস্টোমা

গ. ভার্ট্রিটা (Vertebrata)

এই উপ-পর্বের প্রাণীরাই মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবে পরিচিত। গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ৭টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

১। শ্রেণি- সাইক্লোস্টোমাটা (Cyclostomata)

(ক) লম্বাটে দেহ।

(খ) মুখছিদ্র চোয়ালবিহীন ও চোষকযুক্ত।

(গ) এদের দেহে আঁইশ বা যুগ্ম পাখনা অনুপস্থিত।

উদাহরণ : পেট্রোমাইজন।

চিত্র ১.১১ : পেট্রোমাইজন

২। শ্রেণি- কনড্রিকথিস (Chondrickthyes)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(ক) এই পর্বের সকল প্রাণী সমুদ্রে বাস করে।

(খ) কঙ্কাল তরুণাস্থিময়।

(গ) এদের দেহ প্ল্যাকয়েড আঁইশ দ্বারা আবৃত, মাথার দুই পাশে ৫-৭ জোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে।

(ঘ) এদের কানকো থাকে না।
উদাহরণ : হাঙ্গর, করাত মাছ।

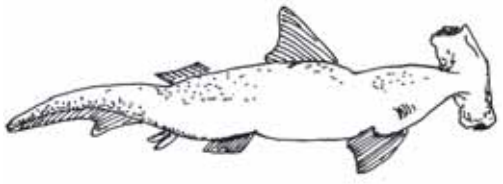

চিত্র ১.১২ : হাতুড়ি মাছ।

৩। শ্রেণি- অস্টিকথিস (Ostichthyes)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(ক) এদের অধিকাংশই স্বাদু পানির মাছ।

(খ) দেহ সাইকোয়েড ও টিনয়েড উভয় ধরনের আঁইশ দ্বারা আবৃত।

(গ) মাথার দুই পাশে চার জোড়া ফুলকা থাকে। ফুলকাগুলো কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে। ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

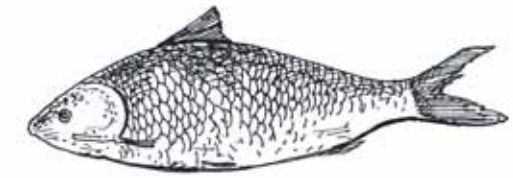

চিত্র ১.১৩ : ইলিশ মাছ

কাজ : লইট্যা মাছ, রূপচাঁদা, পোয়া মাছ, কোরাল মাছ, পাবদা, কৈ, শিং, মাগুর মাছ সংগ্রহ কর। এগুলো কোন শ্রেণিভুক্ত মাছ। এদের বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত কর।

৪। শ্রেণি- উভচর (Amphibia)

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে যারা জীবনের প্রথম অবস্থায় সাধারণত পানিতে এবং মাছের মতো বিশেষ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়, পরিণত বয়সে ডাঙ্গায় বাস করে তারাই উভচর।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(ক) এদের দেহত্বক আঁইশবিহীন।

(খ) ত্বক নরম, পাতলা, ভেজা ও গ্রন্থিযুক্ত।

(গ) এরা শীতল রক্তের প্রাণী।

(ঘ) এরা পানিতে ডিম পাড়ে। এদের জীবনচক্রে সাধারণত ব্যাঙাচি দশা দেখা যায়।

উদাহরণ : সোনাব্যাঙ, কুনোব্যাঙ।

চিত্র ১.১৪ : কুনোব্যাঙ

৫। শ্রেণি- সরীসৃপ (Reptailia)

চিত্র ১.১৫ : টিকটিকি

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(ক) এরা বুকে ভর করে চলে।

(খ) ত্বক শুষ্ক ও আঁইশযুক্ত।

(গ) চারপায়ে পাঁচটি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল আছে।

উদাহরণ : টিকটিকি, কুমির, সাপ।

৬। শ্রেণি- পক্ষীকুল (Aves)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(ক) পাখির দেহ পালকে আবৃত।

(খ) এদের সামনের দু'পা ডানায় ও চোয়াল PÂ‡Z পরিণত হয়েছে।

(গ) ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকায় এরা সহজে উড়তে পারে।

(ঘ) এরা উষ্ণ রক্তের প্রাণী।

(ঙ) পাখির হাড় শক্ত, হালকা ও ফাঁপা।

উদাহরণ : কাক, দোয়েল, হাঁস।

চিত্র ১.১৬ : দোয়েল

৭। শ্রেণি- ¯Íb¨cvqx (Mammalia)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(ক) এদের দেহ লোমে আবৃত থাকে।

(খ) ব্যতিক্রমি ¯Íb¨cvqx প্রাণী ছাড়া এরা সবাই সন্তান প্রসব করে।

(গ) উষ্ণ রক্তের প্রাণী।

(ঘ) চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে।

(ঙ) শিশুরা মাতৃ দুগ্ধ পান করে বড় হয়।

(চ) হৃৎপিন্ড চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।

উদাহরণ : মানুষ, উট, বাঘ।

চিত্র ১.১৭ : বাঘ

নতুন শব্দ : বায়ুথলি, নটকর্ড।

কাজ : তোমরা পাঁচজনের একটি করে দল গঠন কর। এবার মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণীদের চার্ট দেখে এদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর ও লিপিবদ্ধ কর। এবার তোমরা শ্রেণিতে উপস্থাপন কর। সকল দলের লেখার বৈশিষ্ট্যের সাথে তোমাদের লেখার বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নাও।

পাঠ ৯

লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে শনাক্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। কেবলমাত্র শ্রেণিবিন্যাসকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করে এ কাজটি করা সম্ভবপর হয়। একটি প্রাণীকে শনাক্ত করতে হলে প্রধানত ছয়টি ধাপে এর বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নিতে হয়। এ ধাপগুলো হলো জগৎ (kingdom), পর্ব (Phylum), শ্রেণি (Class), বর্গ (Order), গোত্র (Family), গণ (Genus) ও প্রজাতি (Species) এই ছয়টি ধাপ লিখলেই চলবে। কিন্তু মানুষ, ব্যাঙ, সাপ, মাছ ইত্যাদি সকল মেরুদন্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে Phylum বা পর্বের নিচে Sub-Phylum লিখতে হয়।

শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

শ্রেণিবিন্যাসের সাহায্যে পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সহজে, অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে জানা যায়। নতুন প্রজাতি শনাক্ত করতে শ্রেণিবিন্যাস অপরিহার্য। cwYK‡ji মধ্যে cvi¯úwiK m¤ú‡K বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে cwYK‡ji মাঝে যে পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে সে m¤ú‡K ধারণা পাওয়া যায়। অসংখ্য RxeKj‡K একটি নির্দিষ্ট রীতিতে web¨¯— করে গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়। জীবের মধ্যে মিল-অমিলের ভিত্তিতে ci¯ú‡ii মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। জীব m¤ú‡K সামগ্রিক ও পরিকল্পিত জ্ঞান নির্ণয় করা যায়। যেমন- সব এককোষী প্রাণীকে একটি পর্বে এবং বহুকোষী প্রাণীদের নয়টি পর্বে ভাগ করা হতো।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম

-কর্ডাটা প্রাণিজগতের কতকগুলো প্রাণী যাদের মধ্যে নটকর্ড, স্নায়ুরজ্জু ও গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র আছে এবং এরা ভার্টিব্রাটা নামে পরিচিত।

- ভার্টিব্রাটা উন্নত প্রাণী। এদের নটকর্ড শক্ত K‡kiKvযুক্ত †gi`‡Û পবিবর্তিত হয়।
- স্নায়ুরজ্জুর সম্মুখ প্রান্ত স্ফীত হয়ে gw¯—‡®< পরিণত হয়। gw¯—®< করোটির মধ্যে সুরক্ষিত থাকে।
- জলজ ভার্টিব্রাটা ফুলকার সাহায্যে শ্বসন কাজ চালায় আর যারা স্থলে বাস করে তারা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।
- মলাস্কা পর্বের প্রাণীদের নরম দেহ ম্যান্টল দ্বারা আবৃত থাকে। মাংসল পা দিয়ে চলাফেরা করে।
- যে mg¯— প্রাণীকে এদের দেহের কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর একাধিকবার সমান দুঅংশে ভাগ করা হয় তাকে অরীয় প্রতিসম প্রাণী বলে। যেমন - তারামাছ।
- বহুকোষী প্রাণীর পৌষ্টিক নালি এবং দেহ প্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে সিলোম বলে।
- দেহ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দেহ গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। এটা একাধারে পরিপাক ও সংবহনের কাজ করে।
- হিমোসিলের ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়।
- å‡Yi যে সকল কোষীয় ¯—i থেকে পরবর্তীতে টিস্যু বা অঙ্গ সৃষ্টি হয় তাদের åY¯—i eলে।
- প্রাণিজগতে আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ক্ষতিকর পোকাদের পেস্ট বলে।

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ কর

১. যকৃত কৃমির রেচন অঙ্গ হলো ———।

২. ——— উপপর্বের প্রাণীরা মেরুদন্ডী।

৩. ইউকোকর্ডাটা উপপর্বভুক্ত প্রাণীদের লেজে ——— থাকে।

৪. ——— পেশিবহুল পা দিয়ে চলাচল করে।

৫. চিংড়ির i ³cY গহ্বরকে ——— বলে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোনো প্রাণীর দ্বিপদ নামে কয়টি অংশ থাকে? এ অংশগুলো কী কী? মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কী?

২. ¯–b¨cvqx প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

৩. ইউরোকর্ডাটার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

৪. চিংড়ি কোন পর্বের প্রাণী? এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

৫. তোমার চেনাজানা পাঁচটি আর্থ্রোপোডার নাম লেখ?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি Mollusca পর্বের প্রাণী?

ক. কাঁকড়া খ. জোঁক
গ. তারামাছ ঘ. ঝিনুক

২. স্কাইফা ও হাইড্রা উভয়ই–

i. দ্বিস্তরী

ii. বহুকোষী

iii. সুগঠিত তন্ত্রবিহীন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

m	প্রাণীর ডানা এবং হিমোসিল নামক দেহগহ্বর থাকে
n	প্রাণীর পালক এবং ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকে
o	প্রাণী ডিম পাড়ে এবং শীতল রক্তবিশিষ্ট
p	প্রাণীর আঁইশ এবং যুগ্ম পাখনা থাকে

৩. ছকের কোন প্রাণীটি অমেরুদন্ডী?

ক. m খ. n
গ. o ঘ. p

৪. উড়তে পারে–

i. m ও n প্রাণী
ii. n ও o প্রাণী
iii. m ও p প্রাণী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

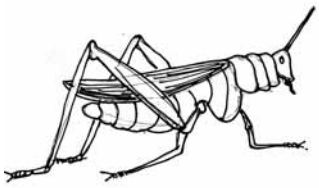

P

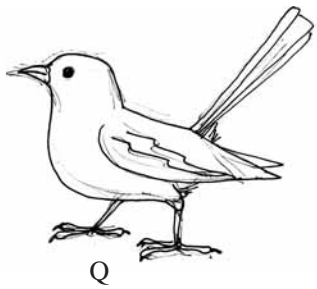

Q

ক. শ্রেণিবিন্যাস কী?

খ. বৈজ্ঞানিক নাম বলতে কী বুঝায়?

গ. P প্রাণীটি কোন শ্রেণির? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রাণী দুইটি ভিন্ন শ্রেণিতে থাকার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. রাহাতের গায়ে মশায় কামড় দেয়া মাত্র সে এটিকে হাতচাপা দিয়ে ধরে ফেলল। একটি ম্যাগনেফাইং গ্লাস দিয়ে সে এর উপাঙ্গ, চক্ষু ও দেহাবরণ পর্যবেক্ষণ করল। পরবর্তীতে সে তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে এটির শ্রেণিগত অবস্থান বুঝার চেষ্টা করল।

ক. ফিতাকৃমি কোন পর্বের প্রাণী?

খ. মাবনদেহে নটোকর্ডের অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

গ. রাহাতের পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান জানা রাহাতের জন্য প্রয়োজন কেন? বিশ্লেষণ কর।

নিজে কর

১. তুমি তোমার পরিবেশ থেকে কয়েকটি মেরুদন্ডী প্রাণী সংগ্রহ কর এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ কর।

২. কেঁচো, চিংড়ি, ঘাস ফড়িং, শামুক, ঝিনুক, দোয়েল, রুই মাছ কোন পর্বভুক্ত প্রাণী? এদের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবের বৃদ্ধি ও বংশগতি

প্রতিটি জীবের দেহ কোষ দিয়ে গঠিত। এক কোষী জীবগুলো কোষ বিভাজনের দ্বারা একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি কোষে বিভক্ত হয় এবং এভাবে বংশবৃদ্ধি করে। বহুকোষী জীবদের দেহ কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে জীবদেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে। ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার পর বহুকোষী জীবদের জীবন শুরু হয় একটি মাত্র কোষ থেকে। নিষিক্ত ডিম্বাণু অর্থাৎ এককোষী জাইগোট ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ কোষ নিয়ে গঠিত বিশাল দেহ।

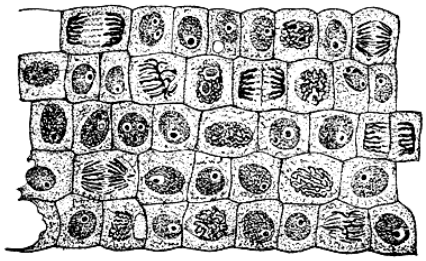

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জীব দেহের বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবের বংশগতির ধারা রক্ষায় কোষ বিভাজনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ

জীবদেহে তিন ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়, যথা- (১) অ্যামাইটোসিস (২) মাইটোসিস এবং (৩) মিয়োসিস।

অ্যামাইটোসিস : এই ধরনের কোষ বিভাজন ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, ছত্রাক, অ্যামিবা ইত্যাদি এককোষী জীবে হয়। এককোষী জীবগুলো অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে বংশবৃদ্ধি করে। এ ধরনের কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াসটি ডাম্বেলের আকার ধারণ করে এবং প্রায় মাঝ বরাবর সংকুচিত হয়ে ও ci¯úi থেকে we"Qb হয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এর সাথে সাথে সাইটোপাজমও মাঝ বরাবর সংকুচিত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। এ ধরনের বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপাজম সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাই একে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলে।

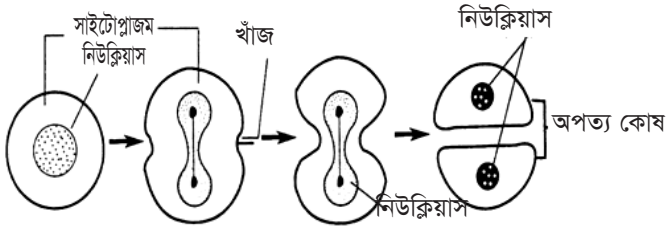

চিত্র ২.১ : অ্যামাইটোসিস

মাইটোসিস : উন্নত শ্রেণির প্রাণীর ও উদ্ভিদের দেহ কোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস একবার বিভাজিত হয়ে সমআকৃতির সমগুণ m¤úb ও সমসংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষ

সৃষ্টি করে। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদের ভাজক টিস্যুর কোষ এ ধরনের কোষ বিভাজনের দ্বারা কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়।

মিয়োসিস : মিয়োসিস কোষ বিভাজন জনন কোষ উৎপন্নের সময় ঘটে। এ ধরনের কোষ বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি পরপর দুবার বিভাজিত হলেও ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে মাত্র একবার। ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। এ বিভাজনে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায় বলে এ ধরনের বিভাজনকে nÖmgjK বিভাজনও বলা হয়। জনন মাতৃকোষে থেকে পুং ও ¯¿ী গ্যামেট উৎপন্নের সময় এ ধরনের কোষ বিভাজন হয়।

মাইটোসিস

মাইটোসিসের বৈশিষ্ট্য

১. মাইটোসিস কোষ বিভাজন দেহকোষের এক ধরনের বিভাজন পদ্ধতি।

২. এ প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি একবার মাত্র বিভাজিত হয়।

৩. মাতৃকোষটি বিভাজিত হয়ে সমগুণ m¤úb দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে।

৪. এ ধরনের বিভাজনে মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা এবং অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

৫. এ ধরনের বিভাজনে প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়। ফলে সৃষ্ট নতুন কোষ দুটিতে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার সমান থাকে। তাই মাইটোসিসকে ইকুয়েশনাল বা সমীকরণিক বিভাজনও বলা হয়।

মাইটোসিস কোথায় হয়?

মাইটোসিস বিভাজন প্রকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবদেহের দেহকোষে ঘটে, উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশের ভাজক টিস্যু যেমন- কাণ্ড, g‡ji অগ্রভাগ, åYgKj I åYgj, বর্ধনশীল পাতা, মুকুল ইত্যাদিতে এ রকম বিভাজন দেখা যায়। প্রাণিদেহের দেহকোষে, ভ্রূণের পরিবর্ধনের সময়, নিম্নশ্রেণির প্রাণীর ও উদ্ভিদের অযৌন জননের সময় এ ধরনের বিভাজন হয়।

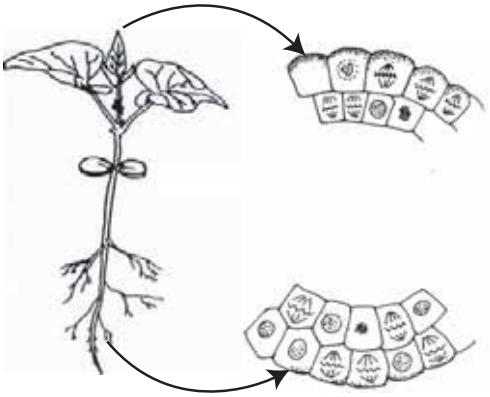

চিত্র ২.২ : এই চিত্র থেকে তুমি কী বুঝলে?

কোন কোন কোষে মাইটোসিস বিভাজন ঘটে না?

প্রাণীদের স্নায়ুটিস্যুর স্নায়ুকোষে, ¯Íb¨cwqx প্রাণীদের পরিণত লোহিত রক্ত কণিকা ও অনুচক্রিকা এবং উদ্ভিদের স্থায়ী টিস্যুর কোষে এ ধরনের বিভাজন ঘটে না।

পাঠ ২ : মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতি

মাইটোসিস বিভাজনটি দুটি পর্যায়ে m¤úb হয়। প্রথম পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সাইটোপাজমের বিভাজন হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস এবং সাইটোপাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে। মাইটোসিস কোষ বিভাজন একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি তাই প্রথমে ক্যারিওকাইনেসিস অর্থ্যাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয়, পরিবর্তীতে সাইটোকাইনেসিস হয়। তবে ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস শুরু হওয়ার আগে কোষটির নিউক্লিয়াসকে কিছু c¯‘wZgjK কাজ করতে হয়। কোষটির এ অবস্থাকে ইন্টারফেজ বলে।

কেন্দ্রিকার বিভাজন বা ক্যারিওকাইনেসিস

বিভাজিত কোষে নিউক্লিয়াসটির একটি জটিল পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্যারিওকাইনেসিস m¤úb হয়। পরিবর্তনগুলো ধারাবাহিকভাবে ঘটে। বুঝার সুবিধার্থে এই পর্যায়টিকে পাঁচটি ধাপে বিভক্ত করা হয়েছে। ধাপগুলো- ১. প্রোফেজ , ২. প্রো-মেটাফেজ, ৩. মেটাফেজ, ৪. অ্যানাফেজ ও ৫. টেলোফেজ।

প্রোফেজ : এটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ধাপ, এ ধাপে কোষে নিম্নলিখিত ঘটনাবলি ঘটে-

চিত্র ২.৩ : প্রোফেজ

১. কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয়।

২. পানি বিয়োজনের ফলে নিউক্লিয়ার জালিকা ভেঙ্গে গিয়ে কতকগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যক আঁকাবাঁকা সুতার মতো অংশের সৃষ্টি হয়। এগুলোকে ক্রোমোজোম বলে। এরপর প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে দুটি ক্রোমাটিড গঠন করে। এগুলো সেন্ট্রোমিয়ার নামক একটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে।

পাঠ ৩ : প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ ও অ্যানাফেজ

প্রো-মেটাফেজ : এ ধাপটি স্বল্পস্থায়ী। এ ধাপে-

১. নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাস m¤úYf\‡e বিলুপ্ত হয়ে যায়।

২. কোষের উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত we¯ÍZ কতকগুলো তন্তুর আবির্ভাব ঘটে। এগুলো মাকুর আকৃতি ধারণ করে তাই একে w¯úÛj যন্ত্র বলে। স্পিন্ডল যন্ত্রের মধ্যভাগকে বিষুবীয় অঞ্চল বলে। প্রাণিকোষে সেন্ট্রিওল দুটির চারিদিক থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির মতো

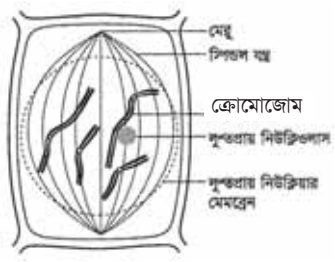

চিত্র ২.৪ : প্রো-মেটাফেজ

অ্যাস্ট্রার রশ্মির আবির্ভাব ঘটে এবং কোষের দুই বিপরীত মেরুতে পৌঁছাতে স্পিন্ডল তন্তু গঠন করে। তন্তুগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে স্পিন্ডল যন্ত্র গঠন করে।

মেটাফেজ : এ ধাপে-

১. ক্রোমোজোমগুলো ¯úÛj যন্ত্রের বিষুবীয় AÂ‡j আসে এবং তন্তুর সাথে সেন্ট্রোমিয়ার দিয়ে আটকে থাকে।

২. এ ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে খাটো ও মোটা দেখায়।

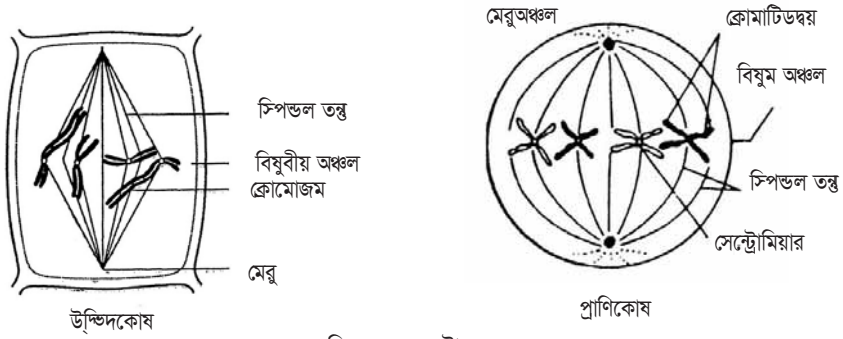

চিত্র ২.৫ : মেটাফেজ

অ্যানাফেজ : এ ধাপে-

১. প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, ফলে প্রত্যেক ক্রোমাটিড একটি করে সেন্ট্রোমিয়ার পায়।

২. ক্রোমাটিডগুলো ci¯úi থেকে we"Qb হয়ে যায়। এ অবস্থায় প্রতিটি ক্রোমাটিডকে অপত্য ক্রোমোজোম বলে।

৩. এরপর ক্রোমোজোমগুলোর সাথে যুক্ত তন্তুগুলোর সংকোচনের ফলে অপত্য ক্রোমোজোমের অর্ধেক উত্তর মেরুর দিকে এবং অর্ধেক দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় ক্রোমোজোমগুলো ইংরেজি বর্ণমালার V, L, J অথবা I আকৃতি বিশিষ্ট হয়।

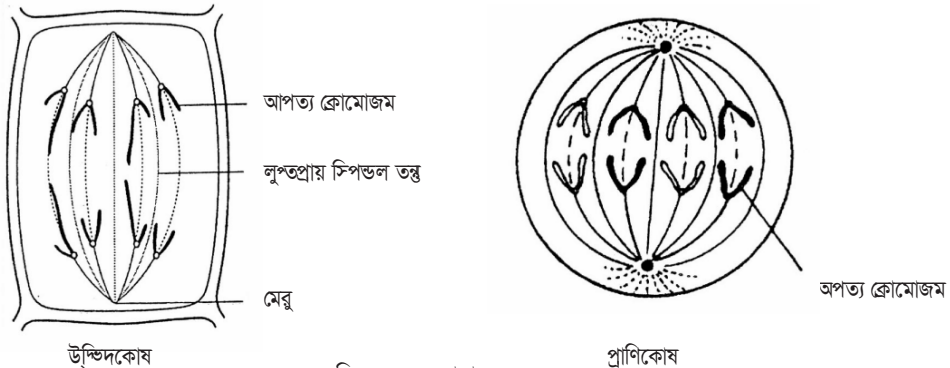

চিত্র ২.৬ : অ্যানাফেজ

পাঠ ৪ টেলোফেজ : এ ধাপে-

১. অপত্য ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত মেরুতে এসে পৌছায়।

২. এরপর ক্রোমোজোমগুলোকে ঘিরে নিউক্লিয়ার পর্দা এবং নিউক্লিওলাসের পুনঃ আবির্ভাব ঘটে। প্রাণিকোষে উভয় মেরুতে একটি করে সেন্ট্রিওল সৃষ্টি হয়।

৩. এ অবস্থায় ক্রোমোজোমগুলো সরু ও লম্বা আকার ধারণ করে ci¯ú‡ii সাথে জট পাকিয়ে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম গঠন করে। এভাবে কোষের দুই মেরুতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয় এবং ক্যারিওকাইনেসিসের সমাপ্তি ঘটে।

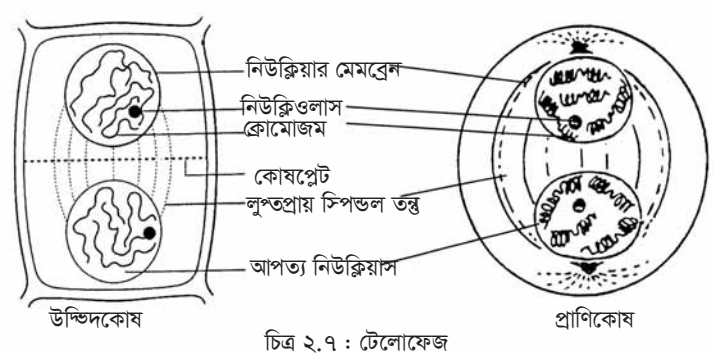

চিত্র ২.৭ : টেলোফেজ

সাইটোকাইনেসিস

নিউক্লিয়াসের বিভাজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে টেলোফেজ দশাতেই সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। টেলোফেজ ধাপের শেষে বিষুবীয় তলে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি জমা হয় এবং পরে এরা মিলিত হয়ে কোষপ্লেট গঠন করে। কোষপেট পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে কোষ প্রাচীর গঠন করে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে।

চিত্র ২.৮ : সাইটোকাইনেসিস

প্রাণিকোষের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সাথে সাথে কোষের মাঝামাঝি অংশে কোষপর্দার উভয় পাশ থেকে দুটি খাঁজ সৃষ্টি হয়। কোষপর্দার এ খাঁজ ক্রমশ ভিতরের দিকে গিয়ে নিরক্ষীয় তল বরাবরে we¯—Z হয়ে মিলিত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। তাহলে আমরা জানতে পারলাম উদ্ভিদ কোষের কোষপেট গঠিত হয় এবং প্রাণিকোষে ক্লীভেজ বা ফারোয়িং পদ্ধতিতে সাইটোকাইনেসিস ঘটে।

কাজ : ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস এর পার্থক্যগুলো লেখ।

পাঠ ৫ ও ৬ : মিয়োসিস

এ অধ্যায়ের শুরুতে জেনেছি মিয়োসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে। এখন প্রশ্ন n‡"Q মিয়োসিস কেন হয়?

মাইটোসিস কোষ বিভাজনে অপত্য কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের সমান থাকে। বৃদ্ধি ও অযৌন জননের জন্য মাইটোসিস কোষ বিভাজন অপরিহার্য। যৌন জননে পুং ও ¯¿x জনন কোষের মিলনের প্রয়োজন পড়ে। যদি জননকোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষের সমান থেকে যায় তাহলে জাইগোট কোষে জীবটির দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মিয়োসিস কোষ বিভাজনে জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। ফলে দুটি জননকোষ একত্র হয়ে যে জাইগোট গঠন করে তার ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার অনুরূপ থাকে। এতে নির্দিষ্ট প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার ধ্রুবতা বজায় থাকে।

জননকোষ সৃষ্টির সময় এবং নিম্নশ্রেণির উw™দের জীবন চক্রের কোনো এক সময় যখন এরকম ঘটে তখন কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার সে অবস্থাকে হ্যাপয়েড (n) বলে। যখন দুটি হ্যাপয়েড কোষের মিলন ঘটে তখন সে অবস্থাকে ডিপয়েড (২n) বলে ।

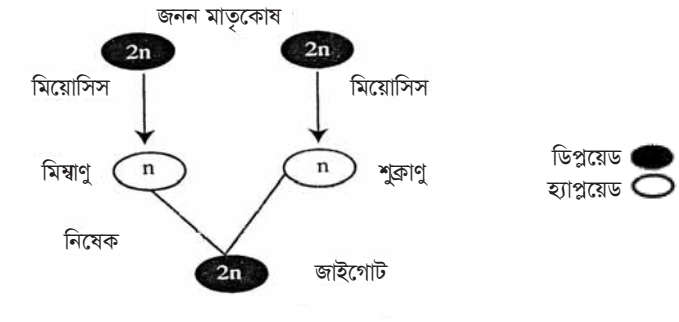

চিত্র ২.৯ : মিয়োসিস কোষ বিভাজন

সুতরাং মিয়োসিস কোষ বিভাজন হয় বলেই প্রতিটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য eskci¤úiv q টিকে থাকতে পারে।

মিয়োসিসের বৈশিষ্ট্য

১. জীবের জনন ও নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদের জাইগোটে মিয়োসিস ঘটে।

২. এ ধরনের কোষ বিভাজনে একটি কোষ থেকে চারটি কোষের সৃষ্টি হয়।

৩. ক্রোমোজোম একবার বিভক্ত হয় এবং নিউক্লিয়াস দুবার বিভক্ত হয়।

৪. সৃষ্ট চারটি কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃ নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়।

মিয়োসিস কোথায় ঘটে?

মিয়োসিস কোষ বিভাজন প্রধানত জীবের জনন কোষ বা গ্যামেট সৃষ্টির সময় জনন মাতৃকোষে ঘটে। mc¯úK উদ্ভিদের পরাগধানী ও ডিম্বকের মধ্যে এবং উন্নত প্রাণিদেহে শুক্রাশয়ে ও ডিম্বাশয় এর মধ্যে মিয়োসিস ঘটে।

মিয়োসিস পদ্ধতি

মিয়োসিস বিভাজনের সময় কোষ পরপর দুবার বিভাজিত হয়।

প্রথম বিভাজনকে প্রথম মিয়োটিক বিভাজন বা মিয়োসিস-১ এবং দ্বিতীয় বিভাজনকে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন বা মিয়োসিস-২ বলা হয়। প্রথম বিভাজনের সময় অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেকে পরিণত হয় এবং দ্বিতীয় বিভাজনটি মাইটোসিসের অনুরূপ।

(n)

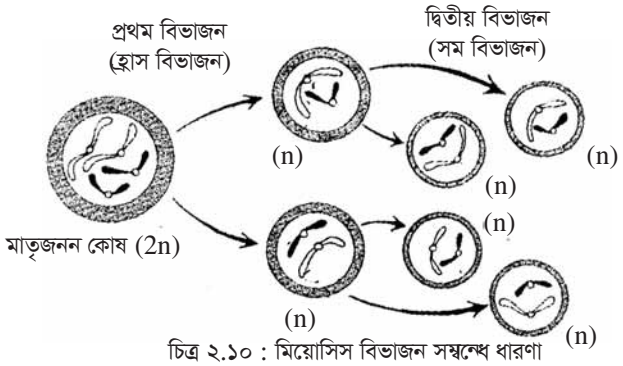

চিত্র ২.১০ : মিয়োসিস বিভাজন সম্বন্ধে ধারণা

পাঠ ৭-৯ : বংশগতি নির্ধারণে ক্রোমোজোম ডি.এন.এ এবং আর.এন.এ এর fwgKv

মা ও বাবার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততি পেয়েই থাকে। মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য যে প্রক্রিয়ায় সন্তান-সন্ততিতে mÂwiZ হয়, তাকে বংশগতি বলে। আর সন্তানরা পিতা-মাতার যেসব বৈশিষ্ট্য পায়, সেগুলোকে বলে বংশগত বৈশিষ্ট্য। বংশগতি সম্বন্ধে এক সময় মানুষের ধারণাটা ছিল কাল্পনিক। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন কীভাবে পিতামাতার বৈশিষ্ট্য তার সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম যিনি বংশগতির ধারা সমন্ধে সঠিক ধারণা দেন তার নাম গ্রেগর জোহান মেন্ডেল। বর্তমানে বংশগতি সম্বন্ধে আধুনিক যে তত্ত্ব প্রচলিত আছে তা মেন্ডেলের আবিষ্কার তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জন্য মেন্ডেলকে জিনতত্ত্বের জনক বলা হয়।

গ্রেগর জোহান মেন্ডেন্ডর
১৮২২-১৮৮৪

নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নির্দিষ্ট সংখ্যক সুতার মতো যে অংশগুলো জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে তাদের ক্রোমোজোম বলে। ক্রোমোজোমের গঠন ও আকার সম্বন্ধে যে ধারণা আমরা পাই তা প্রধানত মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ ধাপে দৃষ্ট ক্রোমোজোম থেকে পাই। প্রতিটি ক্রোমোজোমের প্রধান দুটি অংশ থাকে– ক্রোমাটিড ও সেন্ট্রোমেয়ার। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ ধাপে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হওয়ার পর যে দুটি সমান আকৃতির সুতার মতো অংশ গঠন করে তাদের প্রত্যেকটিকে ক্রোমাটিড বলে। ক্রোমাটিড দুটি নির্দিষ্ট স্থানে ci¯úi যুক্ত থাকে তাকে সেন্ট্রোমিয়ার বলে। কোষ বিভাজনের সময় w¯úÛj তন্তু সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে যুক্ত হয়।

নিউক্লিক এসিড দুই ধরনের যথা- ডি.এন.এ (ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) এবং আর.এন.এ (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড)। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান ডি.এন.এ। বংশগতি ধারা পরিবহনে ক্রোমোজোমের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ডি.এন.এ এর অংশ ও আর.এন.এ এর গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণত ক্রোমোজোমের ডি.এন.এ অণুগুলোই জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক এবং জীব দেহের বৈশিষ্ট্যগুলো পুরুষাণুক্রমে বহন করে। তাই বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ডি.এন.এ এর অংশ কে জিন নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং জিন হলো ক্রোমোজোমে অবস্থিত ডি.এন.এ। ডি.এন.এ অণু জিনের রাসায়নিক রূপ। যেসব জীবে ডি.এন.এ থাকে না কেবল আর.এন.এ থাকে সে ক্ষেত্রে আর.এন.এ জিন হিসেবে কাজ করে। যেমন- তামাক গাছের মোজাইক ভাইরাস (TMV)।

জীবের এক একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একাধিক জিন কাজ করে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটিমাত্র জিন বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চোখের রং, চুলের প্রকৃতি, চামড়ার রং ইত্যাদি সবই জিন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। মানুষের মতো অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলোও তাদের ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রোমোজোম জিনকে এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে বহন করার জন্য বাহক হিসাবে কাজ করে বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে।

মায়োটিক কোষ বিভাজনের দ্বারা বংশগতির এ ধারা অব্যাহত থাকে। ক্রোমোজোম বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোষ বিভাজনের সময় জিনকে সরাসরি মাতা-পিতা থেকে বহন করে পরবর্তী বংশধরে নিয়ে যায়। এ কারণে ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌতভিত্তি বলা হয়।

সুতরাং এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম মিয়োটিক কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশগতির ধারা অব্যাহত থাকে এবং ক্রোমোজমের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বংশানুক্রমে প্রতিটি প্রজাতির স্বকীয়তা রক্ষিত হয়।

মানব দেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬টি। জনন কোষে এবং ভ্রুণের কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত হবে?

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম–

- জীবের বৃদ্ধি কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ঘটে।
- কোষ বিভাজন তিন প্রকার এবং এগুলো কোথায় ঘটে।
- জীবে ক্রোমোজোম সংখ্যা কীভাবে ধ্রুবক থাকে?
- হ্যাপয়েড ও ডিপয়েড বলতে কী বুঝায়?
- বংশগতির ধারক জিন এবং বংশানুক্রমে এগুলোর বাহক ক্রোমোজোম।
- গ্রেগর জোহান মেন্ডেল বংশগতির জনক।

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ কর

১. ——— ধাপে ক্রোমোজোম ক্রোমাটিড সহ বিষুবীয় AÂ‡j অবস্থান নেয়।

২. ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পায় ——— বিভাজনে।

৩. অ্যামিবায় ——— বিভাজন দেখা যায়।

৪. জীবের দেহকোষে ক্রোমোজোমের প্রকৃতি ——— ।

৫. নিউক্লিয়াস বিভাজন পদ্ধতিকে ——— বলে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাইটোসিস বিভাজনের কোন ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক খাটো ও মোটা হয়?

ক. প্রোফেজ খ. প্রোমেটাফেজ

গ. মেটাফেজ ঘ. অ্যানাফেজ

২. মানুষের চোখের রং নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?

ক. ডি. এন. এ খ. আর. এন. এ

গ. নিউক্লিওলাস ঘ. সেন্ট্রোমিয়ার

নিচের অংশটুকু পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সাফওয়ান ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পিঁয়াজের মূলের কোষ পর্যবেক্ষণ করছিল। সে কোষ বিভাজনের একটি দশায় কোষের নিউক্লিয়াসে কোনো আবরণী ও নিউক্লিওলাস দেখতে পেল না, তবে ক্রোমোজোমগুলো কোষের ঠিক মাঝ বরাবর Ae¯’vb করতে দেখল।

৩. কোষ বিভাজনের কোন দশায় সাফওয়ানের চোখ পড়েছিল?

ক. প্রোফেজ খ. প্রোমেটাফেজ

গ. মেটাফেজ ঘ. অ্যানাফেজ

৪. সাফওয়ান এর পর্যবেক্ষণকৃত দশাটির পরবর্তী দশায়-

i. ক্রোমোজোমগুলো সেন্ট্রোমিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে

ii. ক্রোমাটিডগুলো পর¯úর হতে বিচ্ছিন্ন হবে

iii. সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফারাবী স্যার বিজ্ঞান ক্লাসে কোষ বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন, কোষ বিভাজনের একটি বিশেষ ধাপে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত সুতার মতো অংশের সেন্ট্রোমিয়ার দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। ফলে বিভাজিত কোষে এর সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

ক. কোন ধরনের কোষ বিভাজনে জননকোষ উৎপন্ন হয়?

খ. অ্যামাইটোসিস বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. ফারাবী স্যারের বর্ণিত বিশেষ ধাপটির সচিত্র বর্ণনা দাও।

ঘ. ফারাবী স্যারের বর্ণিত সুতার মতো অংশটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২.

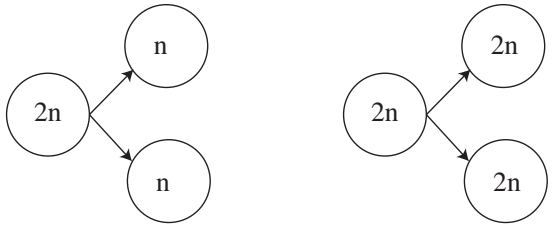

ক. মানুষের প্রতিটি দেহকোষে কয়টি ক্রোমোজোম রয়েছে?

খ. জীন বলতে কী বুঝায়?

গ. P কোষ বিভাজনটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উন্নত প্রাণীতে P ও Q কোষ বিভাজন দুইটির তুলনামূলক আলোচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যাপন, অভিস্রবণ ও প্রস্বেদন

উদ্ভিদ g‡ji সাহায্যে মাটি থেকে পানি ও পানিতে `exfZ খনিজ লবণ শোষণ করে এবং সেই পানি ও রস কাণ্ডের ভিতর দিয়ে পাতায় পৌছায়। আবার দেহে শোষিত পানি উদ্ভিদ ev®ú আকারে দেহ থেকে বের করে দেয়। উদ্ভিদরা যে সব প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে এবং ত্যাগ করে, দেহে পানি ও পানিতে `wefZ খনিজ লবণ শোষণ করে ঐ রস দেহের নানা অঙ্গে পরিবহন করে ও দেহ থেকে পানি ev®ú আকারে বের করে দেয় সেই সব প্রক্রিয়া ব্যাপন, অভিস্রবণ, শোষণ, পরিবহন ও প্রস্বেদনের মাধ্যমে ঘটে। এই অধ্যায়ে এ বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো।

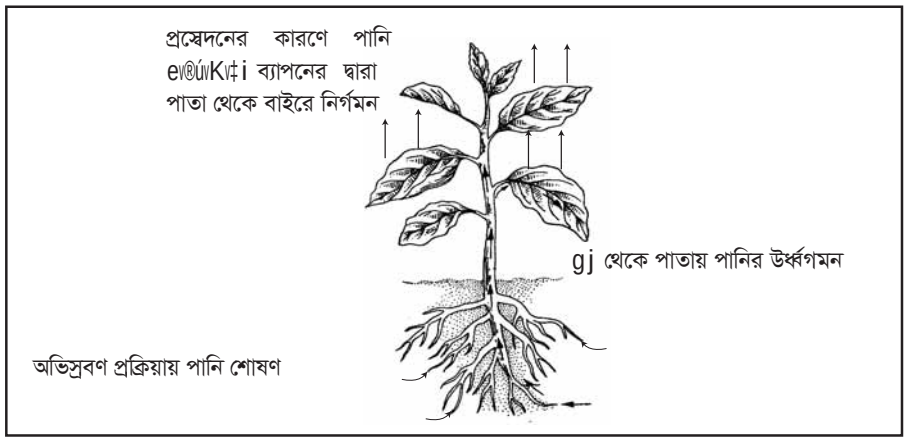

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- ব্যাপন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অভিস্রবণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের পানি পরিত্যাগ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদের পানি শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ ও ২ : ব্যাপন

আমরা জানি সব পদার্থই কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু দিয়ে তৈরি। এই অণুগুলি সবসময় গতিশীল বা চলমান অবস্থায় থাকে। তরল ও গ্যাসের ক্ষেত্রে অণুগুলির চলন খুব দ্রুত এবং বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের দিকে অণুগুলি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই চলন চলতে থাকে যতক্ষণ না অণুগুলির ঘনত্ব দুই স্থানে সমান হয়। অণুগুলির এic চলন প্রক্রিয়াকে বলে ব্যাপন। ব্যাপনকারী পদার্থের অণু-পরমাণুগুলির গতিশক্তির প্রভাবে এক প্রকার চাপ সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে

অধিক ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কম ঘনত্ব যুক্ত স্থানে অণুগুলি ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রকার চাপকে ব্যাপন চাপ বলে। কোনো পদার্থের অণুর ব্যাপন ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না উক্ত পদার্থের অণুগুলির ঘনত্ব সর্বত্র সমান হয়। অণুগুলির ঘনত্ব সমান হওয়া মাত্রই পদার্থের ব্যাপন বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যাপন বলতে কী বুঝায় তা কয়েকটি পরীক্ষার মাধ্যমে সহজে বুঝা যায়। পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে আলোচনা করে ব্যাপন সম্বন্ধে ev¯Íe জ্ঞান পাওয়া যায়। নিচে ব্যাপন প্রক্রিয়ার কয়েকটি পরীক্ষা আলোচনা করা হলো–

চিত্র ৩.১ : সেন্টের ব্যাপনের পরীক্ষা।

✮ এই পরীক্ষা থেকে তুমি কী বুঝলে, খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

কাজ : কিছু পরিমাণ তুঁতে বিকারের পানিতে ফেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তুঁতে পানিতে `ªexfZ হবে এবং পানির রং তুঁতের রং ধারণ করবে। কেন এমন হলো ব্যাখ্যা কর। পরিশেষে আমাদের চারপাশে সংঘটিত বিভিন্ন ব্যাপন ক্রিয়ার তালিকা তৈরি কর।

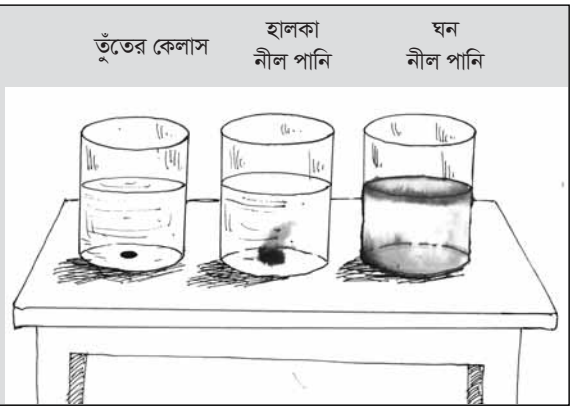

ব্যাপনের গুরুত্ব : জীবের সব রকম শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যাপন প্রক্রিয়ার ঘটে। যেমন-

উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের সময় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এই অত্যাবশ্যক কাজ ব্যাপন দ্বারা সম্ভব হয়। জীবকোষে শ্বসনের সময় গ্লুকোজ জারনের জন্য অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা কোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যায়। উদ্ভিদ দেহে শোষিত পানি ev®úxKv‡i প্রস্বেদনের মাধ্যমে দেহ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বের করে দেয়। প্রাণীদের শ্বসনের সময় অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের আদান-প্রদান ও রক্ত থেকে খাদ্য, অক্সিজেন প্রভৃতির লসিকায় বহন ও লসিকা থেকে কোষে পরিবহন করা ব্যাপন দ্বারা m¤úbœ হয়।

দ্রবণ (Solution) : দ্রাব ও দ্রাবকের মিশ্রণের ফলে যা উৎপন্ন হয়। যেমন- চিনি (দ্রাব) ও পানি (দ্রাবক) মিশিয়ে সরবত (দ্রবণ) তৈরি হয়।

দ্রাব (Solute) : দ্রাবকে যা `exfZ হয়। যেমন -চিনি, লবণ ইত্যাদি

দ্রাবক (Solvent) : দ্রাব যাতে `exfZ হয়। যেমন - পানি।

অভেদ্যপর্দা : যে পর্দা দিয়ে দ্রাবক ও দ্রাব উভয় প্রকার পদার্থের অণুগুলো চলাচল করতে পারে না তাকে অভেদ্য পর্দা বলে। যেমন- পলিথিন, কিউটিনযুক্ত কোষপ্রাচীর।

ভেদ্য পর্দা : যে পর্দা দিয়ে দ্রাবক ও দ্রাব উভয়েরই অণু সহজে চলাচল করতে পারে তাকে ভেদ্য পর্দা বলে। যেমন– কোষপ্রাচীর ।

অর্ধভেদ্য পর্দা : যে পর্দা দিয়ে কেবল দ্রবণের দ্রাবক অণু (উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পানি) চলাচল করতে পারে কিন্তু দ্রাব অণু চলাচল করতে পারে না তাকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলে। যেমন– কোষ পর্দা, ডিমের খোসার ভিতরের পর্দা, মাছের পটকার পর্দা ইত্যাদি।

পাঠ ৩ : অভিস্রবণ

আমরা লক্ষ্য করেছি যদি একটা শুকনা কিসমিসকে পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখি তাহলে সেটি ফুলে উঠে। এটি কিসমিস দ্বারা পানি শোষণের কারণে ঘটে এবং পানি শোষণ অভিস্রবণ দ্বারা ঘটে। অভিস্রবণও এক প্রকার ব্যাপন। অভিস্রবণ কেবলমাত্র তরলের ক্ষেত্রে ঘটে এবং একটি অর্ধভেদ্য পর্দা অভিস্রবণের সময় দুটি তরলকে পৃথক করে রাখে। কিসমিসের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা এখানে বুঝানো হলো।

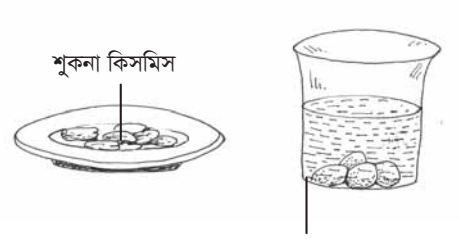

চিত্র ৩.২ : কিসমিসের সাহায্যে অভিস্রবণ পরীক্ষা

আমরা জানি দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একত্র মিশ্রিত হলে স্বাভাবিক ভাবেই এদের মধ্যে ব্যাপন সংঘটিত হয়। লক্ষ করে দেখ কিসমিসের ভিতরের পানি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে কিসমিসগুলো কুচকে গেছে। কিসমিস খেতে মিষ্টি লাগে কারণ কিসমিসের ভিতরে পানির অণুর ঘনত্ব খুবই কম এবং চিনির অণুর ঘনত্ব খুবই বেশি। এখন কিসমিসগুলো পানিতে রাখলে, নিয়ম অনুসারে চিনির (দ্রাব) অণু পানির (দ্রাবক) দিকে এবং পানির অণু চিনির দিকে ধাবিত হবে। কিন্তু কিসমিসের ক্ষেত্রে তা ঘটছে না, কিসমিসটি শুধু পানি শোষণ করে ফুলে উঠছে। কারণ কিসমিসের ভিতরে চিনির একটি গাঢ় দ্রবণ একটি পর্দা দ্বারা পানি থেকে পৃথক হয়ে আছে। ফলে শুধু পানির অণু কিসমিসের অভ্যন্তরে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে, কিন্তু চিনির অণু এই রকম পর্দা ভেদ করে বাইরে আসতে পারছে না। এ ধরনের পর্দাকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলে। অর্থাৎ যে পর্দার মধ্য দিয়ে দ্রাবক (পানি)

এটাই অভিস্রবণ বা অসমোসিস। তাহলে অভিস্রবণের সংজ্ঞা আমরা এভাবে দিতে পারি, একই দ্রাবক (পানি) বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক থাকলে যে ভৌত প্রক্রিয়ায় দ্রাবক (পানি) কম ঘনত্বের (অধিক পানি) দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের (কম পানি) দ্রবণের দিকে ব্যাপিত হয় তাকে অভিস্রবণ বা অসমোসিস বলে।

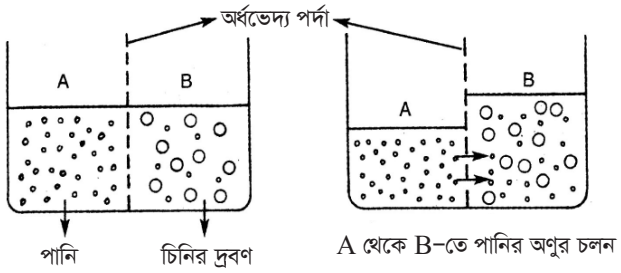

চিত্র ৩.৩ : অভিস্রবণ প্রক্রিয়া

পাঠ : ৪ অভিস্রবণের গুরুত্ব

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় লবণ উদ্ভিদদেহে `exfZ অবস্থায় জীবকোষে প্রবেশ করে। জীবকোষের কোষাবরণ বা প্লাজমা পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করে। প্লাজমা পর্দা দিয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানিতে `ªefZ বিভিন্ন খনিজ লবণ কোষের মধ্যে প্রবেশ করে বা বাইরে আসে। পানি ও পানিতে `exfZ খনিজ লবণকে একত্রে কোষ রস বা সংক্ষেপে রস বলে। সুতরাং কোষের মধ্যে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলিকে সচল রাখার জন্য অভিস্রবণের fzgKv Le ¸iZ¡cY©। এ প্রক্রিয়ার দ্বারা :

উদ্ভিদ এককোষী gj‡ivg দিয়ে মাটি থেকে পানি ও পানিতে `exfZ খনিজ লবণ শোষণ করতে পারে। কোষের রসস্ফীতি ঘটে এবং কাণ্ড ও পাতাকে সতেজ এবং খাড়া রাখতে সাহায্য করে। ফুলের পাঁপড়ি বন্ধ বা খুলতে পারে। প্রাণীর অন্ত্রে খাদ্য শোষিত হতে পারে।

কাজ : থিসল ফানেলের চওড়া মুখটি মাছের পটকায় ঢেকে সুতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে এবং বিকারটিতে অর্ধেক পর্যন্ত পানি নিতে হবে। বিকারে পানি নেওয়ার পর থিসল ফানেলের নল দিয়ে চিনির গাঢ় দ্রবণ ঢেলে ফানেলের চওড়া মুখটি বিকারের পানিতে m¤úY ডুবিয়ে ফানেলটিকে ক্ল¨v‡¤úi সাহায্যে স্ট্যান্ডের সাথে আটকে রাখতে হবে। এরপর ফানেলের নলে চিনির দ্রবণের তলটি মার্কার পেন দিয়ে চিহ্নিত করে পরীক্ষা -ব্যবস্থাটিকে এক স্থানে রেখে দিতে হবে।

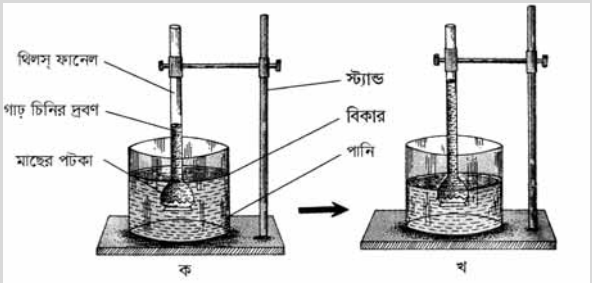

চিত্র ৩.৪ : অভিস্রবণের পরীক্ষা ক. পরীক্ষার শুরুতে, খ. পরীক্ষার কয়েক ঘণ্টা পরে

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে থিসল ফানেলের নলের দ্রবণের তল উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ফানেলের নলের দ্রবণের তল আর উপরে উঠছে না।

এ পরীক্ষায় তুমি যা পর্যবেক্ষণ করলে তা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তরে লেখ-

১. মাছের পটকার পর্দাটি কী ধরনের পর্দা?

২. চিনির দ্রবণ কেন ফানেলের নলের উপরে উঠে আসল?

৩. কিছুক্ষণ পর ফানেলের পানি উপরে না উঠে স্থায়ীভাবে কেন অবস্থান করল?

কাজ : প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাপন ও অভিস্রবণের পার্থক্য ছক করে পোস্টার কাগজে উপস্থাপন কর এবং শ্রেণি আলোচনায় অংশগ্রহণ কর।

পাঠ : ৫ উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ শোষণ

উদ্ভিদের পানি শোষণ পদ্ধতি : মাটি থেকে পানি ও পানিতে `exfZ খনিজ লবণ উদ্ভিদ দেহের সজীব কোষে টেনে নেওয়ার পদ্ধতিকে সাধারণভাবে শোষণ বলা যেতে পারে। স্থলে বসবাসকারী উদ্ভিদগুলি gj‡iv‡gi সাহায্যে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। পানিতে নিমজ্জিত উদ্ভিদরা সারাদেহ দিয়ে পানি শোষণ করে। স্থলজ উদ্ভিদগুলির gj‡ivg মাটির m²KYvi ফাঁকে লেগে থাকা কৈশিক পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় নিজ দেহে টেনে নেয়।

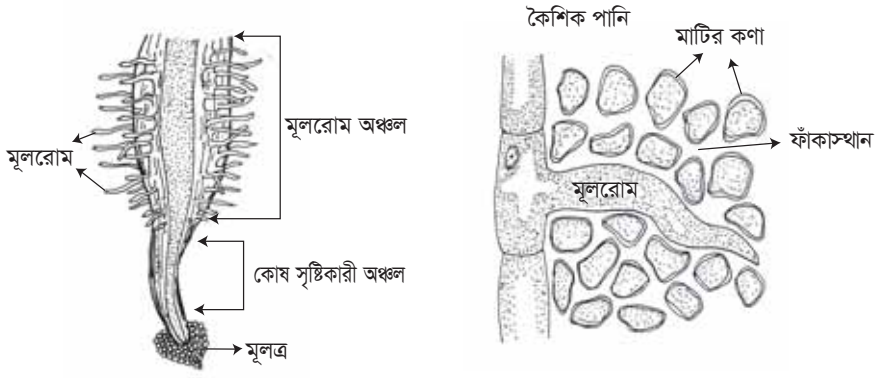

চিত্র ৩.৫ : মূলের বিভিন্ন অঞ্চল

gj‡iv‡gi প্রাচীরটি ভেদ্য তাই প্রথমে ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে এবং কোষ প্রাচীরের নিচে অবস্থিত অর্ধভেদ্য পাজমা পর্দার ms¯ú‡k আসে। gj‡iv‡gi কোষীয় দ্রবণের ঘনত্বের তুলনায় তার পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কম থাকায় পানি (দ্রাবক) কোষের মধ্যে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। এখানে কিন্তু পানির ঘনত্ব বাইরে বেশি এবং কোষ অভ্যন্তরে কম। আমরা c‡e জেনেছি পদার্থের অণুগুলোর ধর্ম n‡"Q বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে ধাবিত হওয়া। তাই পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কোষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সুতরাং শোষণ হলো ব্যাপন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার যৌথ ফল। g‡ji বাইরের আবরণ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সব কোষের কোষ রসের ঘনত্ব সমান নয়। ফলে কোষান্তর অভিস্রবণের কারণে g‡ji এক কোষ থেকে অন্য কোষে পানির গতি অব্যাহত থাকে এবং পরিশেষে পানি কান্ডের জাইলেম বাহিকার মাধ্যমে পাতায় পৌছায়।

ইমবাইবিশন : অধিকাংশ কলয়েডধর্মী পদার্থই পানিগ্রাহী। উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন ধরনের কলয়েডধর্মী পদার্থ বিদ্যমান। যথা- স্টার্চ, সেলুলোজ, জিলেটিন ইত্যাদি। এসব পদার্থ তাদের কলয়েডধর্মী গুণের জন্যই পানি শোষণ করতে সক্ষম। কলয়েডধর্মী বিভিন্ন পদার্থ (উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কোষ প্রাচীর।) যে প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের তরল পদার্থ (উদ্ভিদের ক্ষেত্র পানি) শোষণ করে তাকে ইমবাইবিশন বলে।

উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কতগুলি খনিজ লবণের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণের উৎস মাটিস্থ পানি। মাটিস্থ পানিতে খনিজ লবণ `e¨fZ অবস্থায় থাকে।

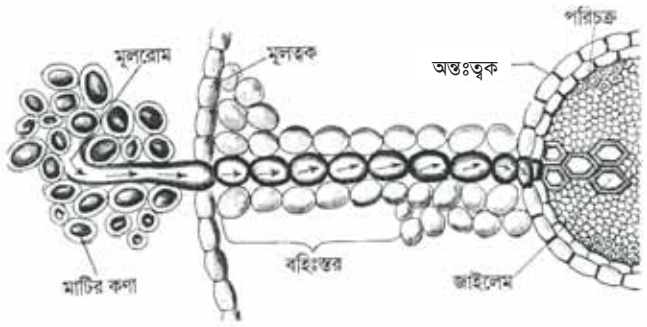

চিত্র ৩.৬ : মূলের কোষে অভিস্রবণের দ্বারা পানি শোষণ

খনিজ লবণগুলি মাটিস্থ পানিতে `e¨fZ থাকলেও পানি শোষণের সঙ্গে উদ্ভিদের লবণ শোষণের কোনো m¤úK †নই, দুটি প্রক্রিয়াই ভিন্নধর্মী । উদ্ভিদ কখনও লবণের m¤úY অণুকে শোষণ করতে পারে না। লবণগুলো কেবল আয়ন হিসেবে শোষিত হয়। উদ্ভিদ মাটির রস থেকে খনিজ লবণ শোষণ দুইভাবে m¤úb করে। যথা : (১) নিষ্ক্রিয় শোষণ; (২) সক্রিয় শোষণ।

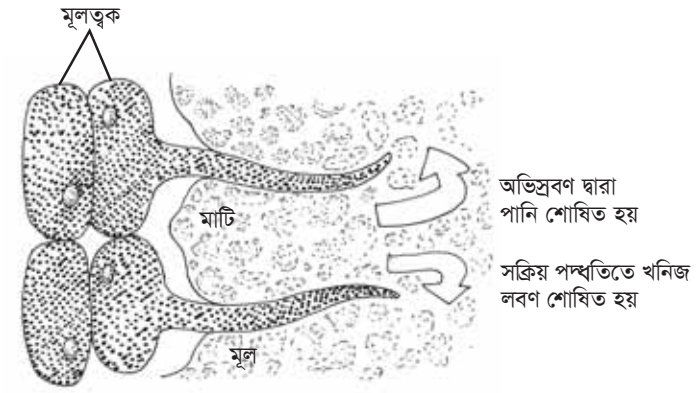

চিত্র ৩.৭ : মূল দ্বারা পানি ও খনিজ লবণ শোষণ

পাঠ ৬ : প্রস্বেদন

প্রস্বেদন বা e¨®ú‡gvPb উদ্ভিদের একটি বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। আমরা c‡ei পাঠে জেনেছি, উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য পানি অপরিহার্য। তাই উদ্ভিদ gj‡iv‡gi সাহায্যে মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি শোষণ করে। শোষিত পানির কিছু অংশ উদ্ভিদ তার বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে ব্যবহার করে এবং বাকি অংশ e¨®úvKv‡i বায়ুমন্ডলে পরিত্যাগ করে। উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে e¨®úvKv‡i পানির এই নির্গমনের প্রক্রিয়াকে প্রস্বেদন বা e¨®ú‡gvPb বলে।

প্রস্বেদন প্রধানত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে হয়, এছাড়া কাণ্ড ও পাতার কিউটিক্‌ল এবং কাণ্ডের ত্বকে অবস্থিত লেন্টিসেল নামক এক বিশেষ ধরনের অঙ্গের মাধ্যমেও অল্প পরিমাণ প্রস্বেদন হয়। প্রস্বেদনের স্থানের ভিত্তিতে প্রস্বেদন তিন

প্রকার যথা- ১) পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন, ২) ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রস্বেদন এবং ৩) লেন্টিকুলার প্রস্বেদন।

চিত্র ৩.৮ : প্রস্বেদনের স্থান

শ্রেণিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পত্ররন্ধ্র দেখাবেন এবং খালি চোখে কাণ্ডের লেন্টিসেল দেখাবেন।

পাঠ ৭

কাজ : দুটি টবে লাগানো গাছ টেবিলের উপর রেখে গাছের গোড়ায় পরিমাণ মতো পানি দাও। একটি গাছকে পাতাযুক্ত রেখে পলিথিনের মোড়ক দিয়ে ঢেকে দিয়ে গাছের গোড়ায় পলিথিনটি সুতা দিয়ে বেঁধে ঐ স্থানে ভেসলিনের প্রলেপ দিতে হবে যাতে বাইরের থেকে বাতাস বা পানি না যেতে পারে। অপর গাছটির পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে একইভাবে প্রথম গাছটির মতো পলিথিন মোড়ক দিয়ে ঢেকে ফেল। গাছ দুটিকে m‡hi আলোতে রাখ।

চিত্র ৩.৯ : পলিথিন মোড়ক দিয়ে প্রস্বেদন পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখবে পাতাযুক্ত গাছের টবে পলিথিনের ভিতরে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে কিন্তু পাতাবিহীন গাছের টবে পলিথিনের ভিতরে পানি জমেনি।

পাতাযুক্ত গাছের টবে পলিথিনের ভিতরে কেন পানি বিন্দু বিন্দু জমেছে এবং পাতাবিহীন টবে পলিথিনে কেন পানি বিন্দু জমেনি?

এ পরীক্ষা থেকে তুমি কী প্রমাণ করলে?

তোমার এ পর্যবেক্ষণ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্তে উপনীত হবে?

পাঠ ৮ : প্রস্বেদনের গুরুত্ব

উদ্ভিদ জীবনে প্রস্বেদন একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া। প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদ দেহ থেকে প্রচুর পানি eví®úvKv‡i বেরিয়ে যায়। এতে উদ্ভিদের মৃত্যুও হতে পারে। তাই আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভিদের জীবনে প্রস্বেদনকে ক্ষতিকর প্রক্রিয়া বলেই মনে হয়। এজন্য প্রস্বেদনকে বলা হয় উদ্ভিদের জন্য এটি একটি "Necessary evil". কিন্তু তবুও প্রস্বেদন উদ্ভিদ জীবনে খুবই ¸iZcY| কারণ :

প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদ তার দেহ থেকে পানিকে বের করে অতিরিক্ত পানির চাপ থেকে মুক্ত করে। প্রস্বেদনের ফলে কোষ রসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। কোষ রসের ঘনত্ব বৃদ্ধি অন্তঃঅভিস্রবণের সহায়ক হয়ে উদ্ভিদকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণে সাহায্য করে। উদ্ভিদ দেহকে ঠান্ডা রাখে এবং পাতার আর্দ্রতা বজায় রাখে। প্রস্বেদনের ফলে খাদ্য তৈরির

জন্য পাতায় অবিরাম পানি সরবরাহ সম্ভব হয়। পাতায় প্রস্বেদনের ফলে জাইলেম বাহিকায় পানির যে টান সৃষ্টি হয় তা gj‡ivg কর্তৃক পানি শোষণে উদ্ভিদের শীর্ষে পরিবহনে সাহায্য করে।

উদ্ভিদের প্রস্বেদন প্রক্রিয়া সালোকসংশেষণ ও শ্বসনের মতো পরিবেশে তেমন কোনো প্রভাব রাখে না। তবে পানিচক্রে ev®úxfe‡b অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের পানি জলীয়ev®ú হিসেবে বায়ুমন্ডলে প্রেরণ করতে স্থলজ উদ্ভিদের প্রস্বেদন প্রক্রিয়া fwgKv রাখে। প্রস্বেদনের ফলে প্রচুর পানি ev®úwKv‡i বায়ুমন্ডলে পৌছায়।

প্রাণীজ ও খনিজ লবণের পরিবহন

আমরা জেনেছি যে উদ্ভিদ g‡ji gj‡iv‡gi সাহায্যে পানি ও খনিজ লবণ মাটি থেকে শোষণ করে। এই পানি ও খনিজ লবণের দ্রবণকে কান্ড এবং শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে পাতায় পৌছানো দরকার। কারণ পাতাই প্রধানত এগুলিকে সালোকসংশেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরির রসদ হিসেবে ব্যবহার করে। আবার পাতায় তৈরি খাদ্য উদ্ভিদ তার দেহের বিভিন্ন অংশে যথা– কান্ড ও শাখা-প্রশাখায় পাঠিয়ে দেয়। উদ্ভিদের gj‡ivg দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ লবণ gj থেকে পাতায় পৌছানো এবং পাতায় তৈরি Lv`¨e¯‘ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়াকে পরিবহন বলে। শোষণের মতো পরিবহন পদ্ধতিটিও উদ্ভিদের অতি ¸iZcY| উদ্ভিদের পরিবহন টিস্যু – জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহন ঘটে। জাইলেমের মাধ্যমে gj দ্বারা শোষিত পানি পাতায় যায় এবং ফ্লোয়েম দ্বারা পাতায় উৎপন্ন তরল খাদ্য সারা দেহে পরিবাহিত হয়। সুতরাং উদ্ভিদের পরিবহন কলা ¸"Q জাইলেম ও ফ্লোয়েম হলো উদ্ভিদের পরিবহনের পথ। উদ্ভিদের পরিবহন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিতভাবে m¤úb হয়

উদ্ভিদের gj‡ivg দিয়ে পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় এবং পানিতে `exfZ খনিজ লবণ নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় পদ্ধতিতে শোষিত হয়ে জাইলেম টিস্যুতে পৌছায়। জাইলেমের মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহে রসের উর্ধ্বমুখী পরিবহন হয়। ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পাতায় তৈরি খাদ্য রসের নিম্নমুখী পরিবহন হয়।

উদ্ভিদের সংবহন বা পরিবহন বলতে প্রধানত উর্ধ্বমুখী পরিবহন এবং নিম্নমুখী পরিবহনকে বোঝায়।

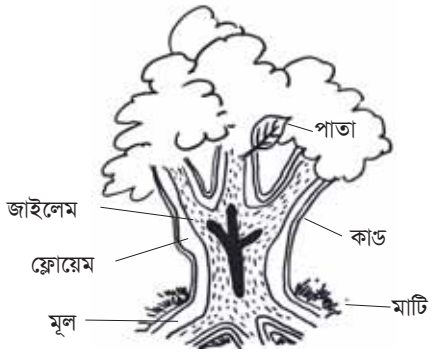

↑ উর্ধ্বমুখি পরিবহন ↔ উভমুখি পরিবহন

চিত্র ৩.১০ : উদ্ভিদদেহে পরিবহন

পাঠ ৯-১১

মাটি থেকে gj‡iv‡gi দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ লবণের দ্রবণ (রস) যে জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে পাতায় পৌছায় তা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। এ জন্য প্রয়োজন পেপেরোমিয়া উদ্ভিদ। এ গাছের কান্ড ও মধ্য শিরা ¯^"Q|

কাজ :
একটি নরম কাণ্ডের দোপাটি অথবা পেপেরোমিয়া উদ্ভিদ মাটি থেকে gj সমেত তুলে তার gj¸‡j॥ পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এখন একটি বিকারে পানি নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা লাল রং মিশাতে হবে। এবার গাছের gjmn অংশটি রঞ্জিন পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।
কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাবে যে কাণ্ড এবং পাতার শিরাগুলো লাল রঙ ধারণ করেছে। গাছটি বিকার থেকে তুলে কাণ্ডের c¯’‡”Q` বা j¤^‡”Q` করে অণুবীণ যন্ত্রে দেখ এবং তা লিপিবদ্ধ কর। তোমার পর্যবেক্ষণ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্তে উপনীত হবে এবং এতে কী প্রমাণ হলো।

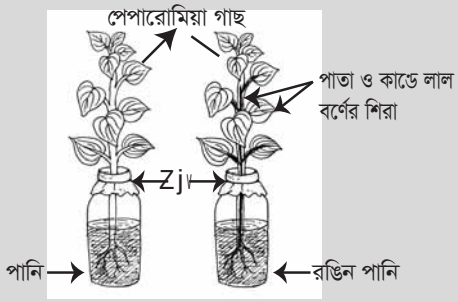

চিত্র ৩.১১ : পানি পরিবহনের পরীক্ষা

নতুন শব্দ

ব্যাপন, অন্তঃঅভিস্রবণ, অর্ধভেদ্য পর্দা, বহিঃঅভিস্রবণ, ভেদ্য পর্দা, আয়ন, কোষ রস, সক্রিয় শোষণ, অভিস্রবণ, নিষ্ক্রিয় শোষণ, প্রস্বেদন।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম–

- ব্যাপন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়া কী?
- উদ্ভিদ-ব্যাপন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি খনিজ লবণের আয়ন মাটিস্থ দ্রবণ থেকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় g‡ji gj‡রাম দ্বারা শোষণ করে।
- উদ্ভিদের জাইলেম দিয়ে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ পাতায় পরিবাহিত হয়।
- উদ্ভিদের ফ্লোয়েম দিয়ে পাতায় তৈরি খাদ্য উদ্ভিদ দেহের শাখা ও প্রশাখায় পৌঁছায়।
- প্রস্বেদনের ফলে খাদ্য তৈরির জন্য পাতায় অবিরাম পানি সরবরাহ সম্ভব হয়।
- প্রস্বেদনের ফলে জাইলেম বাহিকায় যে টান সৃষ্টি হয় তা gj‡ivg কর্তৃক পানি শোষণে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ কর

১. স্থলজ উদ্ভিদে প্রস্বেদন ঘটে ——— দিয়ে।

২. কোষ পর্দা এক ধরনের ——— পর্দা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে পানি নির্গমন প্রক্রিয়াকে কী বলে?

ক. ব্যাপন খ. অভিস্রবণ
গ. প্রস্বেদন ঘ. ইমবাইবিশন

২. অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়-

i. অর্ধভেদ্য পর্দার প্রয়োজন হয়
ii. দ্রাব কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয়
iii. দ্রাবক কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ঘর সাজানোর জন্য আনোয়ারা কিছু রজনীগন্ধা ফুল ফুলদানিতে রাখল। সন্ধ্যাবেলা সে লক্ষ করল, ফুলের সুবাসে m¤úY ঘর ভরে গেছে। এই ঘটনার সংগে তার বিজ্ঞান বইয়ে পঠিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মিল লক্ষ করল।

৩. উদ্দীপকের বিশেষ প্রক্রিয়াটি কী?

ক. ব্যাপন খ. AwfmeY
গ. প্রস্বেদন ঘ. শ্বসন

৪. উল্লিখিত প্রক্রিয়ায়-

i. জীবকোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে
ii. উদ্ভিদ দেহ থেকে পানি বের করে দেয়
iii. উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জারিফের আম্মা একদিন সেমাই রান্না করার জন্য কিসমিস ভিজিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ পরে জারিফ লক্ষ করল, কিসমিসগুলো ফুলে গেছে। অন্যদিকে জারিফের বোন রংতুলি দিয়ে ছবি আঁকছিল। এ সময় হঠাৎ করে রংতুলিতে থাকা কিছুটা রং গ্লাসের পানির মধ্যে পড়ে পানিতে ছড়িয়ে গেল।

ক. ভেদ্য পর্দা কাকে বলে?
খ. ইমবাইবিশন বলতে কী বুঝায়?
গ. কোন প্রক্রিয়ায় জারিফের বোনের রংতুলির উপকরণটি পানিতে ছড়িয়ে গেল? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জারিফের লক্ষ করা কিসমিস ফুলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের জন্য ¸iZcÝ কেন? বিশ্লেষণ কর।

২. স্কুল থেকে বাসায় ফিরে আদিবা লক্ষ করল, টবে থাকা গাছগুলো সব নেতিয়ে পড়েছে। বিকাল বেলা সে গাছগুলোতে পানি দিল। পরদিন সকালে দেখল গাছগুলো সতেজতা ফিরে পেয়েছে।

ক. ব্যাপন কাকে বলে?
খ. প্রস্বেদনকে কেন Necessary evil বলা হয়?
গ. টবে থাকা গাছগুলো নেতিয়ে পড়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. পরবর্তীতে গাছগুলো কীভাবে সতেজতা ফিরে পেল? বিশ্লেষণ কর।

প্রজেক্ট : একটা টবে মরিচ/টমেটো চারা গাছ লাগাও। গাছটা সতেজ হলে টবে ইউরিয়ার ঘন দ্রবণ দাও। কয়দিন পরে পর্যবেক্ষণ কর চারা গাছটির কী অবস্থা হয়েছে? পর্যবেক্ষণে যা দেখবে তা লিপিবদ্ধ কর এবং এর কারণ কী লিখ। এটি কী প্রমাণ করে তা শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর? তোমার এই পর্যবেক্ষণ থেকে তুমি তোমার এলাকার কৃষক ভাইদের কী উপদেশ দিবে ?

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্ভিদে বংশ বৃদ্ধি

তোমরা লক্ষ করলে দেখবে এক জোড়া কবুতর হতে বছর ঘরুতে না ঘুরতে অনেকগুলো কবুতর হয়ে যায়। একটি গাভি বছর বছর ev"Pv দিয়ে গোয়াল ঘর ভরে দেয়। একটি উদ্ভিদে বহু বীজ সৃষ্টি হয়। এই বীজগুলো থেকে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। এ সবই জীবের প্রজনন বা বংশ বৃদ্ধির উদাহরণ।

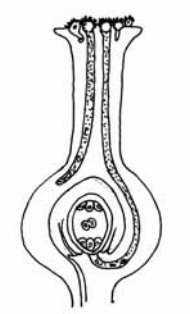
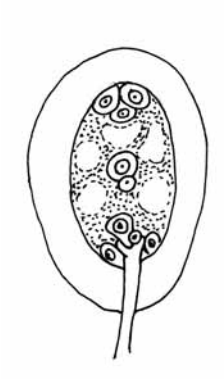

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- যৌন এবং অযৌন প্রজননের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার পরাগায়নের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- পারিবেশে সংঘটিত স্বপরাগায়ন এবং পর পরাগায়ন চিহ্নিত করে কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরাগায়ন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষার মাধ্যমে অঙ্কুরোদগম প্রদর্শন করতে পারব।

পাঠ ১-৩ : অযৌন প্রজনন

পৃথিবীর প্রতিটি জীব মৃত্যুর c‡e তার বংশধর রেখে যেতে চায়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। যে জটিল প্রক্রিয়ায় জীব তার cwZic বা বংশধর সৃষ্টি করে তাকে প্রজনন বলে। প্রজনন প্রধানত দুই প্রকার, যথা অযৌন ও যৌন প্রজনন।

যে প্রজনন প্রক্রিয়া যৌন জনন কোষ সৃষ্টি ও দুটো জনন কোষের মিলন ছাড়াই mu¤úb হয় তাই অযৌন জনন। নিম্নশ্রেণির জীবে অযৌন জননের প্রবণতা বেশি। অযৌন প্রজনন প্রধানত দুই ধরনের, যথা †¯úwi উৎপাদন ও অঙ্গজ প্রজনন।

(ক) †¯úwi উৎপাদন : প্রধানত নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে অণুবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে বংশ রক্ষা করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। উদ্ভিদের দেহকোষ পরিবর্তিত হয়ে অণুবীজবাহী একটি অঙ্গের সৃষ্টি করে। এদের অণুবীজথলী বলে। একটি অণুবীজথলিতে সাধারণত অসংখ্য অণুবীজ থাকে। তবে কখনও একটি থলিতে একটি অণুবীজ থাকতে পারে। অণুবীজথলির বাইরেও উৎপন্ন হয়। এদের বহিঃঅণুবীজ বলে। বহিঃঅণুবীজের কোনোটিকে কনিডিয়াম বলে। Mucor উদ্ভিদে অসংখ্য অণুবীজথলের মধ্যে উৎপন্ন হয়। *Penicillium* কনিডিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে।

(খ) **অঙ্গজ প্রজনন :** কোনো ধরনের অযৌন রেণু বা জনন কোষ সৃষ্টি না করে দেহের অংশ খন্ডিত হয়ে বা কোনো প্রত্যঙ্গ রূপান্তরিত হয়ে যে প্রজনন ঘটে তাকে অঙ্গজ প্রজনন বলে। এ ধরনের প্রজনন প্রাকৃতিক নিয়মে বা স্বতস্ফুর্তভাবে ঘটলে তাকে প্রাকৃতিক অঙ্গজ প্রজনন বলা হয়। যখন কৃত্রিমভাবে অঙ্গজ প্রজনন ঘটানো হয় তখন তাকে কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন বলে।

প্রাকৃতিক অঙ্গজ প্রজনন : বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্বাভাবিক নিয়মেই এ ধরনের অঙ্গজ প্রজনন দেখা যায়, যেমন চুপড়ী আলু, কলা, ঘাস ইত্যাদি।

১। **দেহের খন্ডায়ন :** সাধারণত নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে এ ধরনের প্রজনন দেখা যায়। *Spirogyra, Mucor* ইত্যাদি উদ্ভিদের দেহ কোনো কারণে খন্ডিত হলে প্রতিটি খন্ড একটি স্বাধীন উদ্ভিদ হিসেবে জীবনযাপন শুরু করে।

২। **মলের মাধ্যমে :** কোনো কোনো উদ্ভিদের gj থেকে শিশু উদ্ভিদের সৃষ্টি হতে দেখা যায়, যেমন– সেগুন, পটোল ইত্যাদি। কোনো কোনো gj খাদ্য mÂ‡qi মাধ্যমে বেশ মোটা ও রসালো হয়। এর গায়ে কুঁড়ি সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে নতুন উদ্ভিদ গজায়, যেমন– মিষ্টি আলু।

৩। **রূপান্তরিত কান্ডের মাধ্যমে :** উদ্ভিদের কোন অংশকে কান্ড বলে তা নিশ্চয়ই তোমরা জান। তবে কিছু কান্ডের অবস্থান ও বাইরের চেহারা দেখে তাকে কান্ড বলে মনেই হয় না। এরা পরিবর্তিত কান্ড। বিভিন্ন c‖ZKjZv ঠেকাতে, খাদ্য mÂq করতে অথবা অঙ্গজ প্রজননের প্রয়োজনে এরা পরিবর্তিত হয়। এদের বিভিন্ন ic নিম্নে দেওয়া হলো :

(ক) **টিউবার :** কিছু কিছু উদ্ভিদে মাটির নিচের শাখার অগ্রভাগে খাদ্য mÂ‡qi ফলে ফুলে কন্দের সৃষ্টি করে, এদের টিউবার বলে। ভবিষ্যতে এ কন্দ প্রজননের কাজ করে। কন্দের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত থাকে। এগুলো দেখতে চোখের ন্যায় তাই এদের চোখ বলা হয়। একটা চোখের মধ্যে একটি কুঁড়ি থাকে। আঁশের ন্যায় অসবুজ পাতার (শল্কপত্র) কক্ষে এসব কুঁড়ি জন্মে। প্রতিটি চোখ থেকে একটি স্বাধীন উদ্ভিদের জন্ম হয়, যেমন- আলু।

কাজ : আলু ও আদা থেকে কীভাবে অঙ্গজ প্রজনন ঘটে তা হাতেকলমে দেখাও।

(খ) **রাইজোম :** এরা মাটির নিচে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। এদের পর্ব, পর্বসন্ধি ¯úó| পর্বসন্ধিতে শল্কপত্রের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল জন্মে। এরাও খাদ্য mÂq করে মোটা ও রসালো হয়। AbKj পরিবেশে এসব মুকুল বৃদ্ধি পেয়ে আলাদা আলাদা উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। আদা উদ্ভিদে এ ধরনের রাইজোম দেখা যায়।

(গ) **কন্দ :** এরা অতি ক্ষুদ্র কান্ড। এদের কাক্ষিক ও শীর্ষ gKj নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়, যেমন– পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি।

(ঘ) **স্টোলন :** তোমরা কচুর লতি দেখে থাকবে। এগুলো কচুর শাখাকান্ড। এগুলো প্রজননের জন্যই পরিবর্তিত হয়। স্টোলনের অগ্রভাগে gKj উৎপন্ন হয়। এভাবে স্টোলন উদ্ভিদের প্রজননে সাহায্য করে, যেমন– কচু, পুদিনা।

(ঙ) **অফসেট :** কচুরি পানা, টোপাপানা ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদে শাখা কান্ড বৃদ্ধি পেয়ে একটি নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। কিছুদিন পর মাতৃউদ্ভিদ থেকে এটি we‖"Qb হয়ে স্বাধীন উদ্ভিদে পরিণত হয়, যেমন– কচুরি পানা।

(চ) **পর্ণকান্ড বা ফাইলোক্ল্যাড :** পানি সংরক্ষণ, পরিমিত মাত্রায় খরচ ও অপচয় রোধের জন্য মরু উদ্ভিদের পাতা ছোট

হয় এবং কণ্টকে পরিণত হয়। কাণ্ড পানি সংরক্ষণের জন্য রসালো হয় ও পাতার ন্যায় চ্যাপ্টা ও সবুজ হয় এবং নিজেই পাতার কাজ করে। যেমন- ফণিমনসা।

(ছ) **বুলবিল :** কোনো কোনো উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি যথাযথভাবে না হয়ে একটি পিন্ডের ন্যায় আকার ধারণ করে। এদের বুলবিল বলে। এসব বুলবিল কিছুদিন পর গাছ থেকে খসে মাটিতে পড়ে এবং নতুন গাছের জন্ম দেয়, যেমন- চুপড়ি আলু।

(জ) **পাতার মাধ্যমে :** কখনও কখনও পাতার কিনারায় মুকুল সৃষ্টি হয়ে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। যেমন- পাথরকুচি।

এতক্ষণ যেসব প্রক্রিয়ার কথা বলা হলো তা প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে। অঙ্গজ প্রজননে উৎপাদিত উদ্ভিদ মাতৃউদ্ভিদের ন্যায় MYm¤úb হয়। এর ফলে কোনো নতুন বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটে না। উন্নত গুণm¤úb অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে তাই অনেক সময় কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন ঘটানো হয়।

কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন : ভালো জাতের আম, কমলা, লেবু, পেঁয়াজ ইত্যাদি গাছের কলম করতে তোমরা দেখেছ। কেন কলম করা হয় তা কি ভেবে দেখেছ? যেসব উদ্ভিদের বীজ থেকে উৎপাদিত উদ্ভিদের ফলন মাতৃউদ্ভিদের তুলনায় অনুন্নত ও পরিমাণে কম হয় সাধাণত সেসব উদ্ভিদে কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে মাতৃউদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা হয়। এবার এসো কৃত্রিম প্রজনন সম্পর্কে আমরা জানি।

১। **কলম** (Grafting) : গাছের একটি সরল, কচি ও তরতজা শাখা থেকে এ ধরনের পদ্ধতিতে gj গজিয়ে শাখাটিকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য c¯‘Z করা হয়। উপযুক্ত স্থানে বাকল সামান্য কেটে নিতে হয়। এবার ঐ ক্ষত স্থানটি মাটি ও গোবর মিশিয়ে ভালোভাবে আবৃত করে দিতে হবে। এবার সেলোফেন টেপ অথবা পলিথিন দিয়ে মুড়ে দিতে হবে যাতে পানি লেগে মাটি খসে না যায়। নিয়মিত পানি দিয়ে এ অংশটি মাঝে-মধ্যে ভিজিয়ে দিতে হবে। এভাবে কিছুদিন রেখে দিলে এ সথানে gj গজাবে। এর পরে gjmn শাখার এ অংশটি মাতৃউদ্ভিদ থেকে কেটে নিয়ে মাটিতে রোপণ করে দিলে নতুন একটি উদ্ভিদ হিসেবে বেড়ে উঠবে।

২। কাটিং (Cutting) : তোমরা লক্ষ করেছ যে গোলাপের ডাল কেটে ভেজা মাটিতে পুঁতে দিলে কিছুদিনের মধ্যেই তা থেকে নতুন কুঁড়ি উৎপন্ন হয়। এসব কুঁড়ি বড় হয়ে একটি নতুন গোলাপ ফুল গাছ উৎপন্ন করে।

> **কাজ :** শাখা কলম বা কাটিং কীভাবে প্রস্তুত করতে হয় তা একটি গোলাপের ডাল নিয়ে প্রদর্শন কর।

পাঠ ৪ : mc®úK উদ্ভিদের জনন অঙ্গ ফুল

ফুল থেকে ফল এবং ফল থেকে বীজ হয়। বীজ থেকে নতুন গাছের জন্ম হয়। তাই ফুল উদ্ভিদের একটি ¸iZcY অঙ্গ। এভাবে একটি mc®úK উদ্ভিদ বংশ বৃদ্ধি করে। তোমার বিদ্যালয় বা বাড়ির আশেপাশে বহু ফুল ফুটে থাকে।

এগুলো থেকে দুইএকটি এনে পর্যবেক্ষণ করে দেখ। একটি ফুল নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখবে এর মোট পাঁচটি অংশ রয়েছে। অংশগুলো হলো c®úÿক্ষ, বৃতি, দল বা পাপড়ি, পুংকেশর ও গর্ভকেশর। কোনো কোনো ফুলে এর চেয়ে বাড়তি কিছু অংশ থাকতে পারে, যেমন–জবা ফুলের উপবৃতি। আবার এ পাঁচটির যে কোনো একটি বা দুটি অংশ নাও থাকতে পারে। সবগুলো ¯ÍeK থাকলে তাকে m¤úY ফুল বলে। তবে কোনো একটি ¯ÍeK না থাকলে তাকে Am¤úY ফুল বলে। বৃন্ত থাকলে তাকে সবৃন্তক এবং বৃন্ত না থাকলে অবৃন্তক ফুল বলে।

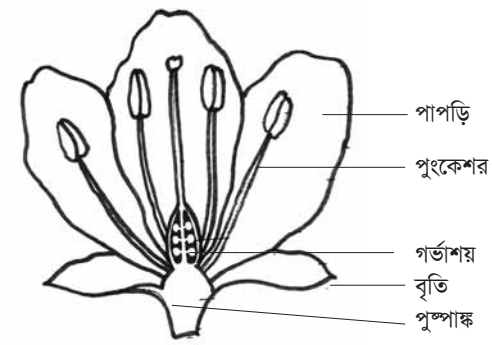

চিত্র ৪.১ : একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ

ফুলের বিভিন্ন অংশ

বৃতি : ফুলের সর্ব বাহিরের ¯ÍeK‡K বৃতি বলে। সাধারণত এরা সবুজ রঙের হয়। বৃতি খন্ডিত না হলে সেটি যুক্ত বৃতি, কিন্তু যখন এটি খন্ডিত হয় তখন বিযুক্ত বৃতি বলে। এর প্রতি খন্ডকে বৃত্যাংশ বলে।

বৃতি ফুলের অন্য অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি ও পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করে।

দলমন্ডল : এটি বাইরের দিক থেকে দ্বিতীয় ¯ÍeK| কতগুলো পাপড়ি মিলে দলমন্ডল গঠন করে। এর প্রতিটি অংশকে পাপড়ি বা দলাংশ বলে। পাপড়িগুলো পরস্পর যুক্ত (ধুতরা) অথবা পৃথক (জবা) থাকতে পারে। এরা বিভিন্ন রঙের হয়।

দলমন্ডল রঙিন হওয়ায় পোকা-মাকড় ও পশুপাখি আকর্ষণ করে ও পরাগায়ন নিশ্চিত করে। এরা ফুলের অন্য অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

পুং¯Íবক : এটি ফুলের তৃতীয় ¯ÍeK| GB ¯Íe‡K প্রতিটি অংশকে পুংকেশর বলে। পুংকেশরের দন্ডের ন্যায় অংশকে পুংদন্ড এবং শীর্ষের থলের ন্যায় অংশকে পরাগধানী বলে। পরাগধানীর মধ্যে পরাগ উৎপন্ন হয়। পরাগ থেকে পুং জননকোষ উৎপন্ন হয়। এরা সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে।

> **কাজ :** একটি জবা ও একটি ধুতরা ফুল সংগ্রহ কর এবং এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করে দেখাও।

¯¿x¯ÍeK **বা গর্ভকেশর :** এটি ফুলের চতুর্থ ¯ÍeK| GK ev GKvaK গর্ভপত্র নিয়ে একটি ¯¿x¯ÍeK গঠিত হয়। একের অধিক গর্ভপত্র m¤úY fv‡e ci¯ú‡iর সাথে যুক্ত থাকলে তাকে যুক্তগর্ভপত্রী, আর আলাদা খাকলে বিযুক্তগর্ভপত্রী বলে। একটি গর্ভপত্রের তিনটি অংশ, যথা- গর্ভাশয়, গর্ভদন্ড ও গর্ভমুন্ড। গর্ভাশয়ের ভিতরে ডিম্বক সাজানো থাকে। ডিম্বকে ¯¿x জননকোষ বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। এরা cs¯Íe‡Ki ন্যায় সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে।

বৃত্তি ও দলমন্ডলকে ফুলের সাহায্যকারী স্তবক এবং পুং¯Íবক ও স্ত্রী¯Íবককে অত্যাবশ্যকীয় স্তবক বলে।

পুষ্পমঞ্জরী

c®úgÄix তোমরা সবাই দেখেছ। গাছের ছোট একটি শাখায় ফুলগুলো বিশেষ একটি নিয়মে সাজানো থাকে। ফুলসহ এই শাখাকে c®úgÄix বলে। পরাগায়নের জন্য এর গুরুত্ব খুব বেশি। এ শাখার বৃদ্ধি অসীম হলে অনিয়ত c®úgÄix I বৃদ্ধি সসীম হলে তাকে নিয়ত c®úgÄix বলে।

পাঠ ৫ ও ৬ পরাগায়ন

পরাগায়নকে পরাগসংযোগও বলা হয়। পরাগায়ন ফল ও বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ceশর্ত। একটি ফুলের cs¯Íe‡Ki পরাগধানীতে তোমার আঙুলের ডগা ঘষে দেখ। তোমার হাতে নিশ্চয়ই হলুদ বা কমলা রঙের গুঁড়ো লেগেছে। এই গুঁড়োe¯‘B পরাগ বা পরাগরেণু।

ফুলের পরাগধানী হতে পরাগরেণুর একই ফুলে অথবা একই জাতের অন্য ফুলের গর্ভমুন্ডে স্থানান্তরিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে। পরাগায়ন দু'প্রকার, যথা- স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন।

স্ব-পরাগায়ন : একই ফুলে বা একই গাছের ভিন্ন দুটি ফুলের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে তখন তাকে স্ব-পরাগায়ন বলে। সরিষা, কুমড়া, ধুতুরা ইত্যাদি উদ্ভিদে স্ব-পরাগায়ন ঘটে।

পর-পরাগায়ন : একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে যখন পরাগ সংযোগ ঘটে তখন তাকে পর-পরাগায়ন বলে। শিমুল, পেঁপে ইত্যাদি গাছের ফুলে পর-পরাগায়ন হতে দেখা যায়।

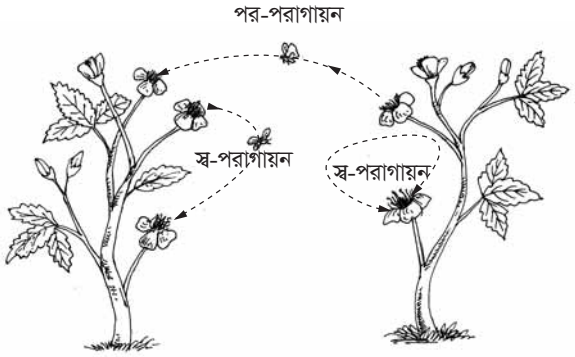

চিত্র ৪.২ : স্বপরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন

পরাগায়নের মাধ্যম : পরাগ স্থানান্তরের কাজটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো মাধ্যমের দ্বারা হয়ে থাকে। যে বাহক পরাগ বহন করে গর্ভমুন্ড পর্যন্ত নিয়ে যায় তাকে পরাগায়নের মাধ্যম বলে।

বায়ু, পানি, কীট-পতঙ্গ, পাখি, বাদুড়, শামুক এমনকি মানুষ এ ধরনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। মধু খেতে অথবা সুন্দর রঙের আকর্ষণে পতঙ্গ বা প্রাণী ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়। এ সময়ে পরাগরেণু বাহকের গায়ে লেগে যায়। এই বাহকটি যখন অন্য ফুলে গিয়ে বসে তখন পরাগ পরবর্তী ফুলের গর্ভমুন্ডে লেগে যায়। এভাবে তাদের অজান্তে পরাগায়নের কাজটি হয়ে যায়।

পরাগায়নের মাধ্যমগুলোর সাহায্য পেতে ফুলের গঠনে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। একে অভিযোজন বলা হয়। বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য অভিযোজনগুলোও অলাদা। অভিযোজনগুলো নিম্নরূপ :

পতঙ্গপরাগী ফুলের অভিযোজন : ফুল বড়, রঙ্গীন, মধুগ্রন্থিযুক্ত। পরাগরেণু ও গর্ভমুন্ড আঁঠাল ও সুগন্ধযুক্ত, যেমন- জবা, কুমড়া, সরিষা ইত্যাদি।

বায়ুপরাগী ফুলের অভিযোজন : ফুল ছোট, হালকা ও মধুগ্রন্থিহীন। এসব ফুলে সুগন্ধ নেই। এরা আকারে ক্ষুদ্র। এদের গর্ভমুন্ড আঁঠাল, শাখান্বিত, কখনও পালকের ন্যায়, যেমন– ধান।

পানিপরাগী ফুলের অভিযোজন : এরা আকারে ক্ষুদ্র এবং হালকা। এরা সহজেই পানিতে ভাসতে পারে। এসব ফুলে সুগন্ধ নেই। ¯¿xd‡ji বৃন্ত লম্বা কিন্তু পুং ফুলের বৃন্ত ছোট। পরিণত পুংফুল বৃন্ত থেকে খুলে পানিতে ভাসতে থাকে, যেমন– পাতাশ্যাওলা।

প্রাণিপরাগী ফুলের অভিযোজন : এসব ফুল মোটামুটি বড় ধরনের হয়। তবে ছোট হলে ফুলগুলো c®úgÄi¥‡Z সজ্জিত থাকে। এদের রং আকর্ষণীয় হয়। এসব ফুলে গন্ধ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। যেমন– কদম, wkgj, KP ইত্যাদি।

পাঠ ৭ ও ৮ : নিষিক্তকরণ ও ফলের উৎপত্তি

জননকোষ (Gamate) সৃষ্টি, নিষিক্তকরণের ceশর্ত। একটি পুং গ্যামেট অন্য একটি ¯¿x-গ্যামেটের সঙ্গে cwicYf¥‡e মিলিত হওয়াকে নিষিক্তকরণ বলে।

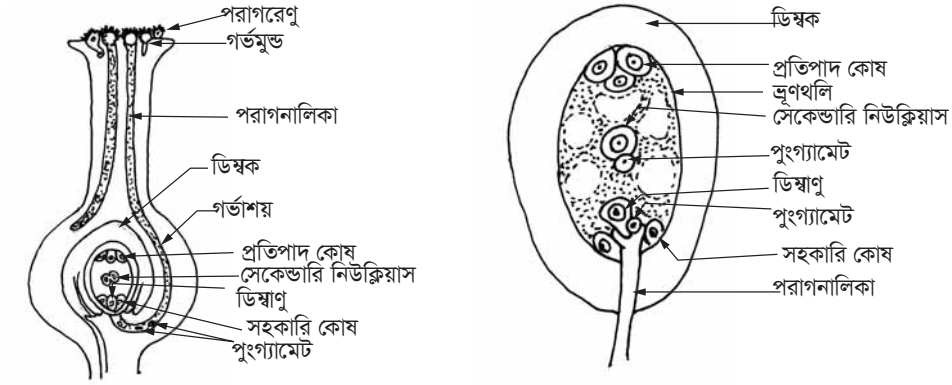

চিত্র-৪.৩ : নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া

পরাগায়নের ফলে পরাগরেণু গর্ভমুন্ডে স্থানান্তরিত হয়। এখান থেকে নিঃসৃত রস শুষে নিয়ে এটি ফুলে উঠে এবং এর আবরণ ভেদ করে একটি নালি বেরিয়ে আসে। এটি পরাগনালি। পরাগনালি গর্ভদন্ড ভেদ করে গর্ভাশয়ে ডিম্বকের কাছে গিয়ে পৌঁছে। ইতোমধ্যে এই পরাগনালিতে দুটো পুং গ্যামেট সৃষ্টি হয়। ডিম্বকের ভিতর পৌঁছে এ নালিকা ফেটে যায় এবং পুং গ্যামেট দুটো মুক্ত হয়। ডিম্বকের ভিতর ভ্রূণথলি থাকে। এর মধ্যে ¯¿x গ্যামেট বা ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। পুং গ্যামেটের একটি এই ¯¿x গ্যামেটের সঙ্গে মিলিত হয়। এভাবে নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হয়। অন্য পুং গ্যামেটটি গৌণ কেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হয় এবং শস্যকনা উৎপন্ন করে।

ফলের উৎপত্তি : আমরা ফল বলতে সাধারণত আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আঙুর, আপেল, পেয়ারা, সফেদা ইত্যাদি সুমিষ্ট ফলগুলোকে বুঝি। এগুলো পেকে গেলে রান্না ছাড়াই খাওয়া যায়। লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, পটল এরাও ফল। এদের কাঁচা খাওয়া হয় না বলে এদের সবজি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এরা সবাই ফল। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলেই ফল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া গর্ভাশয়ে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তার কারণে ধীরে ধীরে গর্ভাশয়টি ফলে পরিণত হয়। এর ডিম্বকগুলো বীজে রূপান্তরিত হয়। নিষিক্তকরণের পর গর্ভাশয় এককভাবে অথবা ফুলের অন্যান্য অংশসহ পরিপুষ্ট হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে তাকে ফল বলে।

শুধু গর্ভাশয় ফলে পরিণত হলে তাকে প্রকৃত ফল বলে, যেমন- আম, কাঁঠাল। গর্ভাশয় ছাড়া ফুলের অন্যান্য অংশ পুষ্ট হয়ে যখন ফলে পরিণত হয় তখন তাকে অপ্রকৃত ফল বলে, যেমন- আপেল, চালতা ইত্যাদি। সকল প্রকৃত ও অপ্রকৃত ফলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- সরল ফল, ¸"Qdj ও যৌগিক ফল।

১) **সরল ফল :** ফুলের একটি মাত্র গর্ভাশয় থেকে যে ফলের উৎপত্তি তাকে সরল ফল বলে, যেমন- আম। এরা রসাল বা শুষ্ক হতে পারে।

রসাল ফল : যে ফলের ফলত্বক পুরু এবং রসাল তাকে রসাল ফল বলে। এ ধরনের ফল পাকলে সাধারণ ফলত্বক ফেটে যায় না। যেমন- আম, জাম, কলা ইত্যাদি।

নীরস ফল : যে ফলের ফলত্বক পাতলা এবং পরিপক্ক হলে ত্বক শুকিয়ে ফেটে যায় তাকে নীরস ফল বলে। যেমন- শিম, ঢেঁড়স, সরিষা ইত্যাদি।

চিত্র ৪.৪ : সরল ফল

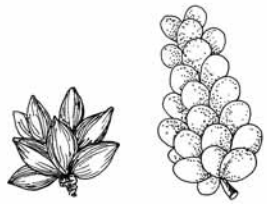

চিত্র ৪.৫ : গুচ্ছ ফল

চিত্র ৪.৬ : যৌগিক ফল

২) **গুচ্ছ ফল :** একটি ফুলে যখন অনেকগুলো গর্ভাশয় থাকে এবং প্রতিটি গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়ে একটি বোঁটার উপর ¸"QvKv‡i _v‡K তখন তাকে ¸"Q ফল বলে, যেমন- চম্পা, নয়নতারা, আকন্দ।

৩) **যৌগিক ফল :** একটি মঞ্জরীর m¤úY অংশ যখন একটি ফলে পরিণত হয় তখন তাকে যৌগিক ফল বলে, যেমন- আনারস, কাঁঠাল।

> **কাজ :** কয়েকটি ফল সংগ্রহ কর এবং এগুলো কী ধরনের ফল তা খাতায় লেখ। একটি কচি আমের লম্ব"Q` কর এবং এর ভিতরের অংশগুলোর চিহ্নিত চিত্র আঁক।

পাঠ ৯ ও ১০ : বীজের গঠন ও অঙ্কুরোদগম

বীজের গঠন : একটি বাটির মধ্যে একটি ফিল্টার পেপার রেখে পানি দিয়ে ভিজিয়ে তার উপর ৮/১০টি ভেজা ছোলার বীজ ৩/৪ দিন ঢেকে রেখে দিলে এগুলো থেকে অঙ্কুর বের হবে। বীজের সুঁচাল অংশের কাছে একটি ছিদ্র আছে, একে মাইক্রোপাইল বলে। এর ভিতর দিয়ে åYgj বাইরে বেরিয়ে আসে। অঙ্কুর বের হওয়া বীজটিকে দু আঙ্গুল দিয়ে সামান্য চাপ দিয়ে ছোলা বীজের আবরণটি সরিয়ে ফেললে হলুদ রঙের একটি অংশ বের হবে, এটিকে আরও একটু চাপ দিলে পুরু বীজপত্র দুটি দুই দিকে খুলে যাবে। এ দুটো যেখানে লেগে আছে সেখানে সাদা রঙের একটি লম্বাটে অজ্ঞা দেখা যাবে। এর নিচের দিকের অংশকে ভ্রূণমূল এবং উপরের অংশকে ভ্রূণকাণ্ড বলে।

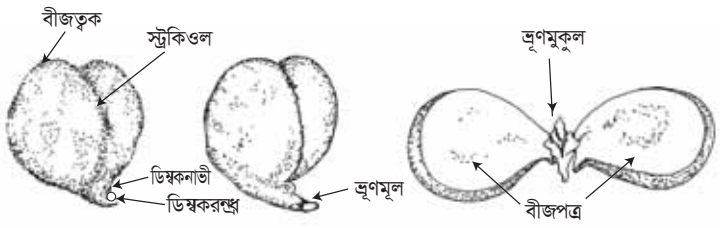

চিত্র ৪.৭ : একটি ছোলা বীজের বিভিন্ন অংশ।

ভ্রূণকান্ডের নিচের অংশকে বীজপত্রাধিকাণ্ড (এপিকোটাইল) ও ভ্রূণমুলের উপরের অংশকে বীজপত্রাবকাণ্ড (হাইপোকোটাইল) বলে। åYgj, ভ্রূণকাণ্ড ও বীজপত্রকে একত্রে ভ্রূণ এবং বাইরের আবরণটিকে বীজত্বক বলে। বীজত্বক `ỉ¯Íi বিশিষ্ট। বাইরের অংশকে টেস্টা এবং ভিতরের ¯Íi‡K টেগমেন বলে।

কাজ : পরীক্ষার মাধ্যমে একটি মটর বীজের বিভিন্ন অংশ প্রদর্শন কর।

অঙ্কুরোদগম : বীজ থেকে শিশু উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে অঙ্কুরোদগম বলে। যথাযথভাবে অঙ্কুরোদগম হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পানি, তাপ ও অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। যখন বীজপত্র মাটির নিচে অবস্থান করে আর ভ্রূণকাণ্ড মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে কিন্তু বীজপত্রটি মাটির ভিতরে থেকে যায় তখন তাকে মৃদগত অঙ্কুরোদগম বলে, যেমন ছোলা, ধান ইত্যাদি। কখনও বীজপত্রসহ ভ্রূণমুকুল মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে তখন তাকে মৃদভেদী অঙ্কুরোদগম বলে। কুমড়া, রেড়ী, তেঁতুল ইত্যাদি বীজে মৃদভেদী অঙ্কুরোদগম দেখা যায়।

চিত্র ৪.৮ : মৃদভেদী অঙ্কুরোদগম

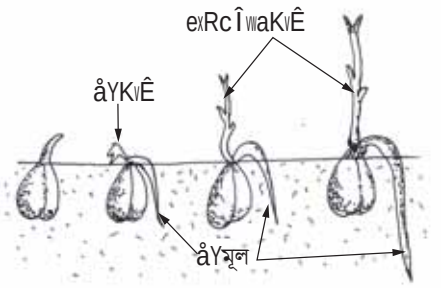

চিত্র ৪.৯ : মৃদগত অঙ্কুরোদগম

ছোলা বীজের অঙ্কুরোদগম : এক্ষেত্রে মৃদগত অঙ্কুরোদম হয়। এই প্রকার অঙ্কুরোদগমে বীজপত্র দু'টি মাটির নিচে রেখে ভ্রূণকাণ্ড উপরে উঠে আসে। এপিকোটাইলের অতিরিক্ত বৃদ্ধি এর কারণ। ছোলাবীজ একটি অশস্যল দ্বিবীজপত্রী বীজ। মাটিতে ছোলা বীজ বুনে পরিমিত পানি, তাপ ও বায়ুর ব্যবস্থা করলে দুই তিন দিনের মধ্যে বীজ হতে অঙ্কুর বের হবে এবং মাটির উপরে উঠে আসবে। পানি পেয়ে বীজটি প্রথমে ফুলে উঠে এবং ডিম্বক রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে åYgj বেরিয়ে আসে। এটি ধীরে ধীরে প্রধান g‡j পরিণত হয়। দ্বিতীয় ধাপে ভ্রূণকাণ্ড মাটির উপরে উঠে আসে। এক্ষেত্রে ভ্রূণপত্র দুটো মাটির নিচে থেকে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণ তার খাদ্য বীজপত্র থেকে পেয়ে থাকে। এটি কোন ধরনের অঙ্কুরোদগম ?

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম–

- প্রজনন প্রধানত দু'ধরনের, যথা– অযৌন ও যৌন।
- ফুল উন্নত উদ্ভিদের জনন অঙ্গ।
- একটি আদর্শ ফুলের পাঁচটি অংশ।
- ফল প্রধানত তিন ধরনের, সরল, ¸”QZ ও যৌগিক।
- অংকুরোদগম দু'ধরনের, যথা– মৃদগত ও মৃদভেদী।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পরণ কর

১। প্রজনন প্রধানত দুই রকম, ———— ও ————।

২। যখন একটি মাত্র গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় তখন তাকে ———— ফল বলে।

৩। যে ফুলে ———— টি অংশ থাকে তাকে m¤úY ফুল বলে।

৪। পরাগায়ন দু'ধরনের যথা- ক) ———— খ) ————।

৫। একটি c®úgÄixi m¤úYUv ফলে পরিণত হলে তাকে ———— ফল বলে।

৬। পরিণত ফলের ডিম্বক ———— পরিণত হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। অযৌন প্রজনন উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বcÝ কেন ?

২। একটি আপেল ও একটি আম লম্বালম্বিভাবে কেটে ফেললে কী কী পার্থক্য দেখা যাবে ?

৩। আম গাছের কলম কেন করা হয় ?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি ¸"Q ফল?

ক. আম খ. শরীফা

গ. কাঁঠাল ঘ. আনারস

২. পতঙ্গাপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. এরা বর্ণহীন খ. এরা গন্ধহীন

গ. এরা খুব হালকা হয় ঘ. এরা রঙিন ও মধুগ্রন্থিযুক্ত হয়

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

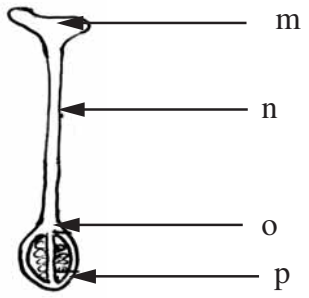

৩. কোন অংশটি পরাগরেণু ধারণ করে?

ক. m খ. o

গ. n ঘ. p

৪. চিত্রে P অংশটি-

i. ফলে পরিণত হয়

ii. বীজে পরিণত হয়

iii. বংশবি¯Íারে সাহায্য করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

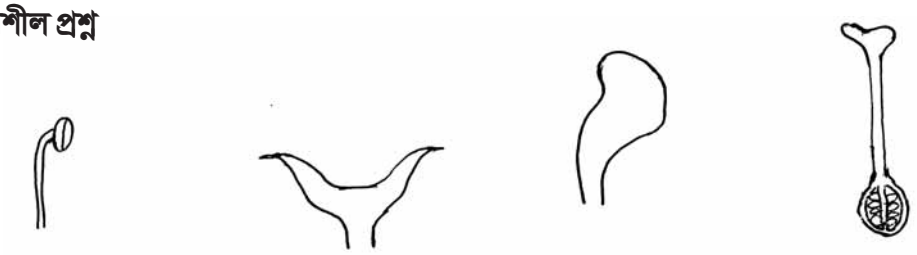

১.

ক. প্রজনন কাকে বলে?

খ. পরাগায়ন বলতে কী বুঝায়?

গ. M, N, O, P অংশের সমন্বয়ে গঠিত উদ্ভিদ অঙ্গাটির j¤^‡"Q‡`i চিহ্নিত চিত্র অংকন কর।

ঘ. M, O, P এর মধ্যে কোন দুটি অংশ উদ্ভিদের eskwe¯Ív‡i অধিক ¸iZcY? hw³mn Z‡j ai|

২.

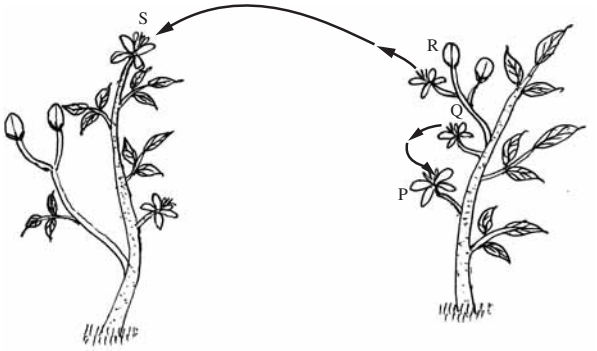

ক. অঙ্গাজ প্রজনন কাকে বলে?

খ. অংকুরোদগম বলতে কী বুঝায়?

গ. P ও Q ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে কোন পরাগায়নটি নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে? তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মতামত দাও।

নিজে কর

১. লাউ, কুমড়া, ধুতুরা, বেগুন, কলকে ফুল, জবা ও সীমের ফুল সংগ্রহ কর এবং দেখ কোন ফুলে পাঁচটি অংশ রয়েছে।

২. একটি তেঁতুল বীজ নিয়ে অঙ্কুরোদ্গামের পরীক্ষা কর এবং পরিবর্তনগুলো লিখে রাখ।

cÂg Aa¨vq

সমন্বয় ও নিঃসরণ

জীবে সমন্বয় একটি অতীব ¸iZcY বিষয়। প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন হয়। জীবের বৃদ্ধি, প্রজনন, eskwe¯—vi, AbfwZMnY ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উদ্ভিদের এ কাজগুলো করার জন্য হরমোনের গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে প্রাণীর মতো উদ্ভিদের আলাদা কোনো তন্ত্র থাকে না। নিম্নশ্রেণি ব্যতীত D"P †kwYi প্রাণীর দেহে বিভিন্ন জৈবিক কার্যাদি m¤úv`‡bi জন্য নির্দিষ্ট তন্ত্র থাকে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগ সাধন এবং এদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উদ্দীপনা সাড়া দিয়ে পরিবেশের সাথে m¤úK রক্ষা করে স্নায়ুতন্ত্র।

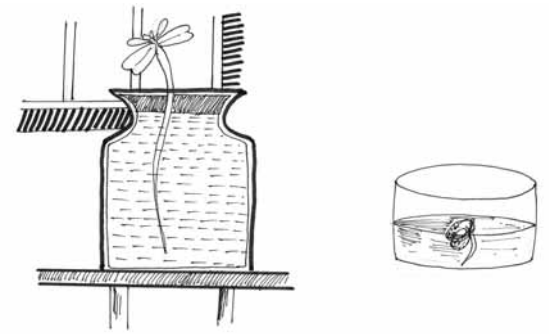

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- উদ্ভিদের সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদের ক্ষেত্রে DÏxcbwgjK ক্রিয়া উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও মানুষের ক্ষেত্রে সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ এবং মানুষের DÏxcbwgjK ক্রিয়া উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্জ্য নিঃসরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১-৩ : উদ্ভিদে সমন্বয়

প্রতিটি উদ্ভিদকোষে বিভিন্ন শারীরতত্ত্বীয় কার্যক্রম একটি নিয়ম k•Ljvi মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এ কারণে সমন্বয় জীবের একটি অপরিহার্য কার্যক্রম। এ সমন্বয় না থাকলে জীবের জীবনে wek•Ljv দেখা দেবে।

একটি উদ্ভিদের জীবন চক্রের পর্যায়গুলো, যেমন- অঙ্কুরোদগম, c®úwqb, ফল সৃষ্টি, বার্ধক্য প্রাপ্তি, সুপ্তাবস্থা ইত্যাদি একটি mk•Lj নিয়ম মেনে চলে। এ কাজে আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত প্রভাবকগুলোর গুরুত্বও লক্ষ করার মতো।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও চলনসহ বিভিন্ন শারীরতত্ত্বীয় কাজগুলো অত্যন্ত mk•Ljভাবে বিশেষ নিয়ম মেনেই m¤úb হয়। একটি কাজ অন্য কাজকে বাধা প্রদান করে না। বিভিন্ন কাজের সমন্বয়সাধন কীভাবে হয় তা জানতে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে থাকেন এবং মত প্রকাশ করেন যে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ, বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি ইত্যাদি উদ্ভিদ দেহে উৎপাদিত বিশেষ কোনো পদার্থের প্রভাবে হয়ে থাকে। উদ্ভিদের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণকারী এই জৈব রাসায়নিক পদার্থটিকে ফাইটোহরমোন বা বৃদ্ধিকারক e¯‘ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যে রাসায়নিক e¯‘wU কোষে উৎপন্ন হয়ে উৎপত্তি-স্থল থেকে বাহিত হয়ে `ieZx স্থানের কোষের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে তাই হরমোন। উদ্ভিদে যেসব হরমোন পাওয়া যায় সেগুলো হলো- অক্সিন, জিব্বেরেলিন ও সাইটোকাইনিন যা বৃদ্ধি সহায়ক। অ্যাবসাইসিক এসিড ও ইথিলিন বৃদ্ধি

প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। ফ্লোরিজেন নামক হরমোন পত্রে উৎপন্ন হয় এবং তা পত্রg‡j ¯'vb\ন্তরিZ হয়ে পত্র মুকুলকে c®úgK‡j পরিণত করে। তাই দেখা যায় ফ্লোরিজেন উদ্ভিদে ফুল উৎপন্ন করে।

অক্সিন : চার্লস ডারউইন এ হরমোন প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি উদ্ভিদের ভ্রূণমুকুলাবরণীর উপর আলোর প্রভাব লক্ষ করেন। যখন আলো তীর্যকভাবে একদিকে লাগে তখন ভ্রূণমুকুলাবরণী আলোর উৎসের দিকে বক্র হয়ে বৃদ্ধি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগে অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থটি ছিল বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন। অক্সিন প্রয়োগে শাখা কলমে gj গজায়, ফলের অকাল ঝরেপড়া রোধ করে।

জিব্বেরেলিন : চারাগাছ, বীজপত্র ও পত্রের বর্ধিষ্ণু AÂ‡j এদের দেখা যায়। এর প্রভাবে উদ্ভিদের পর্বমধ্যগুলো দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। এ জন্য খাটো উদ্ভিদে এ হরমোন প্রয়োগ করলে উদ্ভিদটি অন্যান্য সাধারণ উদ্ভিদ থেকেও অধিক লম্বা হয়। জীবের সুপ্তাবস্থা কাটাতে এর কার্যকারিতা রয়েছে।

ইথিলিন : এ হরমোনটি একটি গ্যাসীয় পদার্থ। এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে। এ হরমোন ফল, ফুল, বীজ, পাতা ও g‡jI দেখা যায়। এর প্রভাবে চারাগাছে বিকৃত বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়।

চন্দ্রমল্লিকা একটি ছোট দিনের উদ্ভিদ। উদ্ভিদটির পত্র আলোক পর্যায়ের উদ্দীপক উপলব্ধির স্থান বলে পরিগণিত হয়। উদ্ভিদের c®ú প্রস্ফুটন দিবাদৈর্ঘ্যের উপর অধিক নির্ভরশীল। উদ্ভিদে c®ú সৃষ্টিতেও উষ্ণতার প্রভাব বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন।

উদ্ভিদও অন্যান্য জীবের ন্যায় Abf\Z ক্ষমতাm¤úb| এজন্য অভ্যন্তরীণ বা বহিঃউদ্দীপক উদ্ভিদ দেহে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তার ফলে উদ্ভিদে চলন ও বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। এসব চলনকে ট্রপিক চলন বলা হয়।

আলোর কারণে উদ্ভিদের সাড়া দেওয়ার পরীক্ষণ :

উপকরণ : একটি ¯^"Q কাচের বড় মুখযুক্ত বোতল, পুষ্টি দ্রবণ, ছিদ্রযুক্ত কর্ক, একটি সবল উদ্ভিদের চারা।

কার্যপ্রণালি : একটি বোতলে পুষ্টি দ্রবণ পুরে ছিদ্রযুক্ত ছিপিটি লাগিয়ে ছিপির ছিদ্রপথে চারাগাছটি এমনভাবে পুরে দিতে হবে যাতে gj¸‡jv পুষ্টি দ্রবণে ডুবে থাকে। এবার গাছসহ বোতলটি জানালার কাছে আলোকিত স্থানে রেখে দেই।

পর্যবেক্ষণ : ৪/৫ দিন পর দেখা যাবে যে উদ্ভিদটির কান্ডের অংশ জানালার বাইরের দিকে বেঁকে গেছে। মূলগুলো আলোক উৎসের বিপরীত দিকে বেঁকে রয়েছে।

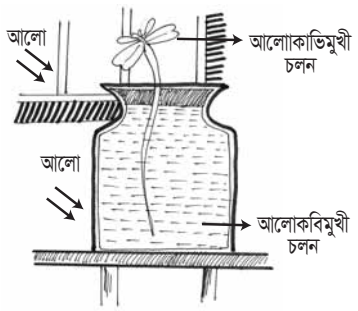

চিত্র ৫.১ : উদ্ভিদের আলোকমুখিতার পরীক্ষণ

সিদ্ধান্ত : এ পরীক্ষণে প্রমাণিত হয় যে কান্ডে আলোকমুখী ও g‡j আলোকবিমুখী বৃদ্ধি ও চলন ঘটে।

কাজ : শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে অভিকর্ষ উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে তা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাও।

হরমোনের ব্যবহার : অক্সিন ও অন্যান্য কৃত্রিম হরমোন শাখাকলমে gj উৎপাদন সাহায্য করে। ইন্ডোল অ্যাসেটিক এসিড ক্ষতস্থান ci‡Y সাহায্য করে। অক্সিন প্রয়োগ করে ফলের মোচন বিলম্বিত হয়। বিভিন্ন উদ্দীপক, যেমন আলো, পানি, অভিকর্ষ ইত্যাদি উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।

নতুন শব্দ : অক্সিন, হরমোন, বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন জিব্বেরেলিন, ইথিলিন, সাইটোকাইনিন, ইন্ডোল অ্যাসিটিক এসিড।

পাঠ ৪ ও ৫

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে শ্রেণিবিন্যাস থেকে এককোষী ও বহুকোষী জীবের বৈশিষ্ট্য জেনেছ। বহুকোষী জীবের দেহে টিস্যু, অঙ্গ ও তন্ত্র ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন গঠন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে অগণিত কোষের বিচিত্র কর্মকান্ড। এই কর্মকান্ডের সাথে †hvMm~Î রচনা করা এবং পরিবেশের সাথে m¤úK রাখার জন্য জীবদেহে `Z যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। যেমন- কারো দুঃখে তোমার কান্না পায়, কারো খুশিতে তুমি খুশি হও, পরীক্ষায় ভালো ফল করলে তোমার আনন্দ হয়। এই কাজগুলো ঘটে বিভিন্ন উদ্দীপকের কার্যকারিতার ফলে। দেহের বিভিন্ন অংশের উদ্দীপনা বহন করা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধন করা ও পরিবেশের সাথে m¤úK রাখা স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ।

প্রাণিদেহের যে তন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ রক্ষা করে, বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করে এবং উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করার মাধ্যমে পরিবেশের সাথে m¤úK রক্ষা করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশ হলো gw¯—®‹| উন্নত gw¯—‡®‹i কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পরিগণিত হয়। gw¯—®‹ অসংখ্য বিশেষ কোষ দ্বারা গঠিত। এরা নিউরন বা স্নায়ুকোষ নামে পরিচিত।

স্নায়ুকোষ বা নিউরন

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যকরী একককে স্নায়ুকোষ বা নিউরন বলে। নিউরন মানবদেহের দীর্ঘতম কোষ। নিউরন দুইটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা- ক) কোষদেহ এবং খ) প্রলম্বিত অংশ।

ক) কোষদেহ : কোষদেহ নিউরনের প্রধান অংশ। কোষদেহ বিভিন্ন আকৃতির হয়, যেমন– গোলাকার, ডিম্বাকার বা নক্ষত্রাকার। কোষদেহ কোষ আবরণী, সাইট্রোপাজম ও নিউক্লিয়াস দ্বারা গঠিত। এই কোষে সেন্ট্রিওল থাকে না। তাই এরা অন্যান্য কোষের মতো বিভাজিত হয় না।

খ) প্রলম্বিত অংশ : কোষদেহ থেকে উৎপন্ন শাখা-প্রশাখাকে প্রলম্বিত অংশ বলে। প্রলম্বিত অংশ দুই প্রকার। যথা- ১) অ্যাক্সন এবং ২) ডেনড্রন।

১) অ্যাক্সন : কোষদেহ থেকে উৎপন্ন লম্বা সুতার মতো অংশকে অ্যাক্সন বলে। অ্যাক্সনের যে প্রান্তে দেহকোষ থাকে তার বিপরীত প্রান্ত থেকে শাখা বের হয়। একটি নিউরনে একটি মাত্র অ্যাক্সন থাকে।

চিত্র ৫.২ : নিউরন

২) ডেনড্রন : কোষদেহের চারদিক থেকে উৎপন্ন শাখা-প্রশাখাগুলোকে ডেনড্রন বলে। এগুলো বেশি লম্বা হয় না। ডেনড্রন সৃষ্ট শাখাগুলোকে ডেনড্রাইট বলে। এদের দ্বারা স্নায়ুতাড়না নিউরনের দেহের দিকে পরিবাহিত হয়।

একটি স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন অন্য একটি স্নায়ুকোষের ডেনড্রনের সাথে মিলিত হওয়ার স্থানকে সিন্যাপস বলে। অর্থাৎ সিন্যাপস দুইটি স্নায়ুকোষের মিলনস্থল সিন্যাপসের মাধ্যমেই স্নায়ুতাড়না এক স্নায়ুকোষ থেকে অন্য স্নায়ুকোষে পরিবাহিত হয়।

উদ্দীপনা বহন করা, প্রাণিদেহের ভিতরের ও বাইরের পরিবেশের সাথে সংযোগ রক্ষা করা, প্রাণিদেহের বিভিন্ন অংগের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করা, gw¯—‡®‹ স্মৃতিধারণ করা, চিন্তা করা ও বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দেওয়া ও পরিচালনা করা নিউরনের কাজ। নিউরনের উদ্দীপনা বহন প্রক্রিয়া নিচের চিত্রে দেখানো হলো।

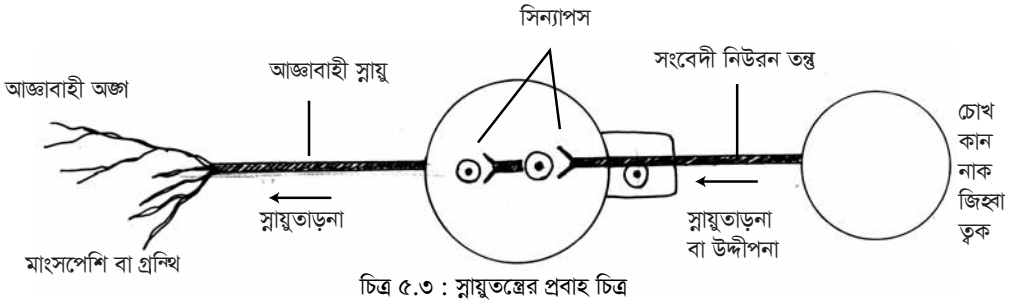

চিত্র ৫.৩ : স্নায়ুতন্ত্রের প্রবাহ চিত্র

স্নায়ুতন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ২) প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ৩) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র।

১) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ হলো g¨—®‹ ও মেরুরজ্জু।

নতুন শব্দ : নিউরন, ডেনড্রন, ডেনড্রাইট, সিন্যাপস।

পাঠ ৬ ও ৭ : g¨Í®‹

g¨—®‹ হলো সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের চালক। মানুষের g¨—®‹ করোটির মধ্যে সুরক্ষিত। g¨—®‹ †মনিনজেস নামক পর্দা দ্বারা আবৃত। মানুষের g¨—‡®‹i প্রধান অংশ তিনটি। যথা- ১) ¸ig¨—®‹ ২) মধ্যg¨—®‹ ৩) পশ্চাৎ বা লঘুg¨—®‹|

১) গুরুমস্তিষ্ক : g¨—‡®‹i প্রধান অংশ হলো ¸ig¨—®‹ ev †mwievwg| এটা ডান ও বাম খন্ডে বিভক্ত। এদের ডান ও বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার বলে। মানব মস্তিষ্কে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার অধিকতর উন্নত ও সুগঠিত। এই দুইখন্ড ঘনিষ্ঠভাবে স্নায়ুতন্তু দ্বারা সংযুক্ত। এর উপরিভাগ ঢেউ তোলা ও ami e‡Yi| †`L‡Z amর বর্ণের হওয়ায় একে ami পদার্থ বা গ্রেম্যাটার বলে। ¸ig¨—‡®‹i অন্তঃ¯—‡i কেবলমাত্র স্নায়ুতন্তু থাকে। এখানে কোনো স্নায়ুকোষ থাকে না। স্নায়ুতন্তুর রং সাদা। তাই g¨—‡®‹i wভতরের ¯—‡ii নাম শ্বেত পদার্থ বা হোয়াইট ম্যাটার। শ্বেত পদার্থের ভিতর দিয়ে স্নায়ুতন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। ami পদার্থের কয়েকটি ¯—‡i বিশেষ আকারে স্নায়ুকোষ দেখা যায়। এই স্নায়ুকোষগুলো ¸ig¨—‡®‹i বিভিন্ন অংশে ¸"Q বেঁধে স্নায়ুকেন্দ্র সৃষ্টি করে। এগুলো বিশেষ বিশেষ কর্মকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, চিন্তা-চেতনা, স্মৃতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও পেশি চালনার ক্রিয়াকেন্দ্র ¸ig¨—‡®‹ অবস্থিত।

থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস : সেরিব্রামের নিচের অংশ হলো- থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস। এগুলো ধূসর পদার্থের পুঞ্জ। ক্রোধ, লজ্জা, গরম, শীত, নিদ্রা, তাপ সংরক্ষণ ও চলন এই অংশের কাজ।

2) ga¨g¨—®‹ : ¸ig¨—®‹ ও পনস-এর মাঝখানে ga¨g¨—®‹ অবস্থিত। ga¨g¨—®‹ দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তির সাথেও m¤úKh³|

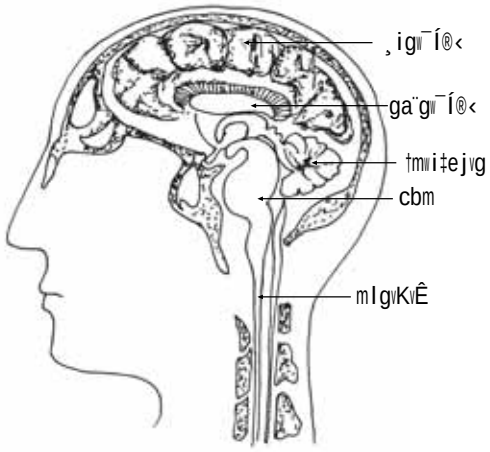

চিত্র ৫.৪ : g¨—‡®‹i গঠন

3) cðvr ev jNg¨—®‹ : jNg¨—®‹ ¸ig¨—‡®‹i নিচে ও পশ্চাতে অবস্থিত। এটা ¸ig¨—‡®‹i চেয়ে আকারে ছোট। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা পশ্চাৎ বা jNg¨—‡®‹i প্রধান কাজ। এছাড়া jNg¨—®‹ কথা বলা ও চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে। এর তিনটি অংশ-

সেরিবেলাম : পনসের বিপরীতদিকে অবস্থিত খন্ডাংশটি হলো সেরিবেলাম। এটা অনেকটা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। সেরিবেলাম ডান ও বাম দু'অংশে বিভক্ত।

পনস : পনস jNg¨—‡®‹i সামনে ও নিচে অবস্থিত। একে g¨—‡®‹i যোজক বলা হয়। এটা ¸ig¨—®‹, jNg¨—®‹ ও ga¨g¨—®‹‡K সুষুম্নাশীর্ষকের সাথে সংযোজিত করে।

মেডুলা বা সুষুম্না শীর্ষক : এটা g¨—‡®‹i নিচের অংশ। সুষুম্না শীর্ষক পনসের নিম্নভাগ থেকে †gii¾i উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ এটা g¨—®‹‡K †gii¾i mv‡_ সংযোজিত করে। এ জন্য সুষুম্না শীর্ষকে g¨—‡®‹i বোঁটা বলা হয়। g¨—‡®‹i এ অংশ ü`¨ú›`b, খাদ্যগ্রহণ ও শ্বসন ইত্যাদি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ : চার্ট দেখে g¨—‡®‹i চিত্র আঁক। এর কোন অংশ কী কাজ করে তা চিত্রের চিহ্নিত অংশের পাশে লেখ।

নতুন শব্দ : ¸ig¨—®‹, ami পদার্থ, শ্বেত পদার্থ, পন্‌স, মেডুলা, প্রলম্বিত অংশ, অ্যাক্সন, ড্রেনড্রন।

পাঠ ৮-১০ : মেরুরজ্জু

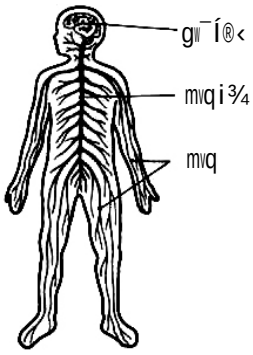

চিত্র ৫.৫ : মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্র

†gi`‡Êi g‡a¨ †gii¾ msiw¶Z _v‡K| †gii¾i aмi পদার্থ থাকে ভিতরে এবং শ্বেত পদার্থ থাকে বাইরে, অর্থাৎ g¯—‡®‹i উল্টা। †gii¾i শ্বেত পদার্থের ভিতর দিয়ে আজ্ঞাবাহী এবং Ab fwZevnx স্নায়ুতন্তু যাতায়াত করে।

প্রতিবর্ত চক্র

তোমার হাতে মশা বসলে তুমি কী করবে? অবশ্যই মশাটাকে মারতে চেষ্টা করবে। তোমার হাতে মশা বসেছে তুমি কীভাবে টের পেলে? তুমি মশার কামড় অনুভব করেছ, তাই তুমি এমনটি করেছ। তুমি মশার কামড় অনুভব করেছ স্নায়ুর উদ্দীপনার জন্য। স্নায়ুর ক্রিয়া যা উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়াও তাই। আয়নাতে আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আলো প্রতিফলিত হয়, প্রতিবর্তক ক্রিয়াও কতকটা তেমনি।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঘটে স্নায়ুর তাড়নার তাৎক্ষণিক কার্যকারিতার ফলে। স্নায়ুতাড়না কী? স্নায়ুর ভিতর দিয়ে যে সংবাদ বা Ab fwZ প্রবাহিত হয় তাকে স্নায়ু তাড়না বলে। আমরা যেমন হাতে মশা কামড় দিলে মশা তাড়িয়ে দেই অথবা হাতে বা পায়ে পিন ফুটলে আমরা নিমিষে হাত সরিয়ে নিই। এটা কীভাবে ঘটে? হাতের উপর মশা বসলে স্নায়ুর গ্রাহকপ্রান্তে উদ্দীপক হলো মশা, এর উপস্থিতি অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে কোষ প্রান্তের সাড়া জাগে। আমরা মশাটিকে তাড়িয়ে দেই অথবা মেরে ফেলি। এ সকল ক্রিয়া যেন অজ্ঞাতসারে আপনা আপনি হয়ে থাকে। এরূপ যে ক্রিয়া অনুভূতির উত্তেজনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, g¯—®‹ দ্বারা চালিত হয় না তাকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে। প্রতিটি প্রতিবর্ত চক্রের পাঁচটি অংশ থাকে। যথা- ১) গ্রাহক অঙ্গ ২) Ab fwZevnx স্নায়ু ৩) প্রতিবর্ত কেন্দ্র ৪) আজ্ঞাবাহী স্নায়ু এবং ৫) সাড়ার অঙ্গ।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষার জন্য কোনো অঙ্গের তড়িৎক্রিয়ার নাম প্রতিবর্ত ক্রিয়া। উদাহরণ- ১) আগুনে হাত লাগা বা পিনে হাত ফোটা মাত্র টেনে নেওয়া। ২) চোখে প্রখর আলো পড়ামাত্র চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়া।

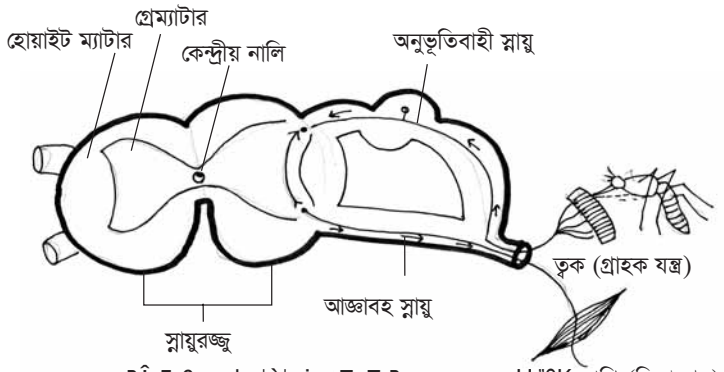

wPÎ 5.6 : gvbe‡`‡ni cwZeZ Pµ

ব্যাখ্যা : হাতের চামড়ায় পিন ফোটামাত্র Ab fwZevnx স্নায়ুতন্তু পিন ফোটার যন্ত্রণা গ্রহণ করে। এই যন্ত্রণাদায়ক তাড়না অনুভূতিবাহী স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে †gii¾‡Z পৌঁছে। ঐ একই তাড়না Ab fwZevnx স্নায়ুকোষ থেকে আজ্ঞাবাহী স্নায়ুতে প্রবাহিত হয়। স্নায়ুতাড়না আজ্ঞাবাহী কোষে পৌঁছামাত্র পেশিতে প্রেরণ করে। ফলে পেশি সংকুচিত হয় এবং যন্ত্রণার উৎস থেকে হাত সরিয়ে দেয়।

এখানে অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়াকে সহজ করে বর্ণনা করা হলো। আসলে পিন ফুটানোর সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু অনুভূতিবাহী স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এ উদ্দীপনা অনেকগুলো ci¯úi সংযুক্ত স্নায়ুকোষের মাধ্যমে অনেকগুলো আজ্ঞাবাহী কোষে প্রবাহিত হয়। এসব আজ্ঞাবাহী স্নায়ু পেশিতে উদ্দীপনা বহন করে হাত সরিয়ে আনে। Ab fwZ g¯—‡®‹ | পৌঁছায়। ফলে কী ঘটছে শরীর তা জানতে পারে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া একটি সমন্বিত কার্যক্রম। প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় যে পাঁচটি অংশ কাজ করে এদের যেকোনো একটির অভাবে কাজটি সঠিকভাবে হতে পারে না।

কাজ : তোমার হাতে পিন ফুটলে অথবা হারিকেনের গরম চিমনির উপর তোমার হাত পড়লে তুমি কী করবে? কেন করবে? কীভাবে করবে? তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

নতুন শব্দ : আজ্ঞাবাহী স্নায়ু, অনুভূতিবাহী স্নায়ু, প্রতিবর্তচক্র, প্রতিবর্ত ক্রিয়া।

পাঠ ১১ ও ১২ : রেচনতন্ত্র

আমরা নাক দিয়ে বাতাস নেই ও ছাড়ি। অতি গরমে গা ঘামে। এগুলো রেচন পদার্থ। রেচন পদার্থ কী? রেচন পদার্থ হলো সেইসব পদার্থ যেগুলো দেহের জন্য ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয়। রেচন বলতে দেহের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে বুঝায়। বিপাকের ফলে পানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া প্রভৃতি দূষিত পদার্থ দেহে c¯‘Z হয়। এগুলো নিয়মিত ত্যাগ না করলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এইসব `wlZ পদার্থ দেহের মধ্যে জমে বিষক্রিয়া দেখা দেয় এবং এর ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। ঐসকল বর্জ্য পদার্থ প্রধাণত নিঃশ্বাস বায়ু, ঘাম এবং g‡Îi সাথে দেহের বাইরে চলে যায়। ফুসফুস, চর্ম ও বৃক্ক এই তিনটি রেচন অংগ। কার্বন ডাইঅক্সাইড ফুসফুসের মাধ্যমে এবং লবণ জাতীয় ক্ষতিকর পদার্থ চর্মের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। বৃক্কের মাধ্যমে দেহের নাইট্রোজেনযুক্ত তরল, `wlZ পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। বৃক্ক, ত্বক ও ফুসফুস এই তিনটি অঙ্গের ভিতর দিয়ে `wlZ পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। g‡Îi মাধ্যমেই দেহের শতকরা আশি ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জনীয় পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। তাই বৃক্ককেই প্রধানত রেচন অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। যে তন্ত্র রেচন কার্যে সাহায্য করে তাকে রেচনতন্ত্র বলে।

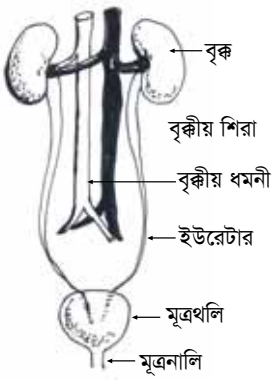

চিত্র ৫.৭ : রেচনতন্ত্র

কাজ : একটি টেস্টটিউবের ভিতর কিছুটা ¯^”Q চুনের পানি নাও। এবার টেস্টটিউবটির মধ্যে কাঁচ বা পাস্টিকের নল প্রবেশ করাও। এবার নলটি দিয়ে ফুঁ দাও। কী হয় লক্ষ্য কর? কিছুক্ষণ ফুঁ দেওয়ার পর দেখবে চুনের পানি ঘোলাটে হয়ে hv‡”Q| কেন এমন হলো?

আমরা জানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড চুনের পানিকে ঘোলা করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে।

অল্প পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। কিন্তু বেশি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বিষাক্ত যা দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। শ্বসন ক্রিয়ার সময় আমাদের দেহকোষ বর্জ্য হিসেবে এই গ্যাস তৈরি করে। কোষ থেকে রক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড বহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায়। নিঃশ্বাসের বায়ুতে শতকরা ৪ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। নিঃশ্বাসের বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে জলীয় ev®ú থাকে।

কাজ : শীতের সকালে একখন্ড কাচ বা আয়নার উপর মুখ দিয়ে (নাক দিয়ে নয়) নিঃশ্বাস ছাড়। কাচের উপর কী দেখতে cv"Q? নিঃশ্বাসের বায়ুর সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয়ev®ú বের হয়। জলীয়ev®ú ঠান্ডা কাচের জলীয় কণার সৃষ্টি করে এবং আয়না বা কাচখন্ডটিকে ঘোলাটে ও কিছুটা A¯^"Q দেখায়। কিছুক্ষণ পর আয়না থেকে জলীয় কণা উবে যায়। আয়নাটি আবার ¯^"Q দেখায়।

এ থেকে আমরা দেখতে cw"Q নিঃশ্বাস বায়ুতে জলীয়ev®ú থাকে।

ঘর্ম বা ঘাম

মানবদেহের বহিরাবরণ চর্ম বা ত্বক। ত্বকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এগুলো হলো লোমকূপ। এই সকল লোম Kc দিয়ে ঘাম বের হয়। এই ঘামে সাধারণত পানির সাথে লবণ ও সামান্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য ক্ষতিকর অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে।

gÎ

বৃক্ককে gÎ তৈরির কারখানা হিসেবে অভিহিত করা হয়। দেহের পেছনের দিকে মেরুদন্ডের দুই পাশে দুইটি বৃক্ক থাকে। বৃক্ক ছাঁকনির মতো কাজ করে। যকৃত আমাদের দেহের অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিডকে ভেঙ্গে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে। এগুলো দেহের জন্য ক্ষতিকর। বৃক্ক রক্ত থেকে ক্ষতিকর পদার্থ ছেঁকে নেয়। এই ক্ষতিকর c`v_mgn পানির সাথে মিশে হালকা হলুদ বর্ণের gÎ তৈরি করে। gÎ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত gÎ থলিতে জমা থাকে। প্রয়োজন মতো সময়ে g‡Îi বেগ AbfZ হয়। মলদ্বারের মতো gÎ_wji দ্বারেও সংকোচন ও প্রসারণ পেশি থাকে। একে gÎc_ বলে। প্রয়োজনে পেশি সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহ থেকে gÎ wbMZ nq| g‡Îi মাধ্যমে শতকরা ৮০ ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ বের হয়ে যায় ও দেহকে সুস্থ রাখে। তাই বৃক্ককে †iPbZ‡bi প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নতুন শব্দ : সমবেদী স্নায়ু, স্নায়ুকেন্দ্র, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম–

- নিউরনের সেন্ট্রিওল থাকে না।
- নিউরনের গঠন দেহকোষের চেয়ে ভিন্ন।
- পরপর দুইটি নিউরনের প্রথমটার অ্যাক্সন ও পরেরটার ডেনড্রাইটের মধ্যে একটি স্নায়ুসন্ধি থাকে। একে সিন্যাপস বলে। সিন্যাপসের মধ্য দিয়েই একটি নিউরন থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনে প্রবাহিত হয়।
- গুরু gw¯Í‡®‹i ami পদার্থের কয়েকটি ¯Í‡i বিশেষ স্নায়ুকোষ দেখা যায়। এই কোষগুলো গুরু gw¯Í‡®‹i বিভিন্ন অংশে ¯'v‡b ¯'v‡b ,"Q বেঁধে স্নায়ুকেন্দ্র সৃষ্টি করে।
- মেরুরজ্জুর ভিতরে থাকে ami পদার্থ আর বাইরে থাকে শ্বেত পদার্থ।
- হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, ক্ষরণকারী গ্রন্থি ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বৃক্কের কাজ বর্ণনা কর।

২. কোথা থেকে প্রান্তীয় স্নায়ুর উৎপত্তি ঘটে? প্রান্তীয় স্নায়ুর বৈশিষ্ট্য কী?

৩. প্রতিবর্ত ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

৪. অক্সিন ও জিব্বেরেলিনের কাজ উলেখ কর।

৫. হরমোনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি উদ্ভিদের ফুল ফোটাতে সাহায্য করে?

ক. জিব্বেরেলিন খ. সাইটোকাইনিন

গ. ফোরিজেন ঘ. অক্সিন

২. নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য নিষ্কাশনে মানবদেহের কোন অঙ্গটি প্রধান fwgKv রাখে?

ক. বৃক্ক খ. ত্বক

গ. নাক ঘ. পায়ু

নিচের Ab‡"Q`wU **পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও**

প্রমার কক্ষে জানালার কাছে টবের মধ্যে লাগানো মানিপ্ল্যান্ট গাছটি দ্রুত বাড়ায় এর লতাগুলো জানালার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রমা হাত দিয়ে এগুলোকে কক্ষের ভেতর দিকে এনে দিলেও এরা আবার জানালার দিকেই ধাবিত হয়।

৩. প্রমার গাছটি কী কারণে জানালার দিকে ধাবিত হয়?

ক. বাতাস খ. জলীয়বাষ্প

গ. আলো ঘ. তাপ

৪. প্রমার মানিপ্ল্যান্ট গাছটির বৃদ্ধিতে সাহায্য করে-

i. অ্যাবসাইসিক এসিড

ii. সাইটোকাইনিন

iii. জিব্বেরেলিন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

ক. হরমোন কী?

খ. উদ্ভিদে অক্সিনের fwgKv ব্যাখ্যা কর।

গ. মানুষের গুরুgw¯Í‡®‹ উপরের কোষটির অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মানবদেহে উদ্দীপনা পরিবহনে উপরের কোষের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২. অপু খুব মনোযোগ দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের একক আঁকছিল। এমন সময় পেছন থেকে তার বোন কান্তা পিঠে খোঁচা দিল। অপু পিছনে না তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ কান্তার হাত ধরে ফেলল। অপু তখন কান্তাকে বলল যে, তার হাত ধরতে পারার সাথে তার অঙ্কনের বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে।

ক. মানবদেহের প্রধান রেচন অঙ্গ কী?

খ. ট্রফিক চলন বলতে কী বুঝায়?

গ. অপু যা আঁকছিল তার গঠন বর্ণনা কর।

ঘ. কান্তার হাত ধরতে পারার সাথে অপুর দেহের স্নাqweK প্রক্রিয়াটি কীভাবে জড়িত বিশ্লেষণ কর।

নিজেরা কর

১. তোমার চোখের পাতার উপর আলো পড়লে তুমি চোখ বন্ধ করে ফেল কেন? কারণটি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

২. তোমরা একটি পাতাবাহার গাছের আগা কেঁটে দাও। এবার কয়েক দিন ধরে পর্যবেক্ষণ কর। কী ঘটে এবং কেন ঘটে তা ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরমাণুর গঠন

পরমাণু খুব ক্ষুদ্র কণা। তাই এর গঠন m¤ú‡K ধারণা পাওয়া সহজ নয়। তবে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরমাণুর গঠন m¤ú‡K পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেছে। পরমাণুতে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার ভিন্নতার কারণে পরমাণুর ধর্মে পার্থক্য দেখা যায়।

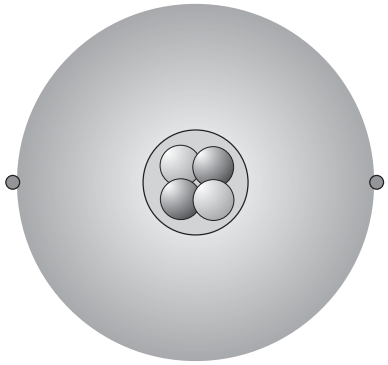

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারমাণবিক সংখ্যা ও ভরসংখ্যা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আইসোটোপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আইসোটোপের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে আইসোটোপের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।
- ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আয়ন কীভাবে সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের পার্থক্য করতে পারব।

পাঠ ১-৩ : পরমাণুর ধারণার বিকাশ ও গঠন

তোমরা জেনেছ যে, পদার্থ ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। এ ক্ষুদ্র কণা দুই রকমের- অণু ও পরমাণু। পরমাণু ক্ষুদ্রতম কণা। একের অধিক পরমাণু ci¯ú‡ii সাথে যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। ক্ষুদ্রতম কণার বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ নানা রকম মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস wLóce ৪০০ অব্দে সর্বপ্রথম পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা নিয়ে মতবাদ পোষণ করেন। তার মতে সকল পদার্থই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য (যা আর ভাঙ্গা যায় না) কণা দিয়ে তৈরি। তিনি এই ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন পরমাণু বা এটম। এটম কথাটি তিনি নিয়েছিলেন গ্রীক শব্দ অ্যাটোমোস (Atomos) থেকে যার অর্থ হলো অবিভাজ্য। তার সমসাময়িক সময়ের আরও দুজন দার্শনিক প্লেটো (Plato) এবং অ্যারিস্টটল (Aristotle) তার মতবাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। অ্যারিস্টটলের মতে c`v_mgn wbie"Qb (Continuous), একে যতই ভাঙ্গা হোক না কেন, পদার্থের কণাগুলো ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে।

১৮০৩ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন (John Dalton) পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা m¤ú‡K বলেন–

পরমাণু হলো মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা এবং এটিকে আর ভাঙ্গা যায় না। ডাল্টনের মতবাদ সকলে গ্রহণ করে। ফলে অ্যারিস্টটলের মতবাদটি পরিত্যক্ত হয়।

আসলে পরমাণু অবিভাজ্য নয় বা ক্ষুদ্রতম কণিকাও নয়। পরমাণু বিভাজ্য। এরা আরও ছোট কিছু কণা যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত।

ডাল্টনের পরমাণুবাদের এই সীমাবদ্ধতা `i করার জন্য এরপর আরও অনেকে পরমাণু মডেলের c¯Íve করেন। এদের মধ্যে রাদারফোর্ড ও বোরের পরমাণু মডেল গ্রহণযোগ্যতা পায়।

একসময় বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ও তার সহকর্মীরা একটি পরীক্ষা করেন যা পরমাণুর গঠন m¤ú‡K ভালো ধারণা দেয়।

পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে তিনি বলেন যে, পরমাণুতে ধনাত্মক আধান ও ভর একটি ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ। তিনি এর নাম দেন নিউক্লিয়াস। তিনি আরও ব্যাখ্যা দেন যে, পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গা ফাঁকা, আর ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণার তেমন কোনো ভর নেই এবং তারা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

রাদারফোর্ডের মডেল সৌরজগতের মতো। কিন্তু রাদারফোর্ড নির্দিষ্ট কোনো কক্ষপথের কথা বলেননি। বিজ্ঞানী বোর পরবর্তীতে ধারণা দেন যে, ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা কিছু নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, পরমাণু অবিভাজ্য নয়। পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট প্রোটন ও আধান নিরপেক্ষ নিউট্রন রয়েছে। পরমাণুর ভরের প্রায় পুরোটাই নিউক্লিয়াসে থাকে। ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে। ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী জায়গা ফাঁকা। প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গা ফাঁকা।

চিত্র ৬.১ : হিলিয়াম পরমাণুতে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন

পাঠ ৪-৬ : পারমাণবিক সংখ্যা, ভরসংখ্যা ও আইসোটোপ

প্রতিটি মৌলের আলাদা আলাদা পরমাণু রয়েছে, যেমন হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণু থেকে আলাদা। একটি মৌলের পরমাণু থেকে আরেকটি মৌলের পরমাণুর মধ্যে আকারে, ভরে ও ধর্মে পার্থক্য হয়ে থাকে। কেন এই পার্থক্য? পরমাণুসমূহের মধ্যে পার্থক্য পরমাণুতে প্রোটন বা ইলেকট্রনের সংখ্যার পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে। পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে। তবে কোনো মৌলের পরমাণুর বৈশিষ্ট্যকে বোঝানোর জন্য প্রোটনের সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

কোনো মৌলের একটি পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয়। হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুতে একটি প্রোটন আছে। তাই হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ১। অক্সিজেনের একটি পরমাণুতে আটটি প্রোটন আছে। তাই অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮। পারমাণবিক সংখ্যা থেকে কী কী তথ্য পাওয়া যায় বলতে পারো?

কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা ৬, এ থেকে কী তথ্য পাওয়া যায়? পারমাণবিক সংখ্যা যেহেতু কোনো মৌলের প্রোটনের সংখ্যা, তাই বোঝা যায় কার্বনের একটি পরমাণুতে ৬টি প্রোটন আছে। একটি পরমাণুতে যেহেতু প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান, তাই বোঝা যায় কার্বনের একটি পরমাণুতে ৬টি ইলেকট্রন আছে।

কোনো মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা থেকে বোঝা যায় কি ঐ মৌলের পরমাণুতে কয়টি নিউট্রন আছে? না, নিউট্রন সংখ্যা জানা যায় না। নিউট্রন সংখ্যা জানতে হলে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ও ভরসংখ্যা জানতে হবে। একটি পরমাণুতে ইলেকট্রনের ভর নগণ্য। পরমাণুর প্রায় সবটুকু ভর তার নিউক্লিয়াসে থাকে। অর্থাৎ কোনো পরমাণুর ভর তার প্রোটন ও নিউট্রনের ভর। আবার নিউট্রন ও প্রোটনের ভর প্রায় সমান। কোনো মৌলের পরমাণুতে প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টিকে ভরসংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ

কোনো মৌলের ভরসংখ্যা = ঐ মৌলের পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা + নিউট্রনের সংখ্যা।

যেমন অক্সিজেন পরমাণুতে ৮টি প্রোটন আর ৮টি নিউট্রন থাকে। তাই অক্সিজেনের ভরসংখ্যা ১৬। আবার সোডিয়ামের একটি পরমাণুতে ১১টি প্রোটন আর ১২টি নিউট্রন আছে। তাই সোডিয়ামের ভরসংখ্যা ১১+১২=২৩। আগে বলা হয়েছে যে, পারমাণবিক সংখ্যা ও ভরসংখ্যা জানা থাকলে নিউট্রন সংখ্যা জানা যায়। নিচের উদাহরণ থেকে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

উদাহরণ : ক নামক একটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ১৭ ও ভরসংখ্যা ৩৫। ঐ মৌলের একটি পরমাণুতে কয়টি করে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন আছে।

সমাধান : ক মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা ১৭। কোনো মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা আসলে ঐ মৌলের একটি পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা। তাই এক্ষেত্রে ক মৌলটির পরমাণুতে প্রোটন আছে ১৭টি।

আবার কোনো পরমাণুতে প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান। তাই ক মৌলের একটি পরমাণুতে ইলেকট্রন রয়েছে ১৭টি।

কোনো পরমাণুর প্রোটনের সংখ্যা + নিউট্রনের সংখ্যা = ঐ মৌলের ভরসংখ্যা

অর্থাৎ ক মৌলের নিউট্রনের সংখ্যা = ক মৌলের ভরসংখ্যা − ক মৌলের প্রোটন সংখ্যা

তাই ক মৌলের নিউট্রনের সংখ্যা = ৩৫ − ১৭ = ১৮।

আইসোটোপ : তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ যে, একটি মৌলের প্রতিটি পরমাণুতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে। কিন্তু একটি মৌলের সকল পরমাণুর ভর এক নাও হতে পারে। কারণ একটি মৌলের পরমাণুতে বিভিন্ন সংখ্যায় নিউট্রন থাকতে পারে। যেমন হাইড্রোজেনের সকল পরমাণুতে একটি করে প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে। নিচের চিত্রগুলো দেখ।

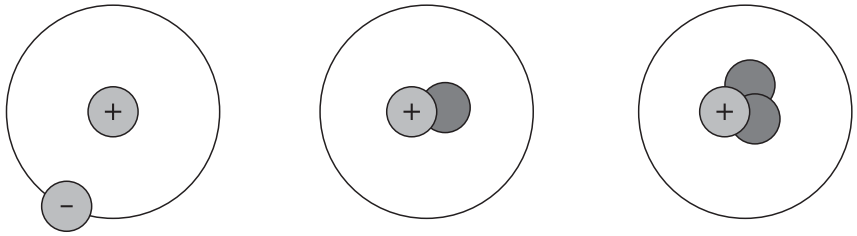

চিত্র ৬.২ : হাইড্রোজেন আইসোটোপ

হাইড্রোজেনের বেশিরভাগ পরমাণুতে কোনো নিউট্রন নেই (চিত্রের প্রথম পরমাণু)। তাই এদের ভরসংখ্যা ১। কিন্তু চিত্রের দ্বিতীয় পরমাণুটির মতো হাইড্রোজেনের কিছু cigvY‡Z একটি নিউট্রন থাকে। এদের ভরসংখ্যা ২। আবার চিত্রের তৃতীয় পরমাণুটির মতো হাইড্রোজেনের কিছু পরমাণুতে দুটি নিউট্রন থাকে। এদের ভরসংখ্যা ৩। চিত্রের তিনটি পরমাণু হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ। এরকমভাবে, কোনো মৌলের ভিন্ন ধরনের পরমাণু যাদের প্রোটন বা পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভরসংখ্যা ভিন্ন তাদের ঐ মৌলের আইসোটোপ বলে।

কার্বনের বেশিরভাগ পরমাণুতে ৬টি প্রোটন ও ৬টি নিউট্রন রয়েছে। কিন্তু কার্বনের কিছু পরমাণুতে ৭টি বা ৮টি নিউট্রনও থাকে। তাই কার্বনের তিনটি আইসোটোপ রয়েছে।

পাঠ ৭ ও ৮ : আইসোটোপের ধর্ম ও ব্যবহার

একই মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান বলে আইসোটোপগুলোর মধ্যে ধর্মে তেমন পার্থক্য নেই। তবে যেহেতু তাদের ভর আলাদা তাই তাদের সহজেই শনাক্ত করা যায়।

সাধারণত কোনো মৌলের একটি আইসোটোপ অনেক বেশি পাওয়া যায় কারণ তারা স্থায়ী। অন্য আইসোটোপগুলো ততটা স্থায়ী নয় এবং তারা ঐ মৌলের স্থায়ী আইসোটোপ বা অন্য মৌলে পরিণত হতে থাকে। অস্থায়ী আইসোটোপ বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও কণা বিকিরণ করে। তাই এদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলা হয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এ ধর্ম কাজে লাগানো হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে : বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে ও নিরাময়ে আইসোটোপের ব্যবহার করা হয়। কোনো ক্ষুদ্র রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তের মাধ্যমে আইসোটোপ পাঠিয়ে তা শনাক্ত করা যায়। একইভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর কোন কোষ ক্যান্সার আক্রান্ত, তা আইসোটোপ পাঠিয়ে নির্ণয় করা যায়। আবার ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করা যায় আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবহার করে। এছাড়াও তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয়।

কৃষিক্ষেত্রে : কৃষিক্ষেত্রে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কখন কোন সার কী পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে তা জানতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়।

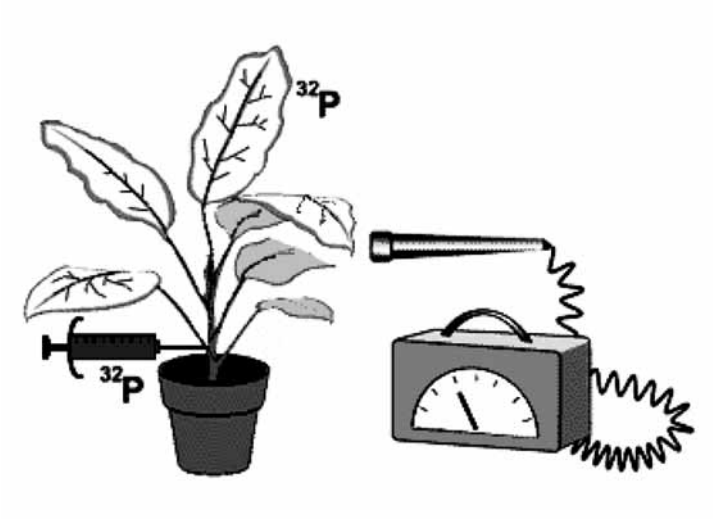

চিত্র ৬.৩ : কৃষি ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে : ব্যাকটেরিয়াসহ অনেক জীবাণু তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে মারা যায়। তাই তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে খাদ্যদ্রব্য বা djgj‡K জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়।

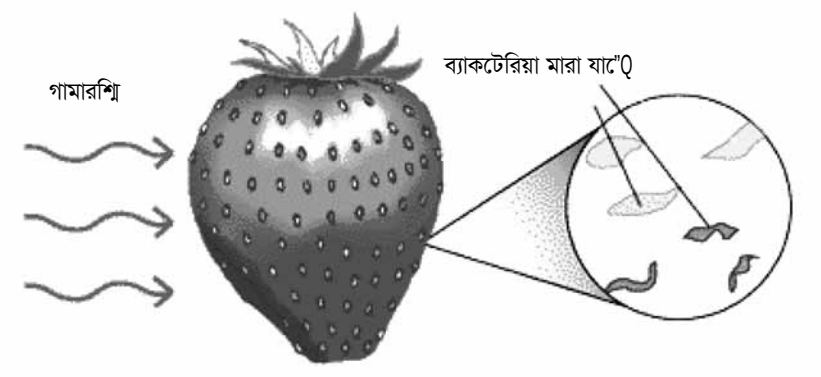

চিত্র ৬.৪: তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করা

f - ZwËK **বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে :** তোমরা অনেকসময় খবরে শুনে থাক যে, কোনো দেশে কয়েক কোটি বছরের পুরনো ফসিল পাওয়া গেছে। কীভাবে বিজ্ঞানীরা জানেন যে, ফসিলটি কত বছরের? এটি জানা যায় আইসোটোপের ক্ষয় থেকে। কোনো ফসিলে স্থায়ী ও অস্থায়ী আইসোটোপের অনুপাত থেকে বোঝা যায় ফসিলটি কত বছরের পুরনো।

পাঠ ৯-১১ : পরমাণুতে ইলেকট্রন কীভাবে বিন্য¯Í থাকে

তোমরা জেনেছ যে, পরমাণুতে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘোরে। এবং তাদের সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো একটি কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে? চিত্র ৬.২ এর হাইড্রোজেনের চিত্রটি দেখ। হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন থাকে। সেই ইলেকট্রনটি একা একা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘোরে। হিলিয়াম পরমাণুতে (চিত্র ৬.১) দুইটি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে একটি কক্ষপথে ঘোরে। কক্ষপথগুলোতে $2n^2$ (যেখানে $n = 1, 2, 3$ .... কক্ষপথের ক্রমিক নম্বর) mÎvbhvqx ইলেকট্রন বিন্যাস করা হয়। সে অনুযায়ী, একটি লিথিয়াম পরমাণুতে তিনটি ইলেকট্রন আছে। এদের মধ্যে দুটি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে থাকে আর তৃতীয়টি দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকে। একইভাবে কার্বন পরমাণুতে ৬টি ইলেকট্রন থাকায় এদের দুটি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে এবং বাকি চারটি ইলেকট্রন দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকে। এভাবে প্রথম কক্ষপথে m‡ev”P দুটি, দ্বিতীয় কক্ষপথে m‡ev”P আটটি এবং তৃতীয় কক্ষপথে m‡ev”P ১৮টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। কক্ষপথগুলোকে kw³¯Íi বলা হয়।

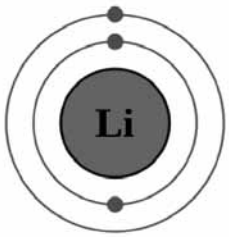

চিত্র ৬.৫ : লিথিয়াম পরমাণু

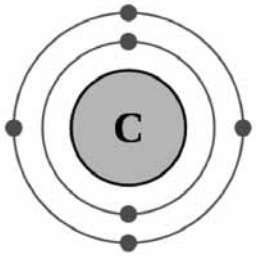

চিত্র ৬.৬ : কার্বন পরমাণু

এবার সোডিয়াম পরমাণুর কথা ধর। সোডিয়ামের একটি পরমাণুতে ১১টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। তাহলে এর ইলেকট্রনগুলো কয়টি কক্ষপথে থাকবে? নিশ্চয়ই ২, ৮, ১ এভাবে থাকবে। অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথে ২টি, দ্বিতীয় কক্ষপথে ৮টি এবং তৃতীয়টিতে ১টি থাকবে।

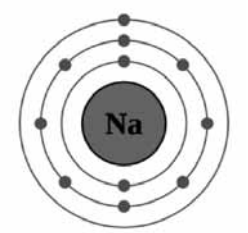

চিত্র ৬.৭ : সোডিয়াম পরমাণু

উপরের চিত্রগুলোতে যেভাবে ইলেকট্রন বিন্যাস দেখানো হয়েছে তা থেকে ইলেকট্রন বিন্যাস বোঝা বেশ সহজ। কিন্তু সহজে বা সংক্ষেপে সোডিয়াম পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস বোঝাতে হলে ২, ৮, ১ এভাবে লেখা হয়। নিচের ছকে পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে প্রথম ১৮টি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখানো হলো।

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা	প্রতীক ও ইলেকট্রন বিন্যাস লেখ
হাইড্রোজেন	১	
হিলিয়াম	২	
লিথিয়াম	৩	
বেরিলিয়াম	৪	
বোরন	৫	
কার্বন	৬	
নাইট্রোজেন	৭	
অক্সিজেন	৮	
ফ্লোরিন	৯	
নিয়ন	১০	
সোডিয়াম	১১	
ম্যাগনেসিয়াম	১২	
অ্যালুমিনিয়াম	১৩	
সিলিকন	১৪	
ফসফরাস	১৫	
সালফার	১৬	
ক্লোরিন	১৭	
আর্গন	১৮	

পাঠ ১২ ও ১৩ : ইলেকট্রন বিন্যাস ও মৌলের ধর্ম

মৌলিক পদার্থের ধর্ম gjZ তাদের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর নির্ভর করে। সর্বশেষ কক্ষপথে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে, ঠিক সে কয়টি ইলেকট্রন যদি ঐ kw³¯Í‡i থাকে তাহলে সেই কক্ষপথ cY থাকে। এরকম পরমাণুগুলো বেশ নিষ্ক্রিয় হয়। যেমন হিলিয়াম পরমাণুতে ২টি ইলেকট্রন থাকে। প্রথম কক্ষপথে যেহেতু m‡ev"P ২টি ইলেকট্রন থাকতে পারে, সেহেতু হিলিয়াম পরমাণু বেশ w¯'wZkxj বা নিষ্ক্রিয়। প্রতিটি পরমাণুই এরকম w¯'wZkxj Ae¯'vq থাকতে চায়।

একটি পরমাণুর শেষ কক্ষপথে বা kw³¯Í‡i প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বা কম ইলেকট্রন থাকে তাহলে কী হবে? ঐ পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বা অন্য পরমাণুকে ইলেকট্রন দিয়ে বা অন্য পরমাণুর সাথে ভাগাভাগি করে স্থিতিশীল বা cY Ae¯'vq আসতে চায়। যেমন সোডিয়াম পরমাণুর কথাই ধরা যাক। এর প্রথম শক্তিস্তরে ২টি, দ্বিতীয় kw³¯Í‡i ৮টি এবং তৃতীয় kw³¯Í‡i ১টি ইলেকট্রন থাকে। এটি কি w¯'wZkxj অবস্থা? নিশ্চয়ই না। তৃতীয় kw³¯Í‡i মাত্র একটি ইলেকট্রন থাকায় এটি wm_wZkxj নয়। কীভাবে এটি স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে? সোডিয়াম পরমাণু যদি একটি ইলেকট্রন অন্য কোনো পরমাণুকে দিয়ে দিতে পারে তাহলে সোডিয়াম পরমাণুতে প্রথম kw³¯Í‡i ২টি এবং ২য় kw³¯Í‡i ৮টি ইলেকট্রন থাকে। এটি একটি স্থিতিশীল অবস্থা। তবে একটি ইলেকট্রন

বর্জন করে বা হারিয়ে নিজে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তোমরা জান একটি পরমাণু আধান নিরপেক্ষ। কিন্তু সোডিয়াম পরমাণু একটি ইলেকট্রন হারিয়ে কি আধান নিরপেক্ষ থাকে? না থাকে না।

একটি ইলেকট্রন হারানোর পর সোডিয়াম পরমাণু আর আধান নিরপেক্ষ নেই, আধানযুক্ত হয়েছে। এরকম আধানযুক্ত পরমাণুকে বলে আয়ন। যে আয়নে ধনাত্মক আধান আছে তাকে ক্যাটায়ন বলে। তাহলে সোডিয়াম পরমাণু একটি ইলেকট্রন হারানোর পর ক্যাটায়নে পরিণত হয়েছে।

এবার আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। ফ্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস ২, ৭। এটি কি একটি স্থিতিশীল অবস্থা? নিশ্চয়ই না। কারণ দ্বিতীয় k‖³¯Í‡i যদি ৮টি ইলেকট্রন থাকে সেটি স্থিতিশীল অবস্থা। তাহলে স্থিতিশীল অবস্থায় যেতে চাইলে ফ্লোরিন পরমাণুকে কী করতে হবে? এটি কি সোডিয়াম পরমাণুর মতো ইলেকট্রন অন্যকে দিয়ে দেবে? না, ৭টি ইলেকট্রন দেয়া বেশ কঠিন। বরং ফ্লোরিন পরমাণু যদি একটি ইলেকট্রন কারও কাছ থেকে নিতে পারে তাহলে এটি স্থিতিশীল হতে পারে কারণ তখন এটির দ্বিতীয় k‖³¯Í‡i ৮টি ইলেকট্রন থাকবে। দেখা যাক, একটি ইলেকট্রন যদি কারও কাছ থেকে পায় (ধরা যাক সোডিয়াম পরমাণু থেকে) তাহলে এটি আধান নিরপেক্ষ থাকে না আধানযুক্ত হয়ে যায়?

ফ্লোরিন পরমাণু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার পর ঋণাত্মক আধান যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়েছে। এরকম ঋণাত্মক আধানযুক্ত পরমাণুকে অ্যানায়ন বলে।

ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে পরমাণু আয়নে পরিণত হয়। দুটি পরমাণুর মধ্যে যেটি ইলেকট্রন বর্জন করে সেটি ক্যাটায়নে বা ধনাত্মক আয়নে এবং যেটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেটি ঋণাত্মক আয়নে বা অ্যানায়নে পরিণত হয়। ফলে তাদের মধ্যে একটি আকর্ষণ বল কাজ করে এবং তারা একে অন্যের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এইভাবে দুটি ভিন্ন মৌলের পরমাণু থেকে যৌগ তৈরি হয়। G m¤ú‡K তোমরা পরবর্তীতে আরও জানবে।

$$Na \longrightarrow Na^{++} e^{-}$$

$$F + e^{-} \longrightarrow F^{-}$$

$$Na + F \longrightarrow Na^{+}F^{-}$$

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম–

- পরমাণু অবিভাজ্য নয়। পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত।
- পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট প্রোটন ও আধান নিরপেক্ষ নিউট্রন রয়েছে। পরমাণুর ভরের প্রায় পুরোটাই নিউক্লিয়াসে থাকে।
- ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে বা খোলকে ঘোরে। ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী জায়গা ফাঁকা। প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গা ফাঁকা।
- প্রথম কক্ষপথে m‡e‖"P 2টি, দ্বিতীয় কক্ষপথে m‡e‖"P 8টি এবং তৃতীয় কক্ষপথে m‡e‖"P ১৮টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। কক্ষপথগুলোকে k‖³¯Íi বলা হয়।
- সর্বশেষ কক্ষপথে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে, ঠিক সেই কয়টি ইলেকট্রন যদি ঐ k‖³¯Í‡i থাকে তাহলে সেই কক্ষপথ cY থাকে। এরকম পরমাণুগুলো বেশ নিষ্ক্রিয় হয়।
- ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে পরমাণু স্থিতিশীলতা অর্জন করে এবং আয়নে পরিণত হয়।

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ কর

১। ———— এর মতবাদে পরমাণু অবিভাজ্য

২। পরমাণুর ভরের প্রায় পুরোটাই ———— থাকে।

৩। পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গা ————।

৪। পরমাণুতে ———— সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে।

৫। একটি মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রোটনের সংখ্যা ————।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। একটি পরমাণুতে কোথায় কোথায় ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন থাকে তা চিত্র এঁকে দেখাও ও বর্ণনা কর।

২। নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৭। একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস এঁকে দেখাও।

৩। চিকিৎসা ও কৃষিক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার আলোচনা কর।

৪। পরমাণু কেন আয়নে পরিণত হয় তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৫। ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন কীভাবে তৈরি হয় তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. একটি পরমাণুর দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বো"P কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

ক. ২ খ. ৮

গ. ১৮ ঘ. ৩২

২. রাদার ফোর্ডের পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে-

i. পরমাণু অবিভাজ্য

ii. পরমাণুকে ভাঙ্গা যায়

iii. পরমাণুর বেশিরভাগ অংশই ফাঁকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. iii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

নিচের বাক্যটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

কোন মৌলের একটি পরমাণুতে ১০টি ইলেকট্রন ও ৮টি নিউট্রন রয়েছে।

৩. পরমাণুটির ভরসংখ্যা কত?

ক. ১০ খ. ১৬

গ. ১৮ ঘ. ২৬

৪. উদ্দীপকের মৌলটি কী?

ক. অক্সিজেন
খ. সালফার
গ. সোডিয়াম
ঘ. ম্যাগনেসিয়াম

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. X পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ১১। অন্যদিকে Y পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ১৭ এবং নিউট্রন সংখ্যা ১৮।

ক. কার্বনের আইসোটোপ কয়টি?

খ. ক্যাটায়ন বলতে কী বুঝায়?

গ. Y পরমাণুর ভরসংখ্যা কত?

ঘ. X ও Y পরমাণুর ইলেকট্রনবিন্যাস প্রদর্শনপূর্বক এদের বন্ধন তৈরি করার সক্ষমতা ব্যাখ্যা কর।

২.

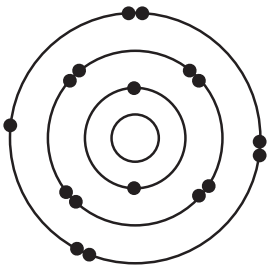

চিত্র- ১

চিত্র- ২

ক. এটম শব্দের অর্থ কী?

খ. অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮ বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকের ১ নং পরমাণুটি কোন ধরনের আধানযুক্ত ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ১ ও ২ নং পরমাণুর পারমাণবিক গঠনের Zjbvgj K আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

পৃথিবী ও মহাকর্ষ

এই মহাবিশ্বের প্রতিটি e¯‘ ci¯úi‡K ci¯ú‡ii দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলকে বলা হয় মহাকর্ষ। এই আকর্ষণ বল কি সকল ক্ষেত্রে সমান? না কোথাও কম, কোথাও বেশি। কিসের উপর এই বলের মান নির্ভর করে ? পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে পড়ন্ত e¯‘i যে ত্বরণ হয় তার মান কত, এই মান কেন পরিবর্তিত হয় ? এই অধ্যায়ে আমরা মহাকর্ষ, অভিকর্ষ, অভিকর্ষজ ত্বরণ, ভর ও ওজন নিয়ে আলোচনা করব।

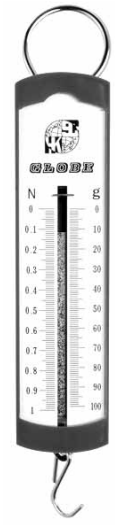

এই অধ্যায়ে পাঠ শেষে আমরা–

- মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মহাকর্ষ ও অভিকর্ষের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অভিকর্ষজ ত্বরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভর ও ওজনের পার্থক্য করতে পারব।
- অভিকর্ষজ ত্বরণের প্রভাবে বস্তুর ওজনের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১ : মহাকর্ষ

আমরা লাফ দিয়ে উপরের দিকে উঠতে চাইলে বেশি `i উঠতে পারি না। আবার f-c‡ô ফিরে আসি। গাছের ফল মাটিতে পড়ে। ক্রিকেট বলকে উপর দিকে ছুড়ে দিলে মাটিতে পড়ে। এর কারণ কী? কারণ পৃথিবী আমাদের তার নিজের দিকে টানে বা আকর্ষণ করে। শুধু পৃথিবী কেন, সবকিছুই আমাদের আকর্ষণ করে। আসলে এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি e¯‘কণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলকে মহাকর্ষ বলে।

তোমরা নিশ্চয়ই নিউটন ও আপেল মাটিতে পড়ার কাহিনী শুনে থাকবে। কথিত আছে, নিউটন একদিন বাগানে বসে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় তিনি গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়তে দেখেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, আপেলটি মাটিতে পড়ল কেন? নিশ্চয়ই কেউ একে মাটির দিকে টানছে। চিন্তা-ভাবনা শেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবী সকল e¯‘‡K তার নিজের দিকে টানে। পরে তিনি আরও সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শুধু পৃথিবী নয়, এ মহাবিশ্বের সকল e¯‘KYvB একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ বিশ্বের যে কোনো দুটি e¯‘i মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে।

নিউটনের মহাকর্ষ mÎ ও মহাকর্ষ বল

দুটি e¯‘KYvi মধ্যকার এ আকর্ষণ বলের মান শুধু e¯‘Ø‡qi ভর এবং এদের মধ্যকার `i‡Zi উপর নির্ভর করে। এদের আকৃতি, প্রকৃতি কিংবা মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। e¯‘Ø‡qi ভর বেশি হলে, আকর্ষণ বলও বেশি হয় আর তাদের মধ্যে `iZ বেশি হলে বল কম হয়। এ আকর্ষণ m¤ú‡K নিউটনের একটি mÎ আছে যা নিউটনের মহাকর্ষ mÎ নামে পরিচিত।

mÎwU **হলো :** মহাবিশ্বের প্রতিটি e¯‘KYv একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এ আকর্ষণ বলের মান e¯‘KYvØ‡qi ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের `i‡Zi বর্গের e¨¯ÍvbycvwZK এবং এ বল e¯‘KYvØ‡qi সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

ধরা যাক, m_1 এবং m_2 ভরের দুটি e¯‘ ci¯úi থেকে d `i‡Z Aew¯'Z (চিত্র ৭.১)। এদের মধ্যকার আকর্ষণ বল F হলে, মহাকর্ষ mÎvbymv‡i,

$$F = G\frac{m_1 m_2}{d^2}$$

এখানে এ একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে বিশ্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলে। এর অর্থ n‡"Q এক কিলোগ্রাম ভরের দুটি e¯‘ এক মিটার `i‡Z ¯'vcb করলে এরা ci¯úi‡K যে বলে আকর্ষণ করে তা G এর সমান।

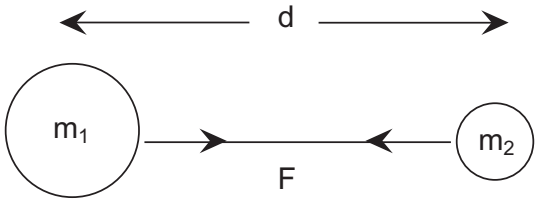

চিত্র ৭.১ : মহাকর্ষ বল

মহাকর্ষ mÎvbymv‡i আমরা দেখতে পাই, নির্দিষ্ট `i‡Z Aew¯'Z `wU e¯‘i ভরের গুণফল দ্বিগুণ হলে বল দ্বিগুণ হবে, ভরের গুণফল তিনগুণ হলে বল তিনগুণ হবে। আর নির্দিষ্ট ভরের দুটি e¯‘i `iZ¡ দ্বিগুণ করলে বল এক-চতুর্থাংশ হবে, `iZ তিনগুণ করলে বল নয় ভাগের এক ভাগ হবে। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী m‡hi চারদিকে ঘুরে। এবার বল, অন্য সকল গ্রহ m‡hi চারদিকে ঘুরে কেন?

পাঠ ২ ও ৩ : অভিকর্ষ ও অভিকর্ষজ ত্বরণ

অভিকর্ষ : আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি e¯‘KY©B একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি e¯‘i মধ্যে যে আকর্ষণ তাই মহাকর্ষ। দুটি e¯‘i একটি যদি পৃথিবী হয় এবং পৃথিবী যদি বস্তুটিকে আকর্ষণ করে তবে তাকে মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ বলে। অর্থাৎ কোনো e¯‘i উপর পৃথিবীর আকর্ষণই অভিকর্ষ। গাছের ফল মাটিতে পড়ে। ক্রিকেট বলকে উপর দিকে ছুড়ে দিলে মাটিতে পড়ে। এখানে পৃথিবী যেমন ফল বা ক্রিকেট বলকে আকর্ষণ করে তেমনি এরাও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী অনেক বড় এবং এর আকর্ষণ বল অনেক বেশি হওয়ায় ফল ও ক্রিকেট বল মাটিতে পড়ে। পৃথিবী এবং অন্য যে কোনো e¯‘i মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে অভিকর্ষ বলে। mh ও চন্দ্রের মধ্যে যে আকর্ষণ তা মহাকর্ষ, কিন্তু পৃথিবী এবং তোমার বিজ্ঞান বই–এর মধ্যে যে আকর্ষণ তা অভিকর্ষ।

অভিকর্ষজ ত্বরণ : আমরা জানি বল প্রযুক্ত হলে কোনো e¯‘i বেগ বৃদ্ধি পায়। প্রতি সেকেন্ডে যে বেগ বৃদ্ধি পায় তাকে ত্বরণ বলে। অভিকর্ষ বলের প্রভাবেও ব¯‘র ত্বরণ হয়। এ ত্বরণকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ বলা হয়। যেহেতু বেগ বৃদ্ধির হারকে ত্বরণ বলে, সুতরাং অভিকর্ষ বলের প্রভাবে fc‡ô মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো ব¯‘র বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে।

অভিকর্ষজ ত্বরণকে g দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেহেতু অভিকর্ষজ ত্বরণ এক প্রকার ত্বরণ, সুতরাং এর একক হবে ত্বরণের একক অর্থাৎ মিটার/সেকেন্ড^২।

ধরা যাক, M = পৃথিবীর ভর, m=f-c‡ô বা এর নিকটে অবস্থিত কোনো ব¯‘র ভর, d=ব¯‘ ও পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্যবর্তী `iZ| তাহলে মহাকর্ষ mÎvbmv‡i, অভিকর্ষ বল, $F = G\frac{Mm}{d^2}$

আবার বলের পরিমাপ থেকে আমরা পাই, অভিকর্ষ বল = ভর x অভিকর্ষজ ত্বরণ

অর্থাৎ F=mg

উপরিউক্ত দুই সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়,

$mg = \frac{GMm}{d^2}$

বা, $g = \frac{GM}{d^2}$

এ সমীকরণের ডান পাশে ব¯‘র ভর m অনুপস্থিত। সুতরাং অভিকর্ষজ ত্বরণ ব¯‘র ভরের উপর নির্ভর করে না। যেহেতু G এবং পৃথিবীর ভর M ধ্রুবক, তাই g-এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ব¯‘র `iZ d-এর উপর নির্ভর করে। সুতরাং g-এর মান ব¯‘ নিরপেক্ষ হলেও স্থান নিরপেক্ষ নয়। এর অর্থ হলো g-এর মান বিভিন্ন AÂ‡j বিভিন্ন রকম হয়।

অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন : পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে f-c‡ôi `iZ অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R হলে fc‡ô $g = \frac{GM}{R^2}$

যেহেতু পৃথিবী m¤úY গোলাকার নয়, মেরু AÂ‡j একটুখানি চাপা, তাই পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R ও ধ্রুবক নয়। সুতরাং f-c‡ôi সর্বত্র g-এর মান সমান নয়। মেরু AÂ‡j পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R সবচেয়ে কম বলে সেখানে g-এর মান সবচেয়ে বেশি। মেরু AÂ‡j g-এর মান ৯.৮৩২ মিটার/সেকেন্ড^২। মেরু থেকে বিষুব AÂ‡ji দিকে R এর মান বাড়তে থাকায় g-এর মান কমতে থাকে। বিষুব AÂ‡j R এর মান সবচেয়ে বেশি বলে g-এর মান সবচেয়ে কম। ৯.৭৮ মিটার/সেকেন্ড^২। ক্রান্তীয় AÂ‡j g-এর মান ৯.৮০৬৬৫ মিটার/সেকেন্ড^২। হিসাবের সুবিধার জন্য g-এর আদর্শ মান ধরা হয় ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^২ বা ৯.৮১ মিটার/সেকেন্ড^২। f-c‡ô g- এর মান ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^২। এর অর্থ n‡"Q f-c‡ô মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো ব¯‘র বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড বৃদ্ধি পায়।

কোনো ব¯‘কে উপর থেকে ছেড়ে দিলে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে fwg‡Z পৌঁছায়। একই D"PZv থেকে একই সময় এক টুকরা পাথর ও এক টুকরা কাগজ ছেড়ে দিলে এগুলো একই সময়ে f-c‡ô পৌঁছাবে কি? যেহেতু ব¯‘র উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ ব¯‘র ভরের উপর নির্ভর করে না, তাই পাথর ও কাগজের উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ একই। সুতরাং তাদের একই সময়ে মাটিতে পৌঁছানো উচিত। কিন্তু ev¯Í‡e পাথরটি কাগজের আগেই মাটিতে পৌঁছায়। বাতাসের বাধার কারণে এরূপ হয়। বাতাসের বাধা না থাকলে এগুলো অবশ্যই একই সময়ে মাটিতে পৌঁছাত।

পাঠ ৪ : ভর ও ওজন

যখন আমরা বলি কবিরের ওজন ৯০ কিলোগ্রাম (কেজি) তখন আমরা আসলে বুঝাই যে, কবিরের দেহের ভর ৯০ কিলোগ্রাম (কেজি)। আমরা যখন ৫০ কেজি চাউলের e¯Ív কিনি তখন আমরা আসলে ঐ e¯Ívi চাউলের ভর ৫০ কেজি বুঝি; কিন্তু e¯Ívi চাউলের ওজন বুঝাই না।

পদার্থবিজ্ঞানে ভর ও ওজন m¤úY পৃথক দুটি রাশি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা ওজন কথাটাকে অপব্যবহার করি যা একে ভুল অর্থে বুঝাই। আসলে আমরা কোনো ব¯‘র ভরকে ঐ ব¯‘র ওজন বলে থাকি। তবে ভর ও ওজনের পার্থক্য কী ?

ভর : প্রত্যেক ব¯‘ পদার্থ দ্বারা গঠিত। ভর হলো কোনো ব¯‘তে পদার্থের পরিমাণ। ব¯‘র এই ধর্ম এর অবস্থান, আকৃতি ও গতি পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তিত হয় না। যে পরমাণু ও অণু দিয়ে ব¯‘টি গঠিত তার সংখ্যা ও সংযুক্তির উপর ব¯‘টির ভর নির্ভর করে। ভরের আন্তর্জাতিক একক হলো কিলোগ্রাম বা কেজি (kg)। বেশি ভরকে (যেমন এক ট্রাক চাউল) মেট্রিক টনে মাপা হয়। এক টন ১০০০ কিলোগ্রামের সমান। অল্প ভরকে মাপা হয় গ্রামে। যেমন কোনো পেনসিলের ওজন ৫ গ্রাম (g)। ১০০০ গ্রামে ১ কেজি।

ওজন : আমরা জানি যে, কোনো ব¯‘কে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে fwg‡Z ফিরে আসে। এটা ঘটে ব¯‘র ওজনের জন্য যা একে পৃথিবীর দিকে টানে। পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের টানেই এটা ফিরে আসে।

কোনো ব¯‘কে পৃথিবী যে বল দ্বারা তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাকে ব¯‘র ওজন বলে। কোনো ব¯‘র ভর m এবং পৃথিবীর কোনো স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ g হলে ঐ স্থানে ব¯‘র ওজন w হবে।

$$W = mg$$

যেহেতু ওজন একটি বল, সুতরাং এটি একটি ভেক্টর রাশি। এর দিক পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে।

ওজনের একক হলো বলের একক অর্থাৎ নিউটন। পৃথিবী পৃষ্ঠে ১০ কেজি ভরের ব¯‘র ওজন হবে,

W =১০x ৯.৮ নিউটন = ৯৮ নিউটন

স্প্রিং নিক্তির সাহায্যে কোনো ব¯‘র ওজন পরিমাপ করা হয়।

পাঠ ৫ : ভর ও ওজনের m¤úK

প্রত্যেক ব¯‘ পদার্থ দ্বারা গঠিত। ব¯‘র মধ্যে পদার্থের পরিমাণই n‡"Q এর ভর। ভর কিলোগ্রাম (kg) এককে নিক্তি দ্বারা পরিমাপ করা হয়। ভর n‡"Q একটি ভৌত রাশি যা f-c‡ô বা f-c‡ôi উপরে ব¯‘র অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না। ৭৫ কেজি ভরের একজন gnvkb¨Pvixi ভর চাঁদে কিংবা পৃথিবীর বা চাঁদের কক্ষপথেও ৭৫ কেজিই থাকবে। মহাkbjচারী কতটুকু পদার্থ দিয়ে তৈরি স্থান পরিবর্তনে তার কোনো পরিবর্তন n‡"Q না বলে তার ভর সর্বত্র অপরিবর্তিত থাকে।

যেহেতু e¯Íi ভর একটি ধ্রুব রাশি, সুতরাং ব¯‘র ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর উপর নির্ভর করে। যেসব কারণে অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন ঘটে সেসব কারণে ব¯‘র ওজনও পরিবর্তিত হয়। f-cô থেকে যত উপরে উঠা যায় ব¯‘র ওজন তত কমতে থাকে। ব¯‘র ওজন ব¯‘র মৌলিক ধর্ম নয়। কোনো ব¯‘র ওজন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ শূন্য, তাই সেখানে ব¯‘র ওজনও শূন্য। একদম মহাশূন্যে কোনো ব¯‘র ওজন kbj হতে পারে যেখানে ব¯‘র উপর কোনো মহাকর্ষ বল নেই। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণের মান প্রায় পৃথিবীর $\frac{১}{৬}$ ভাগ। সুতরাং চাঁদে ১ কেজি ভরের ব¯‘র ওজন হবে কেবলমাত্র ১.৬ নিউটন (N)।

কোনো ব¯‘র ওজন পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তার `i‡Zi উপর নির্ভর করে। যদি `iZ বাড়ানো হয় তাহলে তার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ কমে যায়, ফলে ব¯‘র ওজন হ্রাস পায়। f-c‡ô ১ কেজি ভরের কোনো ব¯‘র ওজন ৯.৮ নিউটন হলেও পৃথিবী থেকে `iZ বাড়ার সাথে সাথে ব¯‘র ওজন কমতে থাকে।

> পৃথিবীর পৃষ্ঠেও কোনো ব¯‘র ওজনের অতি সামান্য তারতম্য ঘটে। এর একটি কারণ n‡"Q cথিবী সুষম গোলক নয় এবং f-c‡ôi সর্বত্র অভিকর্ষজ ত্বরণের মানও এক নয়। অবশ্য এ পার্থক্য এত ক্ষুদ্র যে কেবল সুবেদী ওজন মাপক যন্ত্রের সাহায্যেই তা পরিমাপ করা যাবে। অধিকাংশ হিসাব নিকাশের সময় আমরা এ পার্থক্য উপেক্ষা করি। ১ কেজি ভরের কোনো ব¯‘র ওজন সবচেয়ে বেশি হবে পৃথিবীর দুই মেরুতে অর্থাৎ উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে। যেখানে এর ওজন হবে ৯.৮৩ নিউটন। বিষুবীয় AÂ‡j এর ওজন সবচেয়ে কম হবে ৯.৭৮ নিউটন। ক্রান্তীয় অঞ্চলের ওজন হবে ৯.৭৯ নিউটন।

যেহেতু বস্তুর ভর বেশি হলে তার ওজনও বেশি হয়, ওজন ভরের সমানুপাতিক। সুতরাং যে সকল যন্ত্র দিয়ে ওজন মাপা যায় সেগুলো দিয়ে ভরও মাপা যায়। স্প্রিং নিক্তি অনেক সময় কিলোগ্রাম এককে দাগাঙ্কিত থাকে। যেহেতু নিক্তি এবং ওজন মাপক যন্ত্রগুলো এমনভাবে দাগাঙ্কিত থাকে যে, অনেক সময় আমরা ভর ও ওজন উভয়ের জন্যই কিলোগ্রাম একক ব্যবহার করে থাকি। এটি অবশ্যই ভুল। ওজন এক প্রকার বল এবং বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের সময় তা অবশ্যই নিউটন এককে পরিমাপ করতে হবে। যখন আমরা ১ কেজি লিখিত একটি চাউলের প্যাকেট বা একটি দুধের টিন কিনি–তখন বুঝি ঐ প্যাকেটের চাউলের বা টিনের দুধের ভর ১ কেজি কিন্তু ওজন ১ কেজি নয়, পৃথিবীতে এগুলোর ওজন হবে ৯.৮ নিউটন। চাউলের প্যাকেটের ওজন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বা চাঁদে ভিন্ন হবে যদিও ভরের কোনো পরিবর্তন হবে না।

পাঠ ৬ : পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ ও বস্তুর ওজন

ব¯‘র ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে সকল কারণে অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন ঘটে সে সকল কারণে ব¯‘র ওজনও পরিবর্তিত হয়। ব¯‘র ওজন ব¯‘র মৌলিক ধর্ম নয়। স্থানভেদে ব¯‘র ওজনের পরিবর্তন হয়। যে সকল কারণে ওজনের পরিবর্তন হয় নিচে তা বর্ণনা করা হলো।

(ক) f-c‡ôi বিভিন্ন স্থানে : পৃথিবীর আকৃতি ও আহ্নিক গতির জন্য বিভিন্ন স্থানে ব¯‘র ওজন বিভিন্ন হয়।

(১) পৃথিবীর আকৃতির জন্য : পৃথিবী সুষম গোলক না হওয়ায় পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে fc‡ôi সকল স্থান mg`‡i নয়। যেহেতু g এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে `i‡Zi উপর নির্ভর করে, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে g এর মানের পরিবর্তন হয়। বিষুবীয় AÂ‡j পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বেশি হওয়ায় g এর মান সবচেয়ে কম (৯.৭৮ মিটার/সেকেন্ড$^{-২}$)। সুতরাং বিষুবীয় AÂ‡j কোনো ব¯‘র ওজন সবচেয়ে কম হয়। বিষুবীয় AÂj থেকে মেরু AÂ‡ji দিকে যত যাওয়া যায়, ব্যাসার্ধ তত কমতে থাকে এবং g এর মান বাড়তে থাকে (৯.৮৩ মিটার/সেকেন্ড$^{-২}$) । এর ফলে ব¯‘র ওজনও বাড়তে থাকে। †gi AÂ‡j c‖_exi ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম হওয়ায় g এর মান মেরু AÂ‡j সবচেয়ে বেশি। ফলে ওজনও সবচেয়ে বেশি হয়।

(২) পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য : পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য অভিকর্ষজ ত্বরণ বিষুবীয় AÂj থেকে মেরু AÂ‡ji দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ব¯‘র ওজনও বৃদ্ধি পায়।

(খ) fcô থেকে D"PZi কোনো স্থানে : fcô থেকে যত উপরে উঠা যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মানও তত কমতে থাকে। এর ফলে fcô থেকে যত উঠা যায় ব¯‘র ওজনও তত কমতে থাকে। এই কারণে পাহাড় বা পর্বতশীর্ষে ব¯‘র ওজন কম হয়।

(গ) পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো স্থানে : fcô থেকে যত নিচে যাওয়া যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ততই কমতে থাকে। এর ফলে পৃথিবীর যত অভ্যন্তরে যাওয়া যায় ব¯‘র ওজন তত কমতে থাকে। এ কারণে খনিতে কোনো ব¯‘র ওজন কম হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান শূন্য। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রে যদি কোনো ব¯‘কে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ব¯‘র উপর পৃথিবীর কোনো আকর্ষণ থাকবে না, অর্থাৎ ব¯‘র ওজন শূন্য হবে।

পাঠ ৭ ও ৮ : লিফটে ও মহাশূন্যে ওজনের তারতম্য : ওজনহীনতা

fc‡ôi কোনো একটি স্থানে g এর মান নির্দিষ্ট, ফলে সেখানে কোনো ব্যক্তির ওজনও নির্দিষ্ট। তা সত্ত্বেও সেখানে কোনো ব্যক্তির ওজনের ভিন্নতা অনুভব করতে পারেন এবং নিজেকে ওজনহীনও মনে করতে পারেন। আসলে ওজন আর ওজন অনুভব করা এক কথা নয়। পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল থাকবেই। ফলে তার ওজন থাকবেই কিন্তু তিনি সেই ওজন অনুভব করবেন কেবলমাত্র তখনই যখন তার ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী কোনো প্রতিক্রিয়া বল তার উপর প্রযুক্ত হবে।

আমরা যখন লিফটে চড়ে উঁচু দালানে ওঠা-নামা করি তখন আমরা ওজনের তারতম্য অনুভব করি। আমরা যখন কোনো স্থির লিফটে দাঁড়াই তখন আমরা লিফটের মেঝের উপর আমাদের ওজনের সমান বল প্রয়োগ করি, লিফটও আমাদের উপর ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে–আমরা আমাদের ওজনের A‖¯ÍZ টের পাই। কিন্তু লিফট যদি উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন f¯_র অবস্থান থেকে উপরের দিকে যাত্রা করায় লিফটটির উপরের দিকে একটি ত্বরণ সৃষ্টি হয় ফলে লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ হয় g এর চেয়ে বেশি। এ বর্ধিত ত্বরণের জন্য আমরা

লিফটের উপর আমাদের ওজনের চেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করি। তখন লিফটও আমাদের উপর বিপরীতমুখী যে প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে তা আমাদের ওজনের চেয়ে বেশি হয় এবং নিজেদেরকে ভারী অনুভব করি। কিন্তু এরপর লিফট যখন সমবেগে উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন তার কোনো ত্বরণ থাকে না, ফলে আমরা আর ওজনের চেয়ে অতিরিক্ত বল অনুভব করি না, কেবল ওজনই অনুভব করি। অপরপক্ষে লিফট যখন নিচে নামতে শুরু করে তখন স্থির অবস্থান থেকে একটি ত্বরণ সৃষ্টি হয় এবং লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ g এর চেয়ে কম হয়। এ কম ত্বরণ নিয়ে আমরা লিফটের উপর আমাদের ওজনের চেয়ে কম বল প্রয়োগ করি। ফলে, আমরা হালকা বোধ করি অর্থাৎ আমাদের ওজন কম মনে হয়। লিফট যদি মুক্তভাবে নিচে পড়ে অর্থাৎ, লিফটেরও যদি g ত্বরণ হয়, তবে লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ হবে (g - g) অর্থাৎ শূন্য। ফলে আমরা লিফটের উপর কোনো বল প্রয়োগ করব না। তখন লিফটও আমাদের ওজনের বিপরীতে আমাদের উপর কোনো প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করবে না এবং আমরা নিজেদেরকে ওজনহীন মনে করব। কোনো লিফটের কেবল বা দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে লিফটটি যদি অভিকর্ষের প্রভাবে নিচে পড়ে তখন এ অবস্থার উদ্ভব হবে। এ অবস্থায় যদি লিফটের ছাদ থেকে ঝুলন্ত বা লিফটে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তির হাতে ধরা স্প্রিং নিক্তি থেকে একটি ব¯‘ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে স্প্রিং নিক্তির কাঁটা শূন্য দাগে অবস্থান করছে। অর্থাৎ, ব¯‘টির ওজন শূন্য।

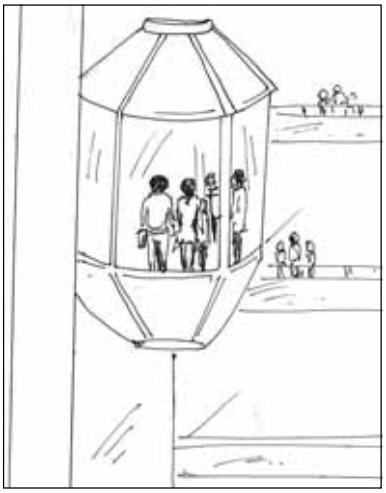

চিত্র ৭.২ : লিফট

মহাশূন্যযানের পৃথিবী বা চাঁদকে প্রদক্ষিণ করার ও লিফটের মুক্তভাবে নিচে পড়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মহাশূন্যচারীরা মহাশূন্যযানে করে পৃথিবীকে একটি নির্দিষ্ট D"PZvq বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে থাকেন। এ বৃত্তাকার গতির জন্য মহাশূন্যযানের দেয়ালের সাপেক্ষে মহাশূন্যচারীর ত্বরণ kb¨ হয় এবং মহাশূন্যচারী মহাশূন্যযানের দেয়াল বা মেঝেতে কোনো বল প্রয়োগ করেন না। ফলে তিনি তার ওজনের বিপরীত কোনো প্রতিক্রিয়া বলও অনুভব করেন না। তাই তিনি ওজনহীনতা অনুভব করেন। এ অবস্থায় মহাশূন্যযান থেকে কোনো ব¯‘কে ছেড়ে দিলে পড়ে না, গ্লাসের পানি উপুড় করলেও পড়বে না অর্থাৎ সবকিছুই ওজনহীন মনে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছুই ওজনহীন হয় না, কেননা ঐ অবস্থানেও মহাশূন্যচারীর ভর আছে, ঐ স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ g আছে, ফলে পৃথিবীর আকর্ষণ তথা ওজন আছে। কেবল মহাশূন্যযান g ত্বরণে গতিশীল হওয়ার কারণে এ আপাতত ওজনহীনতার উদ্ভব n‡"Q| যদি ঐ স্থানে মহাশূন্যযান বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ না করে, কিংবা পৃথিবীর দিকে মুক্তভাবে না পড়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু মহাশূন্যচারী অবশ্যই তাঁর ওজন টের পাবেন।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম–

- এ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি ব¯‘র মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে।
- মহাবিশ্বের প্রতিটি ব¯‘কণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এ আকর্ষণ বলের মান ব¯‘কণাদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের `i‡Zi বর্গের e¨¯ÍvbycvwZK| এ বল ব¯‘কণাদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।
- পৃথিবী এবং অন্য যে কোনো ব¯‘র মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে অভিকর্ষজ বা মাধ্যাকর্ষণ বলে।
- মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে f-c‡ô মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো ব¯‘র বেগ বৃদ্ধির হারকে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ বলে্
- অভিকর্ষজ ত্বরণ বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ g-এর আদর্শ মান ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^{২}।
- ব¯‘র মধ্যে পদার্থের পরিমাণই n‡"Q এর ভর।
- কোনো ব¯‘কে পৃথিবী যে বল দ্বারা তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাকে ব¯‘র ওজন বলে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দাড়িপাল্লায় মাপলে কোনো e¯‘i ভর পৃথিবী ও চাঁদে সমান হবে কেন? ব্যাখ্যা কর।

২. দুটি e¯‘i মধ্যবর্তী `iZ তিনগুণ বাড়ালে এদের আকর্ষণ বলের কী পরিবর্তন হবে এবং কেন পরিবর্তন হবে।

৩. ভর ও ওজনের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখ।

৪. পৃথিবীর মেরু AÂj ও বিষুব AÂ‡j একই e¯‘i ওজনে পার্থক্য দেখা যায় কেন।

৫. অভিকর্ষজ ত্বরণ বলতে কী বোঝায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভরের একক কী?

ক. গ্রাম খ. কিলোগ্রাম

গ. কুইন্টাল ঘ. নিউটন

২. বস্তুর ভরের ক্ষেত্রে কোন বিবৃতিটি সঠিক?

ক. অবস্থানের পরিবর্তনে e¯Zi ভর পরিবর্তিত হয় খ. বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলই ভর

গ. বস্তুর মধ্যে পদার্থের মোট পরিমাণই ভর ঘ. ভরের একক নিউটন

নিচের চিত্র হতে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

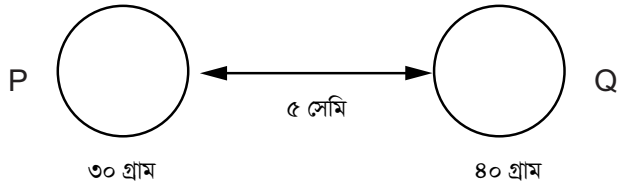

৩. P ও Q এর মধ্যকার আকর্ষণ বল নির্ভর করে-

i. বস্তু দুটির ভরের উপর

ii. মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর

iii. মাধ্যমের প্রকৃতির উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফল ৩৬০০ গ্রাম হলে বলের কী পরিবর্তন হবে?

ক. অর্ধেক হবে খ. দ্বিগুণ হবে

গ. তিনগুণ হবে ঘ. চারগুণ হবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নুহা তাদের বাসায় পাঁচতলার ছাদে উঠে ৫০ গ্রাম ভরের একটি পাথর এবং এক টুকরা কাগজ একই সাথে নিচে ফেলে দিল। মাটিতে দাঁড়ানো নুহার ছোট ভাই লক্ষ করল, পাথরটি কাগজের আগেই মাটিতে পৌঁছায়।

ক. অভিকর্ষ কী?

খ. অভিকর্ষজ ত্বরণ বলতে কী বুঝায়?

গ. পাথরটির ওজন নির্ণয় কর।

ঘ. পাথরটি আগেই মাটিতে পড়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. একটি e¯‘i ভর ১২০ কেজি। একটি রকেটে করে একে চাঁদে নিয়ে যাওয়া হলো। এতে দেখা গেল e¯‘wUi ভরের কোনো পরিবর্তন না ঘটলেও ওজনের পরিবর্তন ঘটল।

ক. ভর কাকে বলে?

খ. ভর ও ওজনের মধ্যে পার্থক্য কী।

গ. চাঁদে e¯ZwUi ওজন কত হবে নির্ণয় কর।

ঘ. চাঁদে e¯ZwUi ওজনের কী পরিবর্তন ঘটল ব্যাখ্যা কর।

অষ্টম অধ্যায়

রাসায়নিক বিক্রিয়া

আমাদের চারপাশে নানা রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে hw‡"Q| এই mg¯Í রাসায়নিক বিক্রিয়া কখনও শক্তি উৎপন্ন করে, কখনও ব্যবহার উপযোগী নতুন পদার্থ তৈরি করে আবার কখনওবা রোগ নিরাময়েও সাহায্য করে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের শক্তির রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শুষ্ক কোষের শক্তির রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তড়িৎ বিশেষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে রাসায়নিক বিক্রিয়ার অবদান উপলব্ধি করতে পারব।
- পরীক্ষণ কাজে রাসায়নিক পদার্থ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারব।

পাঠ ১ : রাসায়নিক বিক্রিয়া ; সংযোজন (Addition)

কাজ : সংযোজন বিক্রিয়া বুঝা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : টেস্টটিউব, মর্টার, w¯úwiU j¨v¤ú বা বার্নার, লোহার গুঁড়া, সালফার, নিক্তি।

পদ্ধতি : টেস্টটিউবটি ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নাও। ৭ গ্রাম লোহার গুঁড়া ও ৪ গ্রাম সালফার (সমানুপাতিক হারে ভিন্ন পরিমাণও নেওয়া যায়) নিক্তি দিয়ে মেপে মর্টারে নাও ও খুব ভালোভাবে পিষে নাও এবং তারপর শুকনা টেস্টটিউবে ঢেলে দাও। এবার w¯úwiU j¨v¤ú বা বার্নার দিয়ে টেস্টটিউবের তলায় তাপ দিতে থাক। তাপ দেওয়ার সময় খেয়াল রাখ যেন আগুনের শিখা ছোট হয়। তাপ দিতে দিতে টেস্টটিউবের মিশ্রণটি যখন রক্তিমাভার মতো হবে তখন তাপ দেওয়া বন্ধ কর। টেস্টটিউবটি মর্টারের উপরে ধরে রাখ যেন এটি ভেঙ্গে গেলেও টেস্টটিউবের ভিতরের ব¯‘ নষ্ট না হয়ে যায়। অতঃপর টেস্টটিউবটি ঠান্ডা কর ও ভেঙ্গে ভিতরের ব¯‘টিকে আলাদা কর।

টেস্টটিউব থেকে যে ব¯‘টি পেলে তা দেখতে গাঢ় ami বর্ণের। তোমরা এতে হালকা হলুদ রঙের সালফার বা লোহার গুঁড়া কোনোটিই দেখতে c‡”Q না, কারণ এখানে লোহা ও সালফার একে অপরের সাথে মিলে m¤úY ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থ আয়রন সালফাইড তৈরি করেছে।

$$\underset{\text{আয়রন}}{Fe} + \underset{\text{সালফার}}{S} \longrightarrow \underset{\text{আয়রন সালফাইড}}{FeS}$$

এই ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন যেখানে একের অধিক পদার্থ একত্রিত হয়ে m¤úY ভিন্নধর্মী নতুন একটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে। একইভাবে জিংক (Zn) ও (S) সালফারের বিক্রিয়ায় জিংক সালফাইড (ZnS) তৈরির বিক্রিয়াও সংযোজন বিক্রিয়া।

$$\underset{\text{জিংক}}{Zn} + \underset{\text{সালফার}}{S} \longrightarrow \underset{\text{জিংক সালফাইড}}{ZnS}$$

এখানে উল্লিখিত দুটি বিক্রিয়াকেই মৌল থেকে যৌগ তৈরির সংযোজন বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। তবে দুটি যৌগ যুক্ত হয়েও কিন্তু সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন আরেকটি যৌগ তৈরি হতে পারে। যেমন- ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের (CO_2) মধ্যে সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO_3$) তৈরি হয়।

$$\underset{\text{ক্যালসিয়াম অক্সাইড}}{CaO} + \underset{\text{কার্বন ডাইঅক্সাইড}}{CO_2} \longrightarrow \underset{\text{ক্যালসিয়াম কার্বোনেট}}{CaCO_3}$$

পাঠ ২ ও ৩ : দহন বিক্রিয়া (Combustion reaction)

কাজ : সালফার ও অক্সিজেনের দহন বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি লম্বা হাতলযুক্ত দহন চামচ, কিছু সালফার, w¯úwiU j¨v¤ú বা বার্নার।

পদ্ধতি : তোমরা দহন চামচে কিছুটা সালফার নাও। w¯úwiU j¨v¤ú বা বার্নার দিয়ে চামচটিতে তাপ দিতে থাক। তোমরা কী দেখতে c‡”Q?

প্রথমে সালফার গলে গেল তারপর তোমরা নীল আগুনের শিখা দেখতে cv"Q এবং একটি ঝাঁঝালো গন্ধ পেয়েছ তোমরা। কারণ হলো তাপ দেওয়ার ফলে সালফার বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) গ্যাস তৈরি করেছে যার জন্য তোমরা ঝাঁঝালো গন্ধ পেয়েছ।

$$S + O_2 \xrightarrow{\text{তাপ}} SO_2$$

সালফার অক্সিজেন সালফার ডাইঅক্সাইড

কাজ : ম্যাগনেশিয়াম ও অক্সিজেনের দহন বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ম্যাগনেশিয়াম রিবন, চিমটা আংটা, (লাইটার) w¯úwiU j¨vwqú/ বুনসেন বার্নার।

পদ্ধতি : ম্যাগনেশিয়াম রিবনের একটি ছোট টুকরার (৮ সেন্টিমিটার) একমাথা চিমটা দিয়ে ধর। চোখে নিরাপত্তা চশমা পরে নাও। রিবনের অন্য মাথাটি বুনসেন বার্নারের শিখার উপর ধর। লাইটার দিয়েও এটি করা যায়। খুব ভালোভাবে লক্ষ কর কী ঘটছে?

রিবনে আগুন ধরে গেল এবং অত্যন্ত প্রজ্বলিত শিখাসহ জ্বলতে লাগল। এর কারণ হলো ম্যাগনেসিয়াম বাতাসের অক্সিজেনে দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে পুড়তে থাকে আর আমরা প্রজ্বলিত শিখা দেখতে পাই। এভাবে যখন mg¯Í ম্যাগনেসিয়াম পুড়ে শেষ হয়ে যায়, তখন আপনাআপনি শিখা নিভে যায়। শেষে তোমরা ছাই এর মতো কিছু দেখতে cv"Q কি? এটি আসলে ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেন পুড়ে তৈরি হওয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড।

$$Mg + O_2 \longrightarrow MgO$$

ম্যাগনেসিয়াম অক্সিজেন ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড

কাজ : মোমের দহন প্রক্রিয়া mqú‡K জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : মোমবাতি, দিয়াশলাই।

পদ্ধতি : দিয়াশলাই দিয়ে মোমবাতি জ্বালাও। খুব ভালোভাবে খেয়াল কর কী ঘটছে? সময়ের সাথে সাথে মোমবাতির আকার ছোট হয়ে hv‡"Q| বল তো এর কারণ কী? মোমবাতি জ্বালানোর ফলে উৎপন্ন তাপে মোম গলে hv‡"Q| এই গলিত মোমের ছোট একটি অংশ ঠান্ডা হয়ে মোমের গা বেয়ে নিচে পড়ছে কিন্তু বেশিরভাগ অংশই সলতের মধ্য দিয়ে উপরে উঠে উৎপন্ন তাপে ev®úxfZ n‡"Q। এই ev®úxfZ মোম দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করছে। এর ফলে তাপ ও আলোকশক্তি উৎপন্ন n‡"Q|

পাঠ ৪-৭ : প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Substitution or displacement reaction)

কাজ : লোহা ও তুঁতের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : লোহার গুঁড়া, তুঁতে, পানি ও টেস্টটিউব

পদ্ধতি : টেস্টটিউবের চার ভাগের এক ভাগ পানি নাও। কিছু তুঁতে যোগ করে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে তুঁতের দ্রবণ তৈরি কর। এবার তুঁতের নীল দ্রবণে কিছু লোহার গুঁড়া যোগ করে ভালোভাবে ঝাঁকাও। কোনো পরিবর্তন দেখতে cv"Q কি? দ্রবণের নীল রং Av‡¯Í Av‡¯Í হালকা সবুজ হয়ে hv‡"Q আর তামার ছোট ছোট কণা টেস্টটিউবের তলায় জমতে শুরু করেছে। নীল দ্রবণ কেন হালকা সবুজ হলো?

এখানে লোহার গুঁড়া ও তুঁতের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে। ফলে আয়রন সালফেট ($FeSO_4$) ও কপার তৈরি হয়েছে। উৎপন্ন আয়রন সালফেটের রং হালকা সবুজ বলেই দ্রবণের রং নীল থেকে হালকা সবুজ হলো।

Fe	+	$CuSO_4$	⟶	$FeSO_4$	+	Cu
লোহা		তুঁতে		আয়রন সালফেট		তামা

এখানে লোহা, তুঁতে বা কপার সালফেট থেকে কপারকে সরিয়ে নিজে ঐ স্থান দখল করে আয়রন সালফেট তৈরি করেছে।

এই সকল বিক্রিয়া যেখানে একটি মৌল কোনো যৌগ থেকে অপর একটি মৌলকে সরিয়ে নিজে ঐ স্থান দখল করে নতুন যৌগ তৈরি করে তাকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলে।

তোমরা এখন তুঁতের দ্রবণে জিংক বা `¯Ív (Zn), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ইত্যাদি যোগ করে দেখ কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে।

বিয়োজন বিক্রিয়া (Decomposition reaction):

কাজ : চুনা পাথরের বিয়োজন বিক্রিয়া দেখা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : চুনা পাথর ($CaCO_3$), †¯úPjv বা চামচ, ২টি টেস্টটিউব, চুনের পানি, নির্গমন নল, বুনসেন বার্নার বা w¯úwiU j¨v¤ú| Kv¤ú, ষ্ট্যান্ড, কর্ক ও হাতমোজা।

পদ্ধতি : হাতমোজা পরে †¯úPjv দিয়ে ৫ গ্রাম চুনাপাথর টেস্টটিউবে নাও। অপর টেস্টটিউবে ১-২ মিলিলিটার চুনের পানি নিয়ে চিত্রের মতো করে লাগাও। এবার w¯úwiU j¨v¤ú বা বুনসেন বার্নার দিয়ে তাপ দিতে থাক। খুব ভালোভাবে খেয়াল কর কী ঘটছে। যে টেস্টটিউবে চুনের পানি নিয়েছ সেখানে কোনো পরিবর্তন দেখতে cv"Q কি?

হ্যাঁ, চুনের পানি ঘোলা হয়ে hv‡"Q| এর কারণ হলো প্রথম টেস্টটিউবে নেওয়া চুনাপাথর তাপ দেওয়ার ফলে বিয়োজিত হয়ে বা ভেঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও ক্যালসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করেছে। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড ২য় টেস্টটিউবে (নির্গমন নলের মাধ্যমে) যাওয়ার ফলে সেখানে চুনের পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়া করে আবার ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি হওয়ায় চুনের পানি ঘোলা হয়ে hv‡"Q|

চিত্র ৮.১ : বিয়োজন

$CaCO_3$	$\xrightarrow{\text{তাপ}}$	CaO	+	CO_2		
চুনা পাথর		ক্যালসিয়াম অক্সাইড		কার্বন ডাইঅক্সাইড		

CO_2	+	$Ca(OH)_2$	⟶	$CaCO_3$	+	H_2O
কার্বন ডাইঅক্সাইড		চুনের পানি		ক্যালসিয়াম কার্বনেট		পানি

তাহলে দেখা hv‡"Q যে, এখানে তাপ প্রয়োগের ফলে চুনাপাথর ভেঙ্গে গিয়ে দুটি নতুন যৌগ উৎপন্ন করেছে। এই বিক্রিয়ার মতো যে সকল বিক্রিয়ায় একটি যৌগ ভেঙ্গে একাধিক যৌগ উৎপন্ন হয় তাদেরকে বিয়োজন বিক্রিয়া বলে।

চুনাপাথরের ন্যায় কপার কার্বনেটকে ($CuCO_3$) তাপ দিলে তা ভেঙ্গে কপার অক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$CuCO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} CuO + CO_2$$

এবার তোমরা বলতে পারবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) ও পটাশিয়াম ক্লোরেটের ($KClO_3$) বিয়োজন বিক্রিয়ার ফলে কী কী উৎপন্ন হবে ?

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে তাপ দিলে তা ভেঙ্গে অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাস ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$NH_4Cl \xrightarrow{\text{তাপ}} NH_3 + HCl$$

পক্ষান্তরে পটাশিয়াম ক্লোরেটকে তাপ দিলে এটি বিয়োজিত হয়ে পটাশিয়াম ক্লোরাইড (KCl) ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$2KClO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} 2KCl + 3O_2$$

এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন অক্সিজেন বিভিন্ন কাজে (যেমন- ডুবুরিরা) ব্যবহার করা হয়।

পাঠ ৮-১১ : রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তির রূপান্তর

নিজেরা কর : তোমরা মোম জ্বালালে কি ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তা জেনেছ। এবার বল তো এখানে কোনো ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটছে কি? জ্বলন্ত মোমের কাছাকাছি হাত নিলে হাতে গরম লাগে। আবার অন্ধকারে মোম জ্বালালে আমরা এর আশেপাশে দেখতে পাই। তাহলে একথা বলা যায় যে, মোম জ্বালানোর ফলে তাপশক্তি উৎপন্ন হয় বলেই হাতে গরম লাগে আর আলোক শক্তি উৎপন্ন হয় বলেই অন্ধকারে মোম জ্বালালে আমরা এর আশেপাশের জিনিস দেখতে পাই। মোম একটি রাসায়নিক e¯‘ | একে পোড়ালে এতে mlÂZ রাসায়নিক শক্তি পরিবর্তিত হয়ে তাপশক্তি ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। একইভাবে গ্যাসের চুলায় গ্যাস জ্বালালেও গ্যাসে mlÂZ রাসায়নিক শক্তি পরিবর্তিত হয়ে প্রচুর তাপশক্তি ও আলোক শক্তি উৎপন্ন করে। উৎপন্ন তাপশক্তি দিয়েই আমরা রান্নাবান্নার কাজ করি।

তাহলে আমরা দেখলাম যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর ঘটে।

কাজ : খাবার সোডা ও লেবুর রসের বিক্রিয়া।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : খাবার সোডা ($NaHCO_3$) বা বেকিং সোডা, টেস্টটিউব, লেবুর রস, ড্রপার।

পদ্ধতি : টেস্টটিউবে কিছু খাবার সোডা নাও। ড্রপার দিয়ে Av‡¯Í Av‡¯Í লেবুর রস টেস্টটিউবে যোগ কর। কী দেখতে cv”Q? গ্যাসের বুদবুদ উঠছে? হ্যাঁ, প্রচুর গ্যাসের বুদবুদ উঠেছে। টেস্টটিউবের তলায় ¯úk করে দেখ হাতে গরম লাগে কি?

লেবুর রসে থাকে প্রচুর সাইট্রিক এসিড যা বেকিং সোডার সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সাইট্রেট, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও পানি তৈরি করে। আমরা যে বুদবুদ দেখি তা CO_2 ছাড়া আর কিছুই নয়।

$$NaHCO_3 + C_6H_8O_7 \longrightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3CO_2 + 3H_2O$$

বেকিং সোডা সাইট্রিক এসিড সোডিয়াম সাইট্রেট কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি

টেস্টটিউবে স্পর্শ করে গরম লাগার কারণ কী ? কারণ হলো এই বিক্রিয়ায় তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। তা না হলে গরম লাগত না।

এখন তোমরা বেকিং সোডার সাথে লেবুর রসের বদলে ভিনেগার বা এসিটিক এসিড যোগ করে দেখ কী ঘটে?

কাজ : চুন ও ভিনেগারের রাসায়নিক বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

উপকরণ : চুন (CaO), ভিনেগার, বিকার, হাতমোজা, ড্রপার।

পদ্ধতি : হাতমোজা পরে কিছু চুন বিকারে নাও। এবার এতে ড্রপার দিয়ে A\‡¯Í A\‡¯Í ভিনেগার যোগ কর। বিকারটি হাত দিয়ে ¯úk করে দেখ। গরম লাগছে? কারণ কী? এখানে চুনের সাথে ভিনেগারের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম এসিটেট ও পানি তৈরি n‡"Q আর প্রচুর তাপশক্তিও উৎপন্ন n‡"Q| উৎপন্ন তাপের কারণেই বিকারে ¯úk করলে গরম লাগছে।

$$CaO + 2CH_3COOH \longrightarrow Ca(CH_3COO)_2 + H_2O$$

চুন এসিটিক এসিড ক্যালসিয়াম এসিটেট পানি

এখানে চুন হলো ক্ষারীয় পদার্থ ও এসিটিকএসিড হলো অম্লধর্মী পদার্থ আর উৎপাদিত ক্যালসিয়াম এসিটেট হলো নিরপেক্ষ পদার্থ। এই জাতীয় বিক্রিয়া যেখানে বিপরীতধর্মী পদার্থ একে অপরের সাথে বিক্রিয়া করে নিরপেক্ষ পদার্থ তৈরি করে তাকে প্রশমন বিক্রিয়া (Neutralization reaction) বলে।

এখন তোমরা চুনে ভিনেগারের বদলে লেবুর রস দিয়ে দেখ কী ধরনের বিক্রিয়া ঘটে?

কাজ : চুনের পানির সাথে ভিনেগারের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : চুন, পানি, ভিনেগার, বিকার, হাতমোজা, †¯úPjv, ড্রপার।

পদ্ধতি : ৫ গ্রাম পরিমাণ (ভিন্ন পরিমাণও নেওয়া যেতে পারে) চুন বিকারে নাও। ড্রপার দিয়ে ৪০ গ্রাম পানি A\‡¯Í A\‡¯Í যোগ কর। হাতমোজা পরে বিকার ¯úk কর। পানি যোগ করার পর কোনো পরিবর্তন দেখতে c\"Q?

বিকার অনেক বেশি গরম হয়ে h\‡"Q আর বিকারের মিশ্রণটি অনেকটা পানি ফুটানোর সময় যে রকম টগবগ করে অনেকটা সেরকম করছে। এখানে চুনে পানি যোগ করার ফলে, চুন ও পানির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$

চুন পানি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড

উৎপন্ন $Ca(OH)_2$ কুইক লাইম নামেই বেশি পরিচিত। এই বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি উৎপন্ন হয় যার ফলে পানি ফুটতে থাকে। কুইক লাইম বা $Ca(OH)_2$ পানিতে খুব অল্প পরিমাণে `exfZ হয়। আর পানিতে $Ca(OH)_2$ এর m¤úক্ত দ্রবণকেই চুনের পানি বা লাইম ওয়াটার বলা হয়।

উপরের পরীক্ষাতে তোমরা যে সাসপেসনটি পেলে তা কিছুক্ষণ রেখে দাও। উপরে পরিষ্কার পানির মতো যে অংশটি দেখা h\‡"Q সেটিই কিন্তু চুনের পানি। চুনের পানিকে ফিল্টার দিয়ে আলাদা করে নাও। এবার ড্রপার দিয়ে A\‡¯Í A\‡¯Í ভিনেগার যোগ কর। দেখ তো বিকার গরম n‡"Q কি না? এখানে কী ধরনের বিক্রিয়া n‡"Q?

পাঠ ১২-১৪ : শুষ্ক কোষ

আমরা টর্চ লাইট, বিভিন্ন রকম রিমোট কন্ট্রোলার, নানা রকম খেলনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি এগুলোকে ড্রাইসেল বা শুষ্ক কোষ বলে।

তোমরা কি জান এই শুষ্ক কোষ কীভাবে তৈরি করা হয় ?

প্রথমে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl), কয়লার গুঁড়া এবং ম্যাংগানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2) ভালোভাবে মিশিয়ে তাতে অল্প পরিমাণ পানি যোগ করে একটি পেস্ট বা লেই তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণটি সিলিন্ডার আকৃতির `¯Ívi চোঙে নিয়ে তার মধ্যে একটি কার্বন দন্ড বসানো হয় এমনভাবে যাতে দন্ডটি `¯Ívi চোঙকে ¯úk না করে। কার্বন দন্ডের মাথায় একটি ধাতব টুপি পরানো থাকে। শুষ্ক কোষের উপরের অংশ কার্বন দন্ডটির চারপাশ পিচের Av¯Íi Y দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। `¯Ívi চোঙটিকে একটি শক্ত কাগজ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এখানে `¯Ívi চোঙ ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বা অ্যানোড হিসেবে কাজ করে আর ধাতব টুপি দিয়ে ঢাকা কার্বন দন্ডের উপরিভাগ ধনাত্মক তড়িৎদ্বার বা ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে। এখন আমরা দেখে নিই কীভাবে শুষ্ক কোষ কাজ করে।

চিত্র ৮.২ : শুষ্ক কোষ

কাজ : শুষ্ক কোষ দিয়ে তড়িৎ বর্তনী তৈরি করে শক্তির রূপান্তর দেখা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বৈদ্যুতিক বাল্ব, ১টি শুষ্ক কোষ, তামার তার ২টি।

পদ্ধতি : ১টি তামার তারের এক প্রান্ত শুষ্ক কোষের অ্যানোড ও অপর তামার তারটি ক্যাথোডের সাথে যুক্ত কর। এবার চিত্রের মতো করে বৈদ্যুতিক বাল্বের সাথে তার দুটি সংযোগ দাও। বাল্বটি জ্বলে উঠল। কারণ হলো এখানে তামার তারের মাধ্যমে বাল্ব ও ব্যাটারির মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট তৈরি হয়ে গেল।

এখানে কী ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটল? বর্তনী তৈরি হওয়ার ফলে বাল্ব জ্বলছে এবং তা আলোক শক্তি w`‡"Q| এই আলোক শক্তি আসছে ব্যাটারি থেকে। আর ব্যাটারির শক্তির উৎস হলো এখানে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ অর্থাৎ `¯Ív, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, কয়লার গুঁড়া ও MnO_2। তাহলে বলা যায় যে, ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থের mwÂZ শক্তিই রূপান্তরিত হয়ে আলোক শক্তি উৎপন্ন করছে। অর্থাৎ এখানে রাসায়নিক শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত n‡"Q|

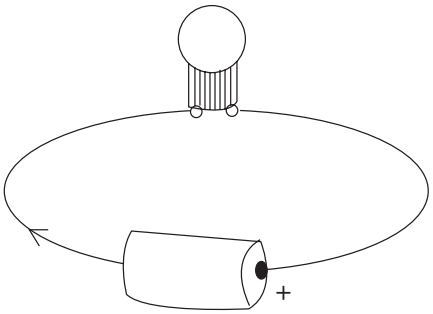

চিত্র ৮.৩ : শুষ্ক কোষের বর্তনী

তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis)

কাজ : তড়িৎ বিশেষণ m¤ú‡K জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি ব্যাটারি, তামার তার (দুটি), দুটি কার্বন দণ্ড, পানি, লবণ, একটি বিকার।

পদ্ধতি : বিকারে ৩০০ মিলিলিটার পরিমাণ পানি নিয়ে ৩০ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) বা লবণ যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দাও। এবার কার্বন দণ্ড দুটি চিত্র অনুযায়ী তামার তার দিয়ে ব্যাটারির সাথে সংযুক্ত কর। কার্বন দণ্ডের দিকে ভালো করে লক্ষ কর। ১টি কার্বন দন্ডের গায়ে গ্যাসের বুদবুদ দেখতে cv"Q কি ? অন্যটির কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কি?

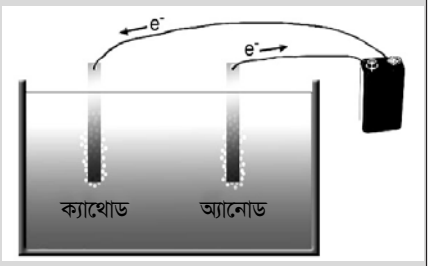

হ্যাঁ, যে কার্বন দণ্ডটি ব্যাটারির ধনাত্মক মেরুর সাথে সংযুক্ত, সেটিতে গ্যাসের বুদবুদ জমে hv‡"Q আর যে দণ্ডটি ব্যাটারির ঋণাত্মক মেরুর সাথে সংযুক্ত আছে সেটিতে ধূসর একটি প্রলেপের মতো দেখা hv‡"Q| কেন এমনটি n‡"Q? এর কারণ হলো ব্যাটারির সাথে সংযোগ দিয়ে `ªexfZ লবণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) অ্যানোডে গিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2) উৎপন্ন করে। তাই আমরা অ্যানোডে গ্যাসের বুদবুদ দেখতে পাই। অন্যদিকে সোডিয়াম আয়ন (Na^+) বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে ক্যাথোডে গিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ধাতব সোডিয়াম (Na) উৎপন্ন করে যার ফলে ক্যাথোডে ধূসর প্রলেপ দেখা hv‡"Q|

Na^+	+	e^-	$\longrightarrow$	Na
সোডিয়াম আয়ন		ইলেকট্রন		ধাতব সোডিয়াম
Cl^-	+	e^-	$\longrightarrow$	Cl
ক্লোরাইড আয়ন		ইলেকট্রন		ক্লোরিন পরমাণু
Cl	+	Cl	$\longrightarrow$	Cl_2
ক্লোরিন পরমাণু		ক্লোরিন পরমাণু		ক্লোরিন গ্যাস

তড়িৎ প্রবাহের ফলে লবণের এই রাসায়নিক পরিবর্তন যা ক্লোরিন গ্যাস ও ধাতব সোডিয়াম উৎপন্ন করেছে, তাকে তড়িৎ বিশেষণ বলে।

লবণের মতো যে সকল পদার্থ তড়িৎ প্রবাহের ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে অন্য পদার্থে পরিণত হয় তাদেরকে তড়িৎ বিশেষ্য (Electrolyte) বলে।

সব পদার্থ তড়িৎ প্রবাহের ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না। যে mg¯Í পদার্থ `ªexfZ বা বিগলিত Ae¯'vq তড়িৎ পরিবহন করে না ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়াও করে না, তাদেরকে তড়িৎ অবিশেষ্য পদার্থ বলে। যেমন- চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম–

- সংযোজন বিক্রিয়ায় একের অধিক পদার্থ একত্রিত হয়ে একটি নতুন পদার্থ তৈরি করে।
- দহন বিক্রিয়ায় একটি পদার্থ বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে পুড়ে প্রচুর তাপশক্তি ও আলোক শক্তি উৎপন্ন করে।
- প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় একটি মৌল কোনো যৌগ থেকে অপর একটি মৌলকে প্রতিস্থাপিত করে নতুন পদার্থ তৈরি করে।
- যে বিক্রিয়ায় একটি যৌগ ভেঙে একের অধিক নতুন পদার্থে পরিণত হয় তাকে বিয়োজন বিক্রিয়া বলে।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর ঘটে।
- প্রশমন বিক্রিয়ায় বিপরীত ধর্মী পদার্থ বিক্রিয়া করে একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করে নিরপেক্ষ পদার্থ উৎপন্ন করে। দহন বিক্রিয়ায় সাধারণত রাসায়নিক শক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- শুষ্ক কোষ ব্যবহার করলে রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত হয়ে আলোক শক্তি বা অন্য কোনো শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- যে mg¯Í c`v_ `exfZ বা গলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে তাদেরকে তড়িৎ বিশেষ্য পদার্থ বলে।
- যে mg¯Í c`v_ `exfZ বা গলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে না তাদেরকে তড়িৎ অবিশেষ্য পদার্থ বলে।

অনুশীলনী

শণ্যস্থান পরণ কর

ক) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ——— সৃষ্টি হয়।

খ) ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরির বিক্রিয়া একটি ——— বিক্রিয়া।

গ) দহন বিক্রিয়ায় ——— শক্তি উৎপন্ন হয়।

ঘ) শুষ্ক কোষে `¯Ívi চোঙ ——— হিসেবে কাজ করে।

ঙ) হাইড্রোক্লোরিক এসিড তড়িৎ ——— পদার্থ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক) চুনে পানি যোগ করলে কী ঘটে ব্যাখ্যা কর।

খ) দহন বিক্রিয়া বলতে কী বুঝ? উদাহরণ দাও।

গ) শুষ্ক কোষের গঠন সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা কর।

ঘ) প্রশমন বিক্রিয়া কী তা ব্যাখ্যা কর।

ঙ) তড়িৎ বিশেষ্য ও তড়িৎ অবিশেষ্য পদার্থের gj পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি কুইক লাইম?

ক. CaO খ. $CaCO_3$

গ. $CaCl_2$ ঘ. $Ca(OH)_2$

২. একজন ডুবুরি নিচের কোন বিক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন পায়?

ক. $CaCO_3$ খ. $CuCO_3$

গ. KClO3 ঘ. NH4Cl

নিচের অনুচ্ছেদটির আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

স্বপ্না ল্যাবরেটরিতে একটি বিকারে কিছু চুন নিল। অতঃপর এর মধ্যে ড্রপার দিয়ে ভিনেগার যোগ করল। কিছুক্ষণ পর সে বিকারটি হাত দিয়ে ¯úk করে তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ করল।

৩. বিকারে উল্লেখিত যৌগের মধ্যে কোন ধরনের বিক্রিয়া ঘটবে?

ক. দহন $\xrightarrow{\text{তাপ}}$ খ. প্রশমন $\xrightarrow{\text{তাপ}}$

গ. সংযোজন $\xrightarrow{\text{তাপ}}$ ঘ. প্রতিস্থাপন $\xrightarrow{\text{তাপ}}$

৪. উদ্দীপকের উল্লেখিত যোগের মধ্যে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হবে-

i. ক্যালসিয়াম এসিটেট

ii. ক্যালসিয়াম কার্বনেট

iii. পানি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফাহাদ ও ফারহান কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটালো, বিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ :

i. কার্বন + অক্সিজেন $\xrightarrow{\text{তাপ}}$

ii. চুনাপাথর $\xrightarrow{\text{তাপ}}$

iii. হাইড্রোজেন + অক্সিজেন $\longrightarrow$

iv. জিঙ্ক + সালফিউরিক এসিড $\longrightarrow$

ক. খাবার সোডার সংকেত কী?

খ. ii নং বিক্রিয়াটি কী ধরনের বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের যে বিক্রিয়ায় মৌলিক গ্যাস উৎপন্ন হয় সেটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. i ও iii নং বিক্রিয়া দুটি সংযোজন হলেও এদের মধ্যে ভিন্নতা আছে বিশ্লেষণ কর।

২. রিতা তার পুতুলে ব্যাটারির সংযোগ দিয়ে পুতুল নাচ দেখছিল। এমন সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় ওর ছোট বোন ঐশ্বরী একটি মোম জ্বালিয়ে আনল।

ক. প্রশমন বিক্রিয়া কী?

খ. লাইম ওয়াটার বলতে কী বুঝায়?

গ. রিতার পুতুলে ব্যবহৃত ব্যাটারির গঠন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পুতুল ও মোমবাতিতে শক্তির কী ধরনের রূপান্তর ঘটে? বিশ্লেষণ কর।

৪. **প্রজেক্ট :** তোমরা নিজেরা ৪-৫ জনের গ্রুপ তৈরি করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অন্তত ৫টি রাসায়নিক বিক্রিয়া খুঁজে বের কর। এ সকল বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর ঘটে কিনা চিন্তা কর। শক্তির রূপান্তর ঘটলে তা কি ধরনের রূপান্তর বুঝার চেষ্টা কর।

নবম অধ্যায়

বর্তনী ও চলবিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ প্রবাহ হলো gjZ ইলেকট্রনের প্রবাহ। এ প্রবাহ আবার দু'রকম- এসি এবং ডিসি প্রবাহ। কোনো বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের জন্য দরকার এর দু'প্রান্তের বিভব পার্থক্য। এই বর্তনীতে তড়িৎযন্ত্র ও DcKiYmgn‡K শ্রেণি ও সমান্তরাল সংযোগ যুক্ত করা যায়। এছাড়া বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ মাপার জন্য অ্যামিটার বা যেকোনো দু'প্রান্তের বিভব পার্থক্য মাপার জন্য দরকার ভোল্টমিটার।

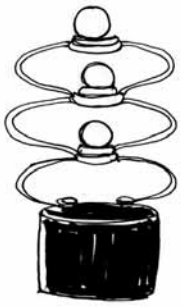
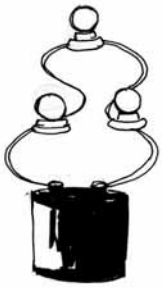

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- এসি এবং ডিসি প্রবাহের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তড়িৎ বর্তনীতে রোধ, ফিউজ এবং চাবির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভব পার্থক্যের মধ্যেকার m¤úK লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শ্রেণি ও সমান্তরাল বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভব পার্থক্যের ভিন্নতা প্রদর্শন করত পারব।
- তড়িতের কার্যকর ব্যবহার এবং অপচয় রোধে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করব।
- তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভব পার্থক্য পরিমাপে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সঠিক ব্যবহারে সক্ষম হব।

পাঠ ১ : তড়িৎ প্রবাহ

দুটি ভিন্ন বিভবের পরিবাহককে যখন ধাতব তার দ্বারা যুক্ত করা হয় তখন তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। আধুনিক ইলেকট্রন তত্ত্ব থেকে আমরা জানি প্রত্যেক ধাতব পদার্থে কিছু মুক্ত ইলেকট্রন থাকে, যারা ঐ পদার্থের মধ্যে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। যখন দুটি ভিন্ন বিভবের পরিবাহককে সংযুক্ত করা হয়, তখন নিম্ন বিভবm¤úb পরিবাহক থেকে ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন D"P বিভবm¤úb পরিবাহকের দিকে প্রবাহিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবাহকদ্বয়ের মধ্যে বিভব পার্থক্য বর্তমান থাকে ঋণাত্মক আধানের এই প্রবাহ ততক্ষণ পর্যন্ত চলে। কোনোভাবে যদি পরিবাহকদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য বজায় রাখা যায় তখন এই প্রবাহ wbie"Qbভাবে চলতে থাকে। ঋণাত্মক আধান বা ইলেকট্রনের এই প্রবাহের জন্যই তড়িৎ প্রবাহিত হয়। gjZ কোনো পরিবাহকের যেকোনো c¯Í‡"Q‡`i মধ্য দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাই হলো তড়িৎ প্রবাহ।

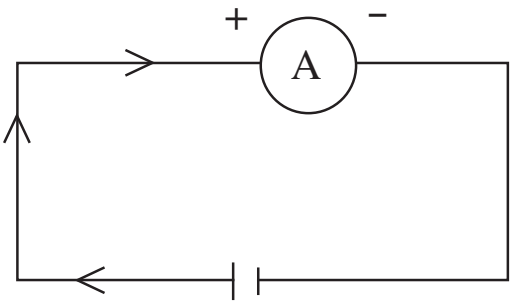

চিত্র ৯.১ : বিদ্যুৎ বর্তনী

তড়িৎ প্রবাহের একক : তড়িৎ প্রবাহের একক হলো A¨wm¤úqvi | একে সাধারণত A দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

তড়িৎ বিভব পার্থক্য

প্রতি একক আধানকে তড়িৎক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তর করতে m¤úb কাজের পরিমাণ হলো ঐ বিন্দুর তড়িৎ বিভব পার্থক্য। দুটি বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য না থাকলে তড়িৎ প্রবাহিত হবে না। ফলে কোনো আধান প্রবাহিত হবে না এবং কোনো কাজও m¤úb হবে না।

পাঠ ২ ও ৩ : তড়িৎ প্রবাহের প্রকারভেদ

তড়িৎ প্রবাহ দুই প্রকার– (ক) অপর্যাবৃত্ত প্রবাহ বা সমপ্রবাহ বা একমুখী প্রবাহ (খ) পর্যাবৃত্ত প্রবাহ বা পরিবর্তী প্রবাহ।

(ক) অপর্যাবৃত্ত প্রবাহ বা একমুখী প্রবাহ

যখন সময়ের সাথে সাধারণত তড়িৎ প্রবাহের দিকের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, অর্থাৎ যে তড়িৎ প্রবাহ সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহকে অপর্যাবৃত্ত প্রবাহ বলে।
তড়িৎ কোষ বা ব্যাটারি থেকে অপর্যাবৃত্ত প্রবাহ পাওয়া যায় (চিত্র ৯.২)। আবার ডিসি জেনারেটরের সাহায্যেও এই প্রকার তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করা যায়। আগেকার দিনে এর ব্যবহার থাকলেও বর্তমানে এর ব্যবহার নেই বললেই চলে।

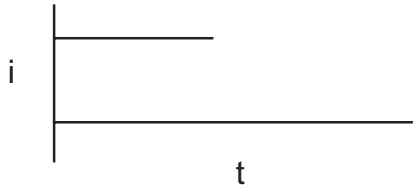

চিত্র ৯.২ : অপর্যাবৃত্ত প্রবাহ

(খ) পর্যাবৃত্ত প্রবাহ

যখন নির্দিষ্ট সময় পরপর তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়, সেই তড়িৎ প্রবাহকে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ বলে। বর্তমান বিশ্বের সকল দেশের তড়িৎ প্রবাহই পর্যাবৃত্ত প্রবাহ। এর কারণ Zjbvgjkfv‡e এটি উৎপন্ন ও সরবরাহ করা সহজ এবং সাশ্রয়ী। পর্যাবৃত্ত প্রবাহের উৎস জেনারেটর বা ডায়নামো।

দেশের বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জেনারেটরের সাহায্যে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ উৎপন্ন করা হয়। পর্যাবৃত্ত প্রবাহের দিক পরিবর্তন দেশভেদে বিভিন্ন হয়। যেমন- বাংলাদেশে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে cÂvkevi এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি সেকেন্ডে ষাটবার দিক পরিবর্তন করে।

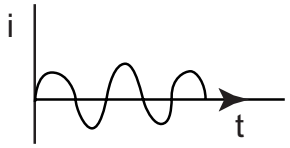

চিত্র ৯.৩ : পর্যাবৃত্ত প্রবাহ

পাঠ ৪ ও ৫ : রোধ

বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি হয় ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্য। কোনো পরিবাহির দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য থাকলে এই প্রবাহ শুরু হয়। এক্ষেত্রে ইলেকট্রন নিম্ন বিভব থেকে D"P বিভবের দিকে প্রবাহিত হয়। এই ইলেকট্রন স্রোত পরিবাহীর মধ্য দিয়ে চলার সময় পরিবাহির অভ্যন্তরস্থ অণু-পরমাণুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে এর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহও বিঘ্নিত হয়। পরিবাহির এই বাধাদানের ধর্ম হলো রোধ। gjZ পরিবাহির যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় তাই হলো রোধ।

ওহমের m~Î

কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবে কিনা তা নির্ভর করছে ঐ পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের উপর। এছাড়াও পরিবাহকের আকৃতি ও উপাদান এমনকি পরিবাহকটির তাপমাত্রার উপরও এর তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা নির্ভর করে। তাপমাত্রা যদি স্থির রাখা যায় তবে নির্দিষ্ট পরিবাহকের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ শুধুমাত্র এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহির দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ও এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের অনুপাত থেকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ পরিবাহির রোধ পরিমাপ করা হয়। এছাড়া নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আকৃতির একটি পরিবাহির মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ এর দুই প্রান্তের সাথে বিভব পার্থক্য একটি নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মটির জন্য জর্জ সাইমন ওহম (১৭৮৩-১৮৫৪) একটি m~Î প্রণয়ন করেন, যা ওহমের m~Î নামে পরিচিত।

> **ওহমের** m~Î : তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের মান পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মানের সমানুপাতিক।

ওহমের সূত্র থেকে এটা সহজেই বলা যায় যে, পরিবাহকে দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য বেশি থাকলে তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা বেশি হবে। আবার এই বিভব পার্থক্য কম থাকলে তড়িৎ প্রবাহ কম হবে (চিত্র ৯.৪)।

কোনো পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V, এর রোধ R এবং তড়িৎ প্রবাহ I হলে

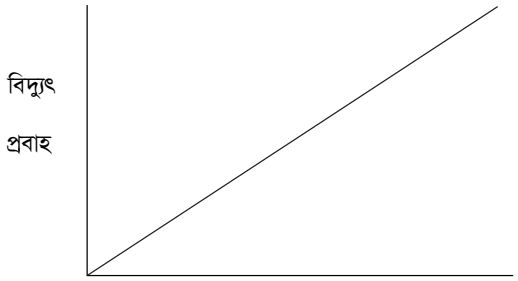

চিত্র ৯.৪ : ওহমের সূত্রের লেখচিত্র

তড়িৎ প্রবাহ $I = \frac{V}{R}$

সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিবাহকের নিজস্ব রোধের e¨¯ÍvbycvwZK|

রোধের একক

রোধের এস আই একক হলো ওহম। কোনো পরিবাহির দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ১ ভোল্ট এবং এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ ১ অ্যাম্পিয়ার হলে, ঐ পরিবাহির রোধ হবে ১ ওহম।

পাঠ ৬-৮ : তড়িৎ বর্তনী

মানুষের চলার জন্য যেমন পথের প্রয়োজন, তড়িৎ প্রবাহের জন্যও প্রয়োজন নির্দিষ্ট পথ। তড়িৎ প্রবাহ চলার এই m¤úY পথকেই তড়িৎ বর্তনী বলে। যখন তড়িৎ উৎসের দুই প্রান্তকে এক বা একাধিক রোধ, তড়িৎ যন্ত্র বা উপকরণের সাথে

যুক্ত করা হয়, তখন একটি তড়িৎ বর্তনী তৈরি হয়। একটি চাবি বা সুইচের সাহায্যে বর্তনী বন্ধ করা বা খোলা যায়। বর্তনী বন্ধ থাকলে তড়িৎ প্রবাহিত হবে, খোলা থাকলে তড়িৎ প্রবাহিত হবে না।

সাধারণত বর্তনীতে তড়িৎযন্ত্র ও DcKiYmgn দু'ভাবে সংযুক্ত করা হয়। এগুলো হলো :

(ক) শ্রেণিসংযোগ বর্তনী (খ) সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী

(ক) শ্রেণিসংযোগ বর্তনী

কোনো বর্তনীতে যদি রোধ, তড়িৎযন্ত্র বা উপকরণসমূহ এমনভাবে সংযুক্ত হয় যেন প্রথমটির এক প্রান্তের সাথে দ্বিতীয়টির অন্য প্রান্ত, দ্বিতীয়টির অপর প্রান্তের সাথে তৃতীয়টির এক প্রান্ত এবং এরূপে সব কয়টি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে, তবে সেই সংযোগকে অনুক্রম বা শ্রেণিসংযোগ বলে।

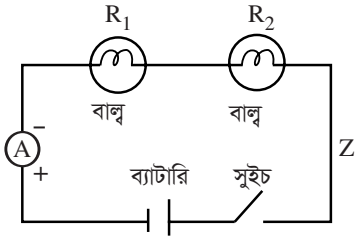

চিত্র ৯.৫ : শ্রেণিসংযোগ বর্তনী

চিত্রে রোধ R_1, R_2 অ্যামিটার A এবং চাবি K-কে অনুক্রমে সংযুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপের জন্য অ্যামিটার ব্যবহৃত হয় এবং একে বর্তনীতে অন্যান্য উপকরণের সাথে অনুক্রমে যুক্ত করা হয়। অ্যামিটারের প্রান্তদ্বয়ে + এবং − চিহ্ন থাকলে + চিহ্নিত প্রান্তকে অবশ্যই কোষের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করতে হবে। এ সংযোগের ক্ষেত্রে বর্তনী সকল অংশে সর্বদা একই পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ হয়। কিন্তু বিভিন্ন অংশে বিভব পার্থক্য ভিন্ন হতে পারে।

(খ) সমান্তরাল বর্তনী

কোনো বর্তনীতে দুই বা ততোধিক রোধ, তড়িৎ উপকরণ বা যন্ত্র যদি এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে সব কয়টির এক প্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অপর প্রান্তগুলো অপর একটি সাধারণ বিন্দুতে সংযুক্ত হয় তবে সেই সংযোগকে সমান্তরাল সংযোগ বলে। সমান্তরাল সংযোগে প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তড়িৎ প্রবাহ চলে কিন্তু প্রত্যেকটির দুই সাধারণ বিন্দুর বিভব পার্থক্য একই থাকে।

চিত্রে রোধ R_1 ও R_2 সমান্তরালভাবে এবং রোধ R_1 ও ভোল্টমিটার Va সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। কোনো রোধকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য পরিমাপের জন্য ভোল্টমিটার ব্যবহৃত হয় এবং এ কারণে একে রোধকের দুই প্রান্তের সাথে সমান্তরালে যুক্ত করতে হয়। ভোল্টমিটারে + প্রান্তকেও অবশ্যই কোষের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করতে হয়, অন্যথায় যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

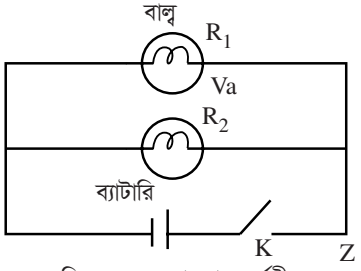

চিত্র ৯.৬ : সমান্তরাল বর্তনী

কোনো একটি বর্তনীতে যদি বাল্ব সংযোগ করা হয় তাহলে কি বাল্ব দুটি একইভাবে জ্বলবে ?

সিরিজ সংযোগে একই তড়িৎ প্রবাহ দুটি বাল্বের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। একটি বাল্ব যত উজ্জ্বলভাবে জ্বলতো দুটি বাল্ব সিরিজ সংযোজনের ফলে তার চেয়ে কম উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে। আবার কোনো একটি বাল্ব যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে mg¯Í বর্তনীর মধ্য দিয়েই তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে অপর বাল্বটিও জ্বলবে না।

সমান্তরাল সংযোগের প্রত্যেকটি বাল্বের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। তাই একটি বাল্ব নষ্ট হলেও অন্যটি জ্বলবে। প্রতিটি বাল্বই পৃথক পৃথকভাবে জ্বালানো বা নেভানো যাবে। প্রতিটি বাল্বের প্রান্তদ্বয়ের বিভব পার্থক্য

একই থাকবে। অর্থাৎ প্রতিটি বাল্বই তড়িৎ কোষের cY বিদ্যুৎ চালক শক্তি পাবে। ফলে দুটি বাল্বই উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে। বাল্ব দুটি যদি এক এক করে তড়িৎ কোষের সাথে সংযুক্ত করা হতো তখন যত উজ্জ্বলভাবে জ্বলতো বাল্ব দুটি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করলেও একই উজ্জ্বলতা থাকবে। গৃহে বিদ্যুতায়নের জন্য সমান্তরাল বর্তনীই সুবিধাজনক।

কাজ : বড় সাদা কাগজে শ্রেণিসংযোগ ও সমান্তরাল বর্তনীর চিত্র অংকন করে বিদ্যুৎ প্রবাহ চিহ্নিত কর।

পাঠ ৯ ও ১০ : অ্যামিটার

অ্যামিটার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ সরাসরি A¨w¤úqvi এককে পরিমাপ করা যায়। অ্যামিটারকে বর্তনীর সাথে শ্রেণি সংযোগ যুক্ত থাকে। এই যন্ত্রে একটি চলকুন্ডলী জাতীয় গ্যালভানোমিটার থাকে। গ্যালভানোমিটার n‡"Q সেই যন্ত্র যার সাহায্যে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের Aw¯ÍZ ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। গ্যালভানোমিটার m¤ú‡K তোমরা পরে we¯ÍwiZ জানবে।

চিত্র ৯.৭ : অ্যামিটার

এই গ্যালভানোমিটারের কুন্ডলীর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য একটি mPK বা কাঁটা লাগানো থাকে। mPKwU A¨w¤úqvi, wgwjA¨w¤úqvi বা gvB‡µvA¨w¤úqvi এককে দাগকাটা একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। বিদ্যুৎ কোষের মতো অ্যামিটারেও দুটি সংযোগ প্রান্ত থাকে, একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক প্রান্ত। সাধারণত ধনাত্মক প্রান্ত লাল এবং ঋণাত্মক প্রান্ত কালো রঙের।

ভোল্টমিটার

যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যে কোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায় তাকে ভোল্টমিটার বলে। বর্তনীর যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করতে হবে ভোল্টমিটারকে সেই দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়।

এই যন্ত্রে একটি চলকুন্ডলী জাতীয় গ্যালভানোমিটার থাকে। এর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য একটি mPK বা কাঁটা লাগানো থাকে। mPKwU ভোল্ট এককে দাগাঙ্কিত একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। বর্তনীর যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করতে হয় ভোল্টমিটারটিকে সেই দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়। তড়িৎ কোষ বা অ্যামিটারের মতো ভোল্টমিটারেও দুটি সংযোগ প্রান্ত থাকে, একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক প্রান্ত। সাধারণত ধনাত্মক প্রান্ত লাল এবং ঋণাত্মক প্রান্ত কালো রঙের।

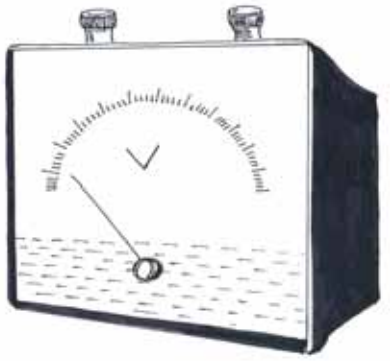

চিত্র ৯.৮ : ভোল্টমিটার

পাঠ ১১ : ফিউজ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব তড়িৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি সেগুলোর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি তড়িৎ প্রবাহিত হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। বাড়ির তড়িৎ বর্তনীতে কোনো কারণে অতিরিক্ত তড়িৎ প্রবাহিত হলে অনেক

সময় তার থেকে বাড়িতে আগুন পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। এ ধরনের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য বর্তনীতে এক ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থা হলো ফিউজ তার ব্যবহার করা। ফিউজ সাধারণত টিন ও সীসার একটি সংকর ধাতুর তৈরি ছোট সরু তার। এটি একটি চিনামাটির কাঠামোর উপর দিয়ে আটকানো থাকে। তারটি সরু এবং গলনাঙ্ক কম। এর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত তড়িৎ প্রবাহিত হলে এটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে গলে যায়। ফলে তড়িৎ বর্তনী we"Qb হয়ে যায়। এভাবে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে ফিউজ যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে। বর্তনীতে ফিউজ সিরিজ সংযোগ করতে হয়।

ফিউজ তারের মান বিভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত আমরা ৫ A¨w¤úqvi, 15 A¨w¤úqvi, 30 A¨w¤úqvi Ges 60 A¨w¤úqvi wdDR Zvi e¨envi K‡i _wK| 10 A¨w¤úqvi wdDR gv‡b Gi ga¨ w`‡q 10 A¨w¤úqv‡ii বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটি গলে যাবে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য বিভিন্ন মানের ফিউজ ব্যবহার করতে হয়। বাতি, পাখা, টিভি ইত্যাদির জন্য ৫ A¨w¤úqvi wdDR Ges B‡jKwUK †KUwj ev B¯¿i Rb¨ 15 A¨w¤úqvi ফিউজ ব্যবহার করতে হয়। বাড়ির মেইন ফিউজ ৩০ বা ৬০ A¨w¤úqv‡ii হয়ে থাকে।

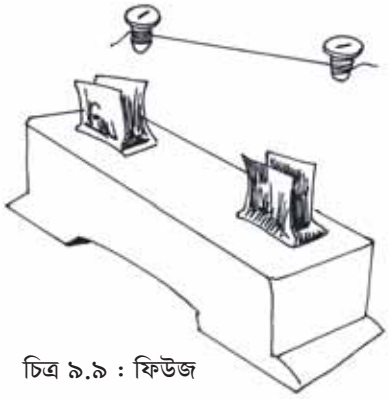
চিত্র ৯.৯ : ফিউজ

ব্যাপারটা আর একটু বোঝার চেষ্টা কর। টেলিভিশন ৫ A¨w¤úqv‡ii বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য পুড়ে যায়। এখন যদি টেলিভিশনের সাথে ৩০ A¨w¤úqv‡ii ফিউজ লাগাও তাহলে কী হবে? এ ফিউজ কোনো কাজে আসবে না। ইলেকট্রিক কেটলির সাথে ৫ A¨w¤úqvi ফিউজ লাগালে কী হবে? সুইচ অন করলেই ফিউজটি গলে যাবে। কারণ ইলেকট্রিক কেটলিতে ৫ A¨w¤úqv‡ii বেশি বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তেমন মানের ফিউজ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মানের ফিউজ ব্যবহার করলে কোনো কাজ দিবে না, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে না। আবার কম মানের ফিউজ ব্যবহার করলে বারবার ফিউজ তার পুড়ে যেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। কেউ কেউ আবার বাড়িতে ফিউজ পুড়ে গেলে তার লাগাবার সময় দুই তিনটি তার একত্র করে লাগান। এ রকম কখনও করা উচিত নয়। কারণ, এতে ফিউজের মান বেড়ে যায়। দুইটি ১০ A¨w¤úqv‡ii ফিউজ তার একত্র করলে ২০ A¨w¤úqvi ফিউজ হয়ে যাবে।

পাঠ ১২ : বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার ও অপচয় রোধে সচেতনতা

আমাদের দেশে দিন দিন বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে চলছেই। চাহিদার সাথে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেও চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব n‡"Q না। তার মধ্যে বাড়তি যোগ n‡"Q জলবায়ুর পরিবর্তন। যার প্রভাব পড়ছে বিদ্যুতের চাহিদার উপর। বাড়ছে অফিস, বাসা, শপিং কমপেক্স। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বড় বড় বিল্ডিং করার সাথে বাড়ছে লিফটের চাহিদা। চাহিদা বাড়ছে নির্মাণ কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার করার প্রবণতা। এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব। বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার করে এর অপচয় রোধে সকলকে সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার ও অপচয় রোধে আমরা নিচের কাজগুলো করতে পারি।

- ❏ বাসায় বা অফিসে প্রয়োজন ব্যতীত লাইট, ফ্যান বা এয়ার-কুলার বন্ধ রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকা।
- ❏ সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে ফ্লোরোসেন্স বা এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করতে হবে, এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়।

- ❑ রান্নার কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার পরিহার করতে হবে। প্রেসার কুকারে রান্না করলে ২৫% বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়।
- ❑ অপ্রয়োজনে এয়ারকুলারের ব্যবহার না করা নিশ্চিত করতে হবে।
- ❑ ফ্রিজ কেনার সময় প্রয়োজনীয় সাইজের কেনা উচিত। প্রয়োজনের চেয়ে বড় সাইজের ফ্রিজে বাড়তি বিদ্যুৎ লাগে।
- ❑ বড় বড় ফ্যাক্টরিগুলোতে নিজেদের জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা।
- ❑ সোলার বিদ্যুৎ ব্যবহারে স্ব-উদ্যোগী হওয়া।

নতুন শব্দ

তড়িৎ বিভব, তড়িৎ প্রবাহ, রোধ, ওহমের mÎ, একমুখী প্রবাহ, পর্যাবৃত্ত প্রবাহ, তড়িৎ বর্তনী, অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ফিউজ।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম–

- দুটি ভিন্ন বিভবের পরিবাহককে সংযুক্ত করলে এদের যে বৈদ্যুতিক অবস্থা এদের মধ্যে চার্জ আদান প্রদানের দিক নির্ণয় করে তাই হলো বৈদ্যুতিক বিভব।
- যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি পরিবাহকের মধ্যে বিভব পার্থক্য বর্তমান থাকে তড়িৎ প্রবাহ ততক্ষণ পর্যন্ত চলে।
- কোনোভাবে যদি পরিবাহকদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য বজায় রাখা যায় তখন তড়িৎ প্রবাহ wbiew"Qbভাবে চলতে থাকে।
- পরিবাহির যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় তাই হলো রোধ।
- তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের মান পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মানের সমানুপাতিক।
- যখন তড়িৎ প্রবাহ সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহকে অপর্যাবৃত্ত প্রবাহ বলে।
- যখন নির্দিষ্ট সময় পর পর তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়, সেই তড়িৎ প্রবাহকে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ বলে।
- বর্তনীতে তড়িৎযন্ত্র ও উপকরণসমূহ দু'ভাবে সংযুক্ত করা হয়। এগুলো হলো শ্রেণিসংযোগ বর্তনী ও সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী।
- অ্যামিটারের সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ সরাসরি A¨w¤úqvi এককে পরিমাপ করা যায়।
- যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যেকোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায় তাই ভোল্টমিটার।
- ফিউজ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য বর্তনীতে এক ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা।
- বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার করে এর অপচয় রোধে সকলকে সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ কর

১। দুটি পরিবাহীর মধ্যে ——— থাকলে তড়িৎ ——— হয়।

২। পরিবাহকের দুই প্রান্তের ——— কম থাকলে ——— মাত্রা কম হয়।

৩। ইলেকট্রনিক কেটলির সাথে ৫ ——— ফিউজ লাগালে এটি ——— যাবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ওহমের m‡Îi ব্যাখ্যা দাও।

২। কোনো পরিবাহকের রোধের সাথে এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহের m¤úK কেমন ?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিদ্যুৎ প্রবাহের একক কী?

ক. কুলম্ব খ. A¨w¤úqvi

গ. ভোল্ট ঘ. ও'ম

২. পর্যাবৃত্ত প্রবাহের উৎস কোনটি?

ক. ব্যাটারি খ. ডিসি জেনারেটর

গ. জেনারেটর ঘ. বিদ্যুৎকোষ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মিনার পড়ার ঘরে ২টি বাল্ব ও ১টি ফ্যানের সংযোগ দেওয়া আছে। অন্যদিকে তাদের খাবার ঘরে ২টি টিউবলাইট, ১টি ফ্যান ও ১টি ইলেকট্রিক কেটলির সংযোগ দেওয়া আছে।

৩. মিনার পড়ার ঘরে কত অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ ব্যবহার করতে হবে?

ক. ৫ খ. ১০

গ. ১৫ ঘ. ৩০

৪. মিনাদের খাবার ঘরে ৫ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ ব্যবহার করলে-

i. বিদ্যুৎ খরচ কম হবে

ii. প্রায়ই বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটবে

iii. সুইচ অন করা মাত্র গলে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. হক সাহেব তার অফিসকক্ষে ৬০ ওয়াটের দুটি বাল্ব সিরিজে সংযুক্ত করলেন। কিন্তু ১টি ফ্যান ও ১টি টেলিভিশন প্যারালালে সংযুক্ত করেন।

ক. বিদ্যুৎ প্রবাহ কী?

খ. ৫ অ্যাম্পিúqvi ফিউজ বলতে কী বুঝায়?

গ. হক সাহেবের ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোর সাহায্যে একটি প্যারালাল বর্তনী আঁক।

ঘ. বর্তনী দুটির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক তুলনামূলক আলোচনা করে মতামত দাও।

২. কাফি সাহেবের বাসার বৈদ্যুতিক বর্তনীতে ইদানীং প্রায়ই ছোটখাটো সমস্যা দেখা ৷`‡"Q| যেমন- সুইচ অন করার সময় শক লাগা, বাল্ব ফিউজ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ইলেকট্রিশিয়ান ডাকা হলে তিনি দুটি যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ ও ভোল্টেজ পরীক্ষা করে কিছু ত্রুটি লক্ষ করলেন। তিনি বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহারে পরিবারের সদস্যদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিলেন।

ক. রোধ কী?

খ. ১০ কিলোওম বলতে কী বুঝায়?

গ. যন্ত্র দুটির সংযোগ প্রক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

ঘ. বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহারে কাফি সাহেবের পরিবার সচেতন হলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে এর কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ কর।

দশম অধ্যায়

অম্, ক্ষারক ও লবণ

লেবুর রস, ভিনেগার, চুন, এন্টাসিড ঔষধ, খাবার লবণ এগুলো আমাদের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। এদের মধ্যে কোনোটি অম-বা এসিড, কোনোটি ক্ষারক আবার হয়তো লবণ। এদের রাসায়নিক ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন। ধর্ম অনুযায়ী এদের একেকটি এক এক কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

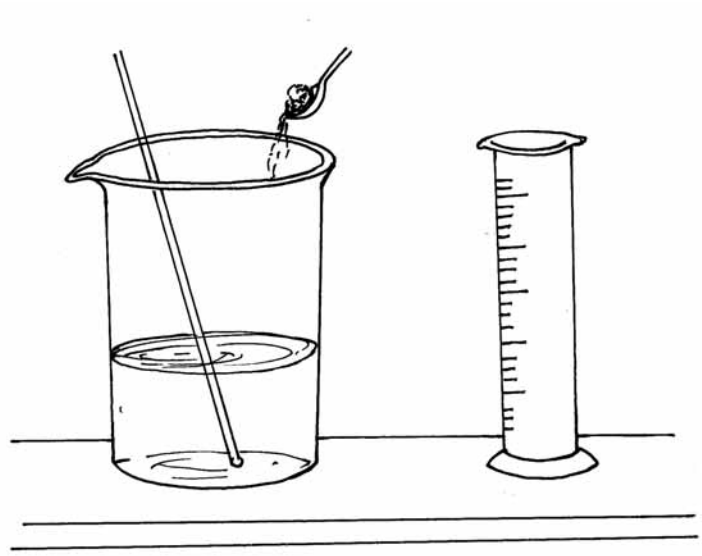

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- অম-ও ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্ষারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লবণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিরপেক্ষ পদার্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণ কার্যক্রমে যন্ত্রপাতি ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারব।
- আমাদের জীবনে অম্, ক্ষার ও লবণের অবদান উপলব্ধি করব।
- পরীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালীন প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে দলীয় সদস্যদের সচেতন করতে পারব।

পাঠ ১-৪ : অম্, ক্ষারক ও নির্দেশক

কাজ : অম-কী তা জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : লেবুর রস, লিটমাস পেপার, বিকার, চিমটা।

পদ্ধতি : টেস্টটিউবে ২-৩ মিলিলিটার লেবুর রস নাও। প্রথমে চিমটা দিয়ে লাল লিটমাস কাগজ বিকারে নেওয়া লেবুর রসে ডুবাও। কাগজের রং কি পরিবর্তন হলো ? না, হলো না। এবার নীল লিটমাস কাগজ লেবুর রসে ডুবাও। এখন কি লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন হলো ? হ্যাঁ, লিটমাস কাগজের রং নীল থেকে লাল হয়ে গেল।

তোমরা কি জান এর কারণ কী?

লিটমাস কাগজ তৈরি করা হয় সাধারণ কাগজে লিচেন (Lichens) নামক এক ধরনের গাছ থেকে প্রাপ্ত রঙের সাহায্যে। এভাবে প্রাপ্ত লিটমাস কাগজ দেখতে রক্তবর্ণের হয়। এই রক্তবর্ণের লিটমাস কাগজকে পটাশিয়াম কার্বনেট (K_2CO_3) ও অ্যামোনিয়া (NH_3) দিয়ে গাঁজন (Fermentation) করলে তা নীলবর্ণ ধারণ করে। অন্যদিকে নীলবর্ণের লিটমাস কাগজে সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করলে তা লাল বর্ণের লিটমাস কাগজে পরিণত হয়।

অন্যদিকে লেবুর রসে থাকে সাইট্রিক এসিড। এতে যখন লাল লিটমাস ডুবানো হয়, তখন কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না, ফলে লিটমাস কাগজের রঙের কোনোই পরিবর্তন হয় না। পক্ষান্তরে নীল লিটমাস কাগজ ডুবালে, এতে থাকা অ্যামোনিয়ার সাথে লেবুর সাইট্রিক এসিডের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, ফলে লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে যায়।

কাজ : লেবুর রসের বদলে তোমরা নিজেদের মধ্যে দল করে ভিনেগার, কামরাঙ্গা, কমলার রস ইত্যাদি নিয়ে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ দিয়ে পরীক্ষা করে রং পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ কর ।

তাহলে একথা বলা যায় যে, এসিডের একটি ধর্ম হলো এরা নীল লিটমাসকে লাল করে।

তোমরা কি জান লেবুর রসের মতো আমলকি, করমচা, কামরাঙ্গা, বাতাবি লেবু, আঙুর ইত্যাদি টক লাগে কেন?

কারণ হলো এই ফলগুলোতে নানা রকম এসিড থাকে। অর্থাৎ এটা বলা যায় যে, GwmWmgn টকস্বাদযুক্ত হয়।

নিচের টেবিলে বেশকিছু ফল ও এতে উপস্থিত এসিডের নাম দেওয়া হলো।

ফলের নাম	উপস্থিত এসিড
আঙুর, কমলা, লেবু	সাইট্রিক এসিড
তেঁতুল	টারটারিক এসিড
টমেটো	অক্সালিক এসিড
চা	ট্যানিক এসিড
ভিনেগার	এসিটিক এসিড
আমলকি	এসকরবিক এসিড
আপেল, আনারস	ম্যালিক এসিড

কাজ : ক্ষারকের mm¤ú‡K জানা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : Pb, বিকার, পানি, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, হাতমোজা, নাড়ানি, চামচ, ড্রপার, চিমটা।

পদ্ধতি : হাতমোজা পরে চামচ দিয়ে ৫-১০ গ্রাম চুন বিকারে নাও। এবার ড্রপার দিয়ে A\‡¯Í A\‡¯Í ১০০ মিলিলিটার পানি যোগ কর। নাড়ানি দিয়ে ভালোভাবে নাড়া দাও। এরপর ১০ মিনিট মিশ্রণটিকে রেখে দাও। সতর্কতার সাথে মিশ্রণের উপরিভাগ থেকে পরিষ্কার দ্রবণ আলাদা করে নাও। এই পরিষ্কার দ্রবণটিই হলো চুনের পানি। এখন চুনের পানিতে চিমটা দিয়ে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ ডুবাও। লিটমাস কাগজের রং কি পরিবর্তন হলো ?

হ্যাঁ, লাল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে নীল হয়ে গেল আর নীল লিটমাসের রং পরিবর্তন হলো না। নীল লিটমাস কাগজে অ্যামোনিয়া থাকে আর অ্যামোনিয়া ও চুনের পানিতে থাকা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Ca(OH)_2$] একই ধর্মবিশিষ্ট হওয়ায় একে অপরের সাথে কোনো বিক্রিয়া করে না। ফলে লিটমাস কাগজের রঙের কোনো পরিবর্তন হয় না। পক্ষান্তরে লাল লিটমাস কাগজে থাকে এসিড যা বিপরীতধর্মী $Ca(OH)_2$ এর সাথে বিক্রিয়া করে, ফলে লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়।

চুনের পানিতে থাকা $Ca(OH)_2$ এর মতো যে সকল রাসায়নিক পদার্থ লাল লিটমাস কাগজকে নীল করে তাদেরকে আমরা ক্ষারক বলি। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH) একটি ক্ষারক যা সাবান তৈরির একটি gj উপাদান। এটি কাগজ ও রেয়ন শিল্পেও ব্যবহৃত হয়।

নির্দেশক : তোমরা উপরে যে লিটমাস কাগজ ব্যবহার করলে তা নিজের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি পদার্থ অম-না ক্ষারক তা নির্দেশ করল। লিটমাস কাগজ এর মতো যেসব পদার্থ নিজেদের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি e¯' অম-না ক্ষার বা কোনোটিই নয় তা নির্দেশ করে তাদেরকে নির্দেশক বলে। লিটমাস কাগজের মতো মিথাইল অরেঞ্জ, ফেনোলফথ্যালিন, মিথাইল রেড এগুলো নানা রকমের নির্দেশক যারা একটি অজানা পদার্থ এসিড, ক্ষার না নিরপেক্ষ তা বুঝতে সাহায্য করে।

তোমরা কি জান এসিড ও ক্ষারকের gj পার্থক্য কী?

এটি বুঝার জন্য প্রথমে আমরা কয়েকটি এসিডের সংকেত লক্ষ করি।

ভিনেগার বা এসিটিক এসিড (CH_3COOH), অক্সালিক এসিড (HOOC-COOH), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ।

এই সবগুলো এসিডের মিল কোথায়?

এদের সবগুলোতেই এক বা একাধিক H আছে এবং এরা সবাই পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে। তাহলে বলা যায় যে, এসিড হলো ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে এক বা একাধিক ঐ হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে H^+ উৎপন্ন করে।

$$HCl \xrightarrow{H_2O} H^+ + Cl^-$$

$$H_2SO_4 \xrightarrow{H_2O} H^+ + HSO_4^-$$

$$HSO_4 \xrightarrow{H_2O} H^+ + SO_4^{2-}$$

$$CH_3COOH \xrightarrow{H_2O} CH_3COO^- + H^+$$

$$HOOC\text{-}COOH \xrightarrow{H_2O} -OOC - COO^- + 2H^+$$

মিথেন (CH_4) কি এসিড?

না, এসিড নয়। কারণ যদিও মিথেনে ৪টি H পরমাণু আছে, কিন্তু মিথেন পানিতে H^+ তৈরি করে না।

এবার কয়েকটি ক্ষারকের দিকে লক্ষ করি। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH), পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH), অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH), ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Ca(OH)_2$]।

বল তো সবগুলোর মধ্যে মিল কোথায়? এদের সবগুলোতেই OH আছে।

অর্থাৎ ক্ষারক হলো সেই সকল রাসায়নিক e^-‘ যাদের মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-) হাইড্রোক্সাইড তৈরি করে।

$$NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$$

$$KOH \xrightarrow{H_2O} K^+ + OH^-$$

$$NH_4OH \xrightarrow{H_2O} NH_4^+ + OH^-$$

$$Ca(OH)_2 \xrightarrow{H_2O} Ca_2^+ + 2OH^-$$

তবে কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ, যেমন- ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুন, অ্যামোনিয়া (NH_3), যাদের মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দু'ধরনের পরমাণু নেই, কিন্তু এরা পানিতে OH^- তৈরি করে, এদেরকেও ক্ষারক বলা হয়।

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$

$$NH_3 + H_2O \longrightarrow NH_4OH$$

ক্ষার (Alkali) : তোমরা এর আগে জেনেছ যে, ক্ষারক হলো মূলত ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড। কিছু কিছু ক্ষারক আছে যারা পানিতে `exfZ হয় আর কিছু আছে যারা `exfZ হয় না। যে mgস্ত ¶ারক পানিতে `exZZ হয় তাদেরকে বলে ক্ষার। তাহলে ক্ষার হলো বিশেষ ধরনের ক্ষারক। NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $NH_4OH$ এরা সবাই ক্ষার। এদেরকে কিন্তু ক্ষারকও বলা যায়। পক্ষান্তরে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Al(OH)_2$] কিন্তু পানিতে `exfZ হয় না। তাই এটি একটি ক্ষারক হলেও ক্ষার নয়। অতএব একথা বলা যায় যে, সকল ক্ষার ক্ষারক হলেও সকল ক্ষারক কিন্তু ক্ষার নয়। আবার CuO একটি ক্ষারক কিন্তু ক্ষার নয়।

তোমরা সবাই জান যে সাবান ¯úk করলে wcw"Qj মনে হয়। এর কারণ হলো সাবানে ক্ষারক থাকে। তাহলে বলা যায় যে, ক্ষার ও ক্ষারকের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা wcw"Qj হয়। আবার দেখা গেছে যে ক্ষার ও ¶viKmgn সাধারণত তিতা স্বাদযুক্ত হয়। উলেখ্য যে, কখনই পরীক্ষাগারে ক্ষারকের স্বাদ পরীক্ষা করা যাবে না।

পাঠ ৫ ও ৬ : এসিড ও ক্ষারকের ব্যবহার

তোমরা কি জান আমাদের বহুল ব্যবহৃত বিচিং পাউডার কীভাবে তৈরি হয়?

এটি তৈরি হয় শুকনো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও ক্লোরিন গ্যাসের (C_{12}) বিক্রিয়া ঘটিয়ে। আবার ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পাতলা দ্রবণ যা চুনের পানি বা লাইম ওয়াটার (Lime water) নামে পরিচিত সেটি আমাদের ঘরবাড়ি হোয়াইট ওয়াশ করতে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে পানি ও ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তৈরি পেস্ট যা মিল্ক অফ লাইম (Milk of Lime) নামে অধিক পরিচিত, তা পোকামাকড় দমনে ব্যবহৃত হয়।

তোমরা কি জান আমাদের পাকস্থলীতে এসিডিটি হলে যে এন্টাসিড ঔষধ খাই তা আসলে কী?

এন্টাসিড ঔষধ হলো মূলত ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Mg(OH)_2$] যা সাসপেনশান ও ট্যাবলেট দুভাবেই পাওয়া যায়। হাইড্রোক্সিল $(OH)_2$ এর সাসপেনশান মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া (Milk of Magnesia) নামেই অধিক পরিচিত। কখনও কখনও এন্টাসিডে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডও [$Al(OH)_3$] থাকে।

ফলমূল বা সবজিতে যে সকল এসিড থাকে এদেরকে জৈব এসিড বলে। এদেরকে খাওয়া যায় এবং কোনো কোনটি মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। যেমন- এসকরবিক এসিড যা আমরা ভিটামিন সি বলে জানি। এর অভাবে মানবদেহে স্কার্ভি (Scurvy) রোগ হয়। অন্যদিকে কিছু কিছু এসিড আছে যেমন- হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), ফসফরিক এসিড (H_3PO_4), নাইট্রিক এসিড (HNO_3), পারকোরিক এসিড ($HClO_4$) ইত্যাদি যেগুলো প্রকৃতিতে প্রাপ্ত নানারকম খনিজ পদার্থ থেকে তৈরি করা হয়, এদেরকে খনিজ এসিড (Mineral Acids) বলে। এগুলো খাওয়ার উপযোগী নয়। বরং বলা যায় এরা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। খনিজ এসিড ত্বকে লাগলে ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

তোমরা কি জান আমাদের সমাজের কিছু খারাপ চরিত্রের লোক যে এসিড ছুড়ে মানুষের শরীর ঝলসে দেয় সেগুলো কোন ধরনের এসিড? এগুলো হলো খনিজ এসিড, বিশেষ করে H_2SO_4।

তোমরা কি জান এসিড ছোড়ার kw¯Í কী?

এসিড ছোড়ার kw¯Í খুবই কঠোর, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।

দুষ্ট চরিত্রের লোকেরা এসিড ছুড়ে একদিকে যেমন মারাত্মক অপরাধ করছে অন্যদিকে শিল্প কারখানায় অতি প্রয়োজনীয় এসিড অপচয় করছে। এর বিরুদ্ধে অবশ্যই আমাদের সো"Pার হতে হবে এবং মানুষকে সচেতন করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা পোস্টার, লিফলেট এগুলো তৈরি করে মানুষের মধ্যে বিলি করতে পারি। এতে একদিকে যেমন আমাদের gj¨evb m¤ú` খনিজ GwmWmg‡ni অপচয় রোধ করা যাবে অন্যদিকে এসিড ছোড়ার মতো মারাত্মক kw¯Í‡hvM¨ অপরাধ থেকে আমাদের সমাজও রক্ষা পাবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং শিল্প কারখানায় এসিডের ব্যবহার অনস্বীকার্য। আমরা টয়লেট পরিষ্কারের কাজে যে mg¯Í পরিষ্কারক ব্যবহার করি তাতে থাকে এসিড। সোনার গহনা তৈরির সময় স্বর্ণকাররা নাইট্রিক এসিড ব্যবহার করেন। আমরা বিভিন্ন কাজে যেমন– আইপিএস, গাড়ি, মাইক বাজানোর সময়, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি তাতে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। তোমরা অনেকে হয়তো জান যে, বাসাবাড়িতে সাপের উপদ্রব কমানোর জন্য যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় সেটি হলো কার্বোলিক এসিড।

তোমরা কি জান আমাদের খাদ্যদ্রব্য হজম করার জন্য পাকস্থলীতে এসিড অত্যাবশ্যকীয় এবং সেটি হলো হাইড্রোক্লোরিক এসিড।

সার কারখানায় অতি প্রয়োজনীয় একটি উপাদান হলো সালফিউরিক এসিড। এছাড়া ডিটারজেন্ট থেকে শুরু করে নানারকম রং, ঔষধপত্র, কীটনাশকসহ পেইন্ট, কাগজ, বিস্ফোরক ও রেয়ন তৈরিতে প্রচুর H_2SO_4 ব্যবহৃত হয়।

কোনো একটি দেশ কতটা শিল্পোন্নত তা বিচার করা হয় ঐ দেশ কতটুকু H_2SO_4 তৈরি করে তার উপর ভিত্তি করে। B¯úvZ তৈরির কারখানায়, ঔষধ, চামড়া শিল্প ইত্যাদি অনেক শিল্পে HCl ব্যবহৃত হয়।

সার কারখানায়, বিস্ফোরক c¯'wZ, খনি থেকে gj¨evb ধাতু যেমন সোনা আহরণে ও রকেটে জ্বালানির সাথে HNO_3 ব্যবহৃত হয়।

পাঠ ৭- ১০ : এসিড ও ক্ষারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

কাজ : চুনাপাথরের সাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : চুনাপাথর, ১টি চামচ, পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কাচের ড্রপার, এ্যাপ্রোন।

পদ্ধতি : এ্যাপ্রোনটি পরে নাও। চুনাপাথর গুঁড়া করে নাও। চুনাপাথরের গুঁড়া চামচে নাও। এবার কাঁচের ড্রপার দিয়ে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড চামচে যোগ করতে থাক। কোনো পরিবর্তন দেখতে cv"Q? গ্যাসের বুদবুদ উঠছে? হ্যাঁ, গ্যাসের বুদবুদ উঠছে এবং অনেকটা ফেনার মতো মনে n‡"Q। কারণ হলো চুনাপাথরে ($CaCO_3$) পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করাতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং সে কারণেই আমরা বুদবুদ দেখি। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে গেলে আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের ও পানির পরিষ্কার দ্রবণ দেখতে পাই।

হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মতো প্রায় সকল এসিডই কার্বোনেটের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2 \uparrow$$

তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, কখনও কখনও এসিডের এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে উৎপন্ন CO_2 আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

তোমরা বল তো খাবার সোডা ($NaHCO_2$) ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় কী ঘটবে ?

খাবার সোডা ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ, পানি ও CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হবে।

$$NaHCO_2 + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O + CO_2 \uparrow$$

তোমরা আগের শ্রেণিতে খাবার সোডাতে লেবুর রস বা ভিনেগার যোগ করলে কী ঘটে তা জেনেছ। তোমাদের তা কি মনে আছে? এখানে কী ধরনের বিক্রিয়া ঘটবে তা নিজেরা লেখ।

কাজ : এসিডের সাথে ধাতু মিশালে কী ঘটে তা দেখা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ধাতু হিসেবে `¯Ívi গুঁড়া (Zn), পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, w¯úwiU j¨v¤ú, টেস্টটিউব, এ্যাপ্রোন।

পদ্ধতি : এ্যাপ্রোন পরে নাও। টেস্টটিউবের অর্ধেক পরিমাণ ভরে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও। অল্প পরিমাণ `¯Ívi গুঁড়া টেস্টটিউবে নেওয়া এসিডে ছেড়ে দাও। কোনো গ্যাসের বুদবুদ উঠছে কি? না উঠলে w¯úwiU j¨v¤ú জ্বালিয়ে টেস্ট টিউবের তলায় হালকা তাপ দাও । গ্যাসের বুদবুদ উঠছে কি?

এটি `¯Ív ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ। এটি হাইড্রোজেন গ্যাস কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পার। টেস্টটিউবের মুখে একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই ধরে দেখ কী ঘটে? পপ পপ শব্দ করে জ্বলছে? হ্যাঁ ঠিক তাই। এটি হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য গ্যাস হলে এমন শব্দ হতো না।

$$Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$$

হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মতো প্রায় সকল এসিডই ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

কাজ : চুনের সাথে পানি মিশালে কী ঘটে তা দেখ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : চুন, পানি, বিকার, হাতমোজা, †¯úPjv, ড্রপার।

পদ্ধতি : ৫ গ্রাম পরিমাণ (ভিন্ন পরিমাণও নেওয়া যেতে পারে) চুন বিকারে নাও। ড্রপার দিয়ে ৪০ গ্রাম পানি A‡¯Í A‡¯Í যোগ কর। হাতমোজা পরে বিকার ¯úk কর। পানি যোগ করার পর কোনো পরিবর্তন দেখতে cv"Q?

বিকার অনেক বেশি গরম হয়ে hv‡"Q আর বিকারের মিশ্রণটি অনেকটা ফুটন্ত পানির মতো টগবগ করছে। চুনে পানি যোগ করায় চুন ও পানির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপে পানি ফুটতে থাকে।

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + \text{তাপ}$$

কাজ : চুনের পানির সাথে এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরন : চুন, পানি, সালফিউরিক এসিড, বিকার, লাল লিটমাস কাগজ, নাড়ানি, চিমটা, ড্রপার।

পদ্ধতি : পূর্বের মতো চুনের পানি তৈরি কর। ছোট বিকারে ১০ মিলিলিটার চুনের পানি নাও। এবার চিমটা দিয়ে লাল লিটমাস কাগজকে চুনের পানিতে ডুবাও। লিটমাস কাগজের রং লাল থেকে নীল হয়ে গেল কি? হ্যাঁ, ঠিক তাই। এতে প্রমাণিত হলো চুনের পানি একটি ক্ষারকীয় পদার্থ। এবার পাতলা সালফিউরিক এসিড ড্রপার দিয়ে A\‡¯Í A\‡¯Í যোগ কর ও নাড়ানি দিয়ে নাড়া দাও। লিটমাস কাগজ বিকারের দ্রবণে ডুবিয়ে দেখ এর রঙের কী ধরনের পরিবর্তন হয়। এভাবে A\‡¯Í A\‡¯Í H_2SO_2 যোগ করতে থাক এবং লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে পরীক্ষা কর। এক পর্যায়ে দেখবে লিটমাস কাগজের রং আর পরিবর্তন n‡"Q না।

কেন লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন n‡"Q না?

কারণ হলো চুনের পানিতে থাকা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগকৃত H_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সালফেট ও পানি উৎপন্ন করে। ফলে ধীরে ধীরে $Ca(OH)_2$ এর পরিমাণ কমতে থাকে এবং যখন সব $Ca(OH)_2$, H_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া করে ফেলে তখন লিটমাস কাগজের রং আর পরিবর্তন হয় না।

$$\underset{\text{ক্ষারক}}{Ca(OH)_2} + \underset{\text{এসিড}}{H_2SO_4} \longrightarrow \underset{\text{লবণ}}{CaSO_4} + \underset{\text{পানি}}{2H_2O}$$

এখানে উৎপন্ন ক্যালসিয়াম সালফেট হলো একটি লবণ। তাহলে আমরা বলতে পারি ক্ষারক ও এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন gj পদার্থই (পানি ছাড়া) হলো লবণ।

আরও কিছু ক্ষারক ও এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণ দেখে নেওয়া যাক :

ক্ষারক		এসিড		লবণ		পানি
$NaOH$	+	HCl	$\longrightarrow$	$NaCl$	+	H_2O
KOH	+	HNO_3	$\longrightarrow$	KNO_3	+	H_2O
$2NH_4OH$	+	H_2SO_4	$\longrightarrow$	$(NH_4)2SO_4$	+	$2H_2O$
$3Ca(OH)_2$	+	$2H_3PO_4$	$\longrightarrow$	$Ca_3(PO4)_2$	+	$3H_2O$

তবে একমাত্র যে ক্ষারক ও এসিডের বিক্রিয়াতেই লবণ উৎপন্ন হয় তা নয়। অন্য বিক্রিয়ার মাধ্যমেও লবণ উৎপন্ন করা যায়। যেমন- ধাতু ও এসিডের মধ্যে বিক্রিয়ায় লবণ উৎপন্ন হয়।

Mg	+	$2HCl$	$\longrightarrow$	$MgCl_2$	+	H_2
Zn	+	H_2SO_4	$\longrightarrow$	$ZnSO_4$	+	H_2
Na	+	$2HCl$	$\longrightarrow$	$NaCl$	+	H_2

আবার কার্বোনেটের সাথে (যা একটি লবণ) এসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়েও লবণ উৎপন্ন করা যায়।

$$Na_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$$

পাঠ ১১-১৩ : অম্- ক্ষার ও লবণ শনাক্তকরণ

কাজ : পানিও খাবার লবণের মিশ্রণে লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন হয় কি না তা দেখা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : বিকার, নাড়ানি, লবণ, পানি, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, চিমটা।

পদ্ধতি : একটি বিকারে ৫০ মিলিলিটার পানি নিয়ে তাতে ১০-১৫ গ্রাম খাবার লবণ যোগ কর। নাড়ানি দিয়ে ভালোভাবে নাড়া দাও। এবার চিমটা দিয়ে প্রথমে নীল লিটমাস কাগজ ও পরে লাল লিটমাস কাগজ লবণ-পানির মিশ্রণে ডুবাও। লিটমাস কাগজের রং কি পরিবর্তন হলো? না, হলো না। কেন হলো না?

কারণ হলো এখানে কোনো এসিড বা ক্ষারক নেই। এসিড থাকলে নীল লিটমাস লাল হতো আর ক্ষারক থাকলে লাল লিটমাস নীল হতো। পানিতে আছে লবণ যা একটি নিরপেক্ষ পদার্থ। না এসিড, না ক্ষারক। তাই কোনো লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন হয় না। খাবার লবণের মতো অনেক লবণ আছে যারা নিরপেক্ষ পদার্থ অর্থাৎ এরা লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করে না।

বি:দ্র: কখনও কখনও বিশেষ কারণে [যেমন- দূষণ] পানিতে এসিড বা ক্ষারক থাকতে পারে। তখন কিন্তু নিরপেক্ষ পদার্থ হলেও পানি লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করতে পারে।

কাজ : ফুল ও সবজির নির্যাস তৈরি ও অম-ও ক্ষারক শনাক্তকরণ শেখা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : জবা, বাগান বিলাস ও হলুদ কৃষ্ণচুড়া ফুলের পাপড়ি, বেগুনি বাঁধাকপির পাতা, সালাদ তৈরির বীট, পুঁই শাকের বীজ, বিকার (৬টি), নাড়ানি, পানি, বুনসেন বার্নার বা গ্যাসের চুলা, ফিল্টার কাগজ, বোতল, কাগজ কলম, লেবুর রস, ভিনেগার, টক দই, চুনের পানি, সাবান পানি, খাবার সোডা, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কাচের খন্ড, ড্রপার।

পদ্ধতি : উপরে বর্ণিত নানা রকম ফুল ও সবজির উপাদান সংগ্রহ কর। আলাদাভাবে এক একটি বিকারে এক একটি ফুলে পাপড়ি বা সবজির উপাদান নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে বুনসেন বার্নার বা চুলায় জ্বাল দাও। পানি প্রায় অর্ধেক হলে, মিশ্রণগুলো ঠান্ডা কর। ফিল্টার কাগজ দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে ছেঁকে প্রাপ্ত নির্যাস ভিন্ন ভিন্ন বোতলে রাখ। কোন বোতলে কোন ধরনের নির্যাস তা বোতলের গায়ে লিখে রাখ। এবার টেস্টটিউব নিয়ে একে একে লেবুর রস, চুনের পানি, টক দই, ভিনেগার, সাবান পানি, খাবার সোডা, HCl, NaOH নাও ও কোনটিতে কী নিলে তা গায়ে লিখে রাখ। এবার একটি নির্যাস নিয়ে ড্রপার দিয়ে অল্প পরিমাণে প্রতিটি টেস্টটিউবে যোগ করে ভালোভাবে ঝাঁকাও। নির্যাসের রঙে কোনো পরিবর্তন দেখতে c¨"Q? কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বর্ণ লাল ও কোন কোন ক্ষেত্রে নীল হয়েছে তা ছক তৈরি করে লিখে রাখ। এই ছক থেকে তোমরা বুঝতে পারবে কোন দ্রব্যটি এসিডীয় ও কোনটি ক্ষারকীয়।

একে একে প্রতিটি নির্যাস নিয়ে রং পরিবর্তন ছকে লিখে রাখ। এবার প্রতিটি দ্রব্য নিয়ে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ দিয়ে দেখ কোন দ্রব্যটি অম্লীয় আর কোনটি ক্ষারকীয়। একই ধরনের সকল e¯‘ একই রকম বর্ণ ধারণ করে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম–

- যে mg¯Í পদার্থ পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে তারা হলো অম-বা এসিড।
- অম-নীল লিটমাসকে লাল করে। অম-টক স্বাদযুক্ত হয়।
- ধাতব অক্সাইড ও হাইড্রোক্সাইডmgn হলো ক্ষারক। ক্ষারক লাল লিটমাসকে নীল করে।
- ক্ষার হলো সেই mg¯Í ¶ারক যারা পানিতে `exfZ হয়। ক্ষারকসgn তেতো স্বাদের হয়।
- ‖b‡`kKmgn নিজেদের বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি e¯‘ অম, ক্ষারক না নিরপেক্ষ তা নির্দেশ করে।
- লবণ হলো অম-ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নিরপেক্ষ পদার্থ।
- এসিডের সাথে ধাতব কার্বোনেট বা বাইকার্বোনেটের বিক্রিয়ায় লবণ, পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়।
- এসিডের সাথে ধাতুর বিক্রিয়ায় লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

অনুশীলনী

শণ্যস্থান পরণ কর

ক) G‖mWmgn পানিতে ———— উৎপন্ন করে।

খ) ক্ষার হলো এক ধরনের ক্ষারক যারা ————।

গ) সকল ———— কিন্তু সকল ———— নয়।

ঘ) এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় ———— উৎপন্ন হয়।

ঙ) এন্টাসিড হলো ———— জাতীয় পদার্থ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক) এসিড ও ক্ষারকের মূল পার্থক্য কী?

খ) সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়– একথার ব্যাখ্যা দাও।

গ) চুনের পানিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করলে কী ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তা বিক্রিয়াসহ লেখ।

ঘ) বিশুদ্ধ পানি ও লবণ কি লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

ঙ) নির্দেশক বলতে কী বুঝ?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. টমেটোতে কোন এসিড থাকে?

ক. এসিটিক এসিড খ. অক্সালিক এসিড

গ. ম্যালিক এসিড ঘ. সাইট্রিক এসিড

২. কোন এসিড খাওয়া যায়?

ক. HNO_3 খ. HCl

গ. H_2SO4 ঘ. CH_3COOH

নিচের বাক্যটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

আদিল একদিন জিঙ্ক অক্সাইড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া ঘটালো।

৩. বিক্রিয়াটিতে উৎপন্ন যৌগ হলো-

i. লবণ

ii. ক্ষার

iii. পানি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. কার্বনেটযুক্ত লবণের সাথে দ্বিতীয় যৌগটির বিক্রিয়া ঘটালে কী উৎপন্ন হবে?

ক. H_2 খ. O_2

গ. CO_2 ঘ. H_2CO_3

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফারাহ তৈলাক্ত খাবার খেতে পছন্দ করে। ইদানীং তার পেটে প্রায়ই ব্যথা হয়। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার জানালেন তার এসিডিটি হয়েছে। ডাক্তার তাকে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার পাশাপাশি একটি ঔষধ খেতে পরামর্শ দিলেন।

ক. লবণ কী?

খ. মিল্ক অফ লাইম বলতে কী বুঝায়?

গ. ডাক্তার কী ঔষধ খাওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং কেন দিলেন।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত এসিডিটি তৈরি হওয়ার উপাদানটি কোন ধরনের যৌগ এবং কেন? বিশ্লেষণ কর।

২. মনছুরা খানম মাঝে মাঝে পান খান। তিনি একদিন একটি পাত্রে চুন ভিজিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলেন, পাত্রটি অনেক গরম হয়ে গেছে। তিনি আরও লক্ষ করলেন, পাত্র থেকে চুন নেওয়ার সময় চুনের পানিতে নিঃশ্বাস পড়ায় পানিটা ঘোলা হয়ে গেল।

ক. ক্ষার কী?

খ. চুনের পানি ঘোলা হওয়ার কারণ কী।

গ. মনছুরা খানমের পাত্রে ভিজানো যৌগটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উৎপন্ন ১ম যৌগটি ক্ষার ও ক্ষারক উভয় ধর্মই প্রদর্শন করে বিশ্লেষণ কর।

প্রজেক্ট : বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত নানারকম অম্ল, ক্ষারক ও লবণের তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন কর।

একাদশ অধ্যায়

আলো

আলোক রশ্মি এক স্ব"Q মাধ্যম থেকে অন্য স্ব"Q মাধ্যমে তীর্যকভাবে আপতিত হলে মাধ্যম পরিবর্তনে এর গতিপথের ভিন্নতা দেখা যায়। এটি হলো আলোর প্রতিসরণ। এই অধ্যায়ে আমরা দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত আলোর প্রতিসরণের বিভিন্ন ঘটনা, cY অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এবং এর প্রয়োগ হিসাবে অপটিক্যাল ফাইবারের সাথে পরিচিত হব। এছাড়া ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কাজ, মানব চক্ষু ও ক্যামেরার কার্যক্রম তুলনা নিয়ে আলোচনা করব।

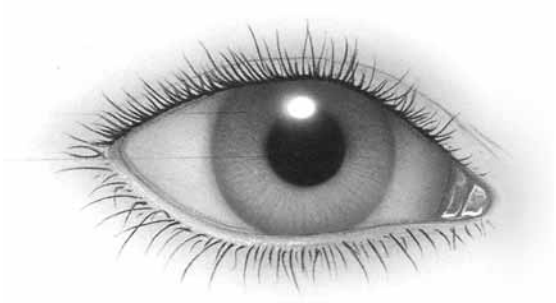

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত প্রতিসরণের ঘটনাগুলো চিত্র অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করতে পার।
- cY অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অপটিক্যাল ফাইবারের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চশমার কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্যামেরা এবং চোখের কার্যক্রম তুলনা করতে পারব।
- আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমে আলোর অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ ১ : আলোর প্রতিসরণ

তুমি কি কখনো কোনো গ্লাসের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার নিজের ছবি দেখার চেষ্টা করেছ? গ্লাস থেকে আলোর প্রতিফলনের ফলে তোমার কি একটা A¯úó প্রতিবিম্ব দেখেছ? এই প্রতিবিম্বটা কি কোনো আয়নার তৈরি তোমার প্রতিবিম্ব থেকে ভিন্ন? এটাকে অনেক বেশি আবছা লাগে কেন বলতে পার? গ্লাস হলো স্ব"Q মাধ্যম। এর অধিকাংশ আলোই এর মধ্য দিয়ে চলে যায়, কেবল খুবই কম অংশ প্রতিফলিত হয় বলেই প্রতিফলিত প্রতিবিম্বটি এতটা আবছা দেখা যায়। তাহলে আলো যখন এক স্ব"Q মাধ্যম থেকে অন্য স্ব"Q মাধ্যমে চলে গেল তখন এর গতিপথ কেমন? চলো আমরা এবার এই m¤ú‡K we¯ÍwiZ জানব। তবে প্রথমে তোমরা নিচের কাজটি করে নাও।

কাজ : আলোর প্রতিসরণের ধারণা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটা পেন্সিল, একটি কাচের গ্লাসে পানি।

পদ্ধতি : একটি কাচের গ্লাসে ৩/৪ অংশ cY করে পানি নাও। এবার বলতে পারবে একটি পেন্সিলকে কিছু অংশ একটু কাত করে পানির ভিতর রাখলে পানির ভিতরে কলমের অংশটুকু কেমন দেখা"Q?

তুমি পানির মধ্যে পেন্সিলটিকে পর্যবেক্ষণ কর। তোমার পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল লেখ। আমরা জানি কোনো e¯‘ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়লেই কেবল ঐ e¯‘‡K দেখতে পারি। তুমি নিশ্চয়ই পেন্সিলটিকে পানির মধ্যে খাটো, মোটা এবং পানির তল বরাবর এটি ভেঙ্গে গেছে বলে মনে করছ|

চিত্র ১১.১ : আলোর প্রতিসরণ

উপরের কাজটির ক্ষেত্রে পানির ভিতরে পেন্সিলের নিচের অংশ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ছে। এর c‡e এটি এক স্ব"Q মাধ্যম পানি থেকে অন্য স্ব"Q বায়ুতে এসে তোমাদের চোখে পড়ছে। দুইটি ভিন্ন মাধ্যমে আলো যদি একই সরল রেখায় চলত তাহলে পেন্সিলটিকে নিশ্চয়ই সোজা দেখাত। কিন্তু তোমরা দেখতে পেলে এটিকে পানির তলে ভেঙ্গে গেছে বলে মনে হ"Q। এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে আলো যখন এক স্ব"Q মাধ্যম থেকে অন্য স্ব"Q মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন এটি তার গতিপথের দিক পরিবর্তন করে। আলোক রশ্মির এই দিক পরিবর্তনই আলোর প্রতিসরণ। একটি নির্দিষ্ট স্ব"Q মাধ্যমে আলো সরল রেখায় চলে কিন্তু অন্য মাধ্যমে প্রবেশের সাথে সাথেই এটি মাধ্যমের ঘনত্ব অনুসারে এর দিক পরিবর্তন করে। এখানে উল্লেখ্য যে লম্বভাবে আলো এক মাধ্যম থেকে ভিন্ন অন্য স্ব"Q মাধ্যমে যাওয়ার সময় এর গতিপথের কোনো দিক পরিবর্তন হয় না।

পাঠ ২ ও ৩ : আলোর প্রতিসরণের নিয়ম

আলোক রশ্মির প্রতিসরণের সময় নিয়মগুলো মেনে চলে। প্রথমেই পরীক্ষাটা করে নাও।

কাজ : কাচ ফলকে আলোর প্রতিসরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : আলপিন, কাচফলক, ড্রইং বোর্ড।

পদ্ধতি : প্রথমেই ড্রইং বোর্ডে একটি সাদা কাগজ আটকিয়ে নাও। কাচফলকটিকে সাদা কাগজের কেন্দ্রে রাখ এবং এর চারদিকে দাগাঙ্কিত কর। এবার কাচফলকটি সরিয়ে নাও এবং একটি আপতিত রশ্মি AB আঁক। মোটামুটি ৫ সে.মি `i‡Z AB রেখার উপর P এবং Q বিন্দুটি দুটো পিন খাড়াভাবে রাখ। কাচফলকটি পুনরায় রাখ এবং পিন যে প্রান্তে রেখেছ তার উল্টো দিক থেকে পিন দুটোকে দেখার চেষ্টা কর (শিক্ষকের নির্দেশনা প্রয়োজন) এবার কাচফলকের অপর প্রান্তে R এবং S বিন্দুতে আরও দুটো পিন খাড়াভাবে রাখ যেন কাচফলকের মধ্য দিয়ে P, Q, R ও S একই লাইনে আছে বলে মনে হয়। R এবং S বিন্দু দুটি চিহ্নিত করে এবং পুনরায় কাচফলক সরিয়ে CD লাইন টান। পাশাপাশি BC প্রতিসরিত রশ্মি, অভিলম্ব MM´ এবং NN´ আঁক। চাঁদা দিয়ে আপতন কোণ ABN, প্রতিসরণ কোণ CBN´ এবং নির্গত কোণ DCM´ চিহ্নিত করে মাপ।

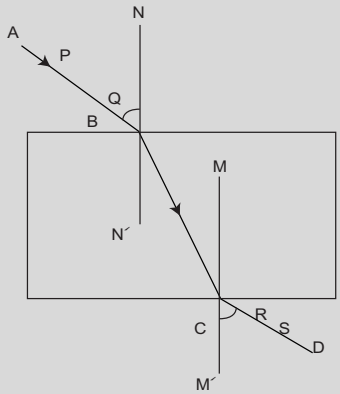

চিত্র ১১.২ : কাচের সাপেক্ষে আলোর প্রতিসরণ

উপরের কাজটি করে তোমরা কী পর্যবেক্ষণ করতে পারছ? এখানে আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যম (বায়ু) থেকে ঘন মাধ্যমে (কাচ) প্রবেশ করেছে। কোণগুলোকে মেপে দেখা যা"Q আপতন কোণ i প্রতিসরণ কোণ r অপেক্ষা বড় এবং আপতন কোণ i ও নির্গত কোণ c সমান। তাহলে তোমরা কী সিদ্ধান্ত নিতে পার :

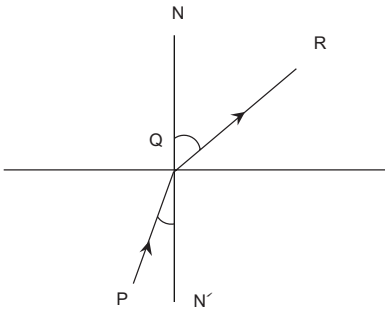

চিত্র ১১.৩ : ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ

- ❑ আলোক রশ্মি যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন এটি অভিলম্বের দিকে সরে আসে। এই ক্ষেত্রে আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা বড় হয়।
- ❑ আলোকরশ্মি প্রথমে একটি মাধ্যম থেকে (যেমন বায়ু) অন্য মাধ্যমে (কাচ) প্রতিসরিত হয় এবং পুনরায় একই মাধ্যমে (বায়ু) নির্গত হলে আপতন কোণ ও নির্গত কোণ সমান হয়।
- ❑ আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমে বিভেদ তলে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে। এছাড়াও উপরের পরীক্ষাটির ন্যায় অনুরূপ পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন এটি অভিলম্ব থেকে `‡i সরে যায়। এই ক্ষেত্রে আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা ছোট হয়। পাশাপাশি আলোক রশ্মি যখন অভিলম্ব বরাবর আপতিত হয় তখন আপতন কোণ, প্রতিসরণ কোণ ও নির্গত কোণের মান kb¨ হয়। এক্ষেত্রে আপতিত রশ্মির দিক পরিবর্তন হয় না।

পাঠ ৪ ও ৫ : প্রতিসরণের বাস্তব প্রয়োগ

তোমরা এখন নিচের কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রতিসরণের ev¯Íe প্রয়োগ দেখতে পাবে।

(১) একটি সোজা লাঠিকে কাত করে পানিতে ডুবালে উপর থেকে তাকালে পানির ভিতর লাঠির অংশটি কেমন দেখাবে। পর্যবেক্ষণ করে দেখ লাঠিটি ছোট বা উপরে দেখা যা"Q বলে মনে হ"Q? আসলে প্রতিসরণের ফলে এমন হ"Q। চিত্র অনুসারে এখানে ঘন মাধ্যমে পানি থেকে আলো প্রতিসরিত হয়ে হালকা মাধ্যমে তোমার চোখে প্রতিফলিত হ"Q। লাঠিটির নিমজ্জিত অংশের প্রতিটি বিন্দু উপরে উঠে আসে। ফলে লাঠিকে খানিকটা উপরে এবং এর ফলে দৈর্ঘ্য কমে আসে এবং মোটা দেখায়।

চিত্র ১১.৪ : আলোর প্রতিসরণ

(২) একটি স্টীলের মগ বা চিনামাটির বাটি নাও। এরপর মগ বা বাটিতে একটি টাকার মুদ্রা রাখ। এখন তোমার চোখকে এমন স্থানে রাখ যেন তুমি মুদ্রাটিকে না দেখতে পাও। এবার অন্য একজনকে ধীরে ধীরে মগ বা পাত্রে পানি ঢালতে বল। কী হবে এবং কেন হবে তা বলতে পারবে? পর্যবেক্ষণ করে দেখবে Av‡¯Í Av‡¯Í তুমি মুদ্রাটিকে দেখতে পাবে। এটি প্রতিসরণের ফলে সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিসরণের ফলে আলো ঘন মাধ্যম পানি থেকে হালকা মাধ্যম বায়ুতে তোমার চোখে প্রতিসরিত হওয়ায় তুমি পয়সার অবাস্তব প্রতিবিম্ব দেখতে পা"Q।

চিত্র ১১.৫ : আলোর প্রতিসরণের ফলে মুদ্রার অবস্থানের পরিবর্তন

(৩) তুমি কি কখনও মাছ শিকার করেছ? সাধারণত পানিতে যে জায়গায় মাছটি দেখা যায় আসলে কি মাছটি ঐ জায়গায় থাকে? মোটেই না? আসলে যে মাছটি আমরা দেখি এটি হলো তার Ae¯Íe প্রতিবিম্ব। প্রকৃতপক্ষে মাছ থাকে আরেকটু `‡i এবং গভীরে। যদি তুমি টেঁটা দিয়ে মাছ মারতে চাও তাহলে এটিকে মারতে হবে আরও নিচে ও `‡i|

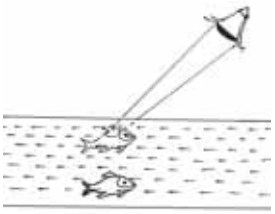

চিত্র ১১.৬ : আলোর প্রতিসরণের ফলে মাছের অবস্থানের পরিবর্তন

(৪) তুমি নিশ্চয়ই বর্ষাকাল দেখেছ যে পুকুর ঘাট পানিতে তলিয়ে যায়। লক্ষ করে দেখবে বর্ষার স্ব"Q পানির জন্য পুকুর ঘাটের সিড়িটা কোথায় দেখা যায়। আসলে এটিকে যেখানে দেখা যায় এটি থাকে তার চেয়ে একটু নিচে। ফলে অনেকেই বুঝতে না পেরে পড়ে যায়। এমন ঘটনাটি আরও দেখতে পাবে তোমাদের কেউ যদি সেন্টমার্টিনের দ্বীপের পাশে অবস্থিত ছেঁড়া দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে থাক। ওখানকার স্ব"Q পানিতে নিচের পাথর ও শৈবাল অনেক কাছে মনে হয়। এটা হয় gjZ আলোর প্রতিসরণের জন্যই।

পাঠ ৬ ও ৭ : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ও সংকট কোণ (ক্রান্তি কোণ)

আলোক রশ্মি যখন ঘন স্ব"Q মাধ্যম থেকে হালকা স্ব"Q মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন প্রতিসরিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। ফলে প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণের চেয়ে বড় হয়। এভাবে আপতন কোণের মান ক্রমশ বাড়তে থাকলে প্রতিসরণ কোণও অনুরূপভাবে বাড়তে থাকে।

কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট দুটি মাধ্যমের জন্য আপতন কোণের কোনো একটি মানের জন্য (এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ৯০° কম) প্রতিসরণ কোণের মান ৯০° হয় অর্থাৎ প্রতিসরিত রশ্মিU বিভেদ তল বরাবর চলে আসে। এ ক্ষেত্রে ঐ আপতন কোণকে আমরা সংকট কোণ বলি। এখন আপতন কোণের মান যদি সংকট কোণের চেয়ে বেশি হয় তখন কী হবে? প্রতিসরণ কোণের মান তো আর ৯০° এর বেশি হতে পারে না?

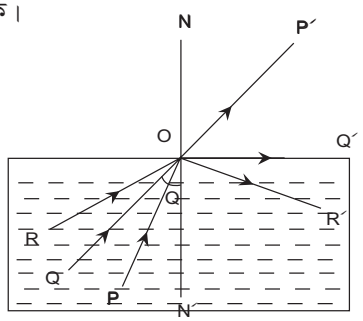

চিত্র ১১.৭ : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ও সংকট কোণ

পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঐ ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি আর প্রতিসরিত না হয়ে বিভেদ তল থেকে একই মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে আসবে। এক্ষেত্রে বিভেদতল প্রতিফলক হিসেবে কাজ করে এবং এই প্রতিফলন সাধারণ প্রতিফলনের নিয়মানুসারে হয়। এই ঘটনাকে cY অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলা হয়। অর্থাৎ ঘন মাধ্যম থেকে আপতিত রশ্মি তখন দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে সাধারণ প্রতিফলনের নিয়মানুসারে m¤úY প্রতিফলিত হয়ে আবার ঘন মাধ্যমেই ফিরে আসবে।

চিত্র অনুসারে PO আপতিত রশ্মির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে ছোট, যার প্রতিসরিত রশ্মি হলো OP´। QO আপতিত রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের সমান। যার প্রতিসরিত রশ্মি হলো QO´ রশ্মি এবং এটি বিভেদ তল বরাবর প্রতিসরিত হয়েছে অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ ৯০°। RO রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড়। এক্ষেত্রে cY অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়েছে OR´ রশ্মিটি প্রতিফলিত রশ্মি।

এখন প্রশ্ন হলো এর সাথে সাধারণ প্রতিফলনের পার্থক্য কোথায়? সাধারণ প্রতিফলনের সময় দেখা যায় আলোর কিছু না কিছু অংশ প্রতিসরিত হয়; কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে দেখা যায় এক্ষেত্রে mg¯Í আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়।

পর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত

১) আলোক রশ্মি কেবলমাত্র ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় এটি ঘটে।

২) ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ অবশ্যই এর মাধ্যম দুটির সংকট কোণের চেয়ে বড় হতে হবে।

পাঠ ৮ : অপটিক্যাল ফাইবার

অপটিক্যাল ফাইবার হলো একটি খুব সরু কাচতন্তু। এটা মানুষের চুলের মতো চিকন এবং নমনীয়। আলোক রশ্মিকে বহনের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। আলোক রশ্মি যখন এই কাচতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে তখন এর দেয়ালে পুনঃপুন cY অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটতে থাকে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে আলোক রশ্মি কাচতন্তুর অপর প্রান্ত দিয়ে বের না হওয়া পর্যন্ত। সাধারণত ডাক্তার মানবদেহের ভিতরের কোনো অংশ (যেমন পাকস্থলী, কোলন দেখার জন্য) যে আলোক নলটি ব্যবহার করে এটি একগু"Q অপটিক্যাল ফাইবারের সমন্বয়ে গঠিত। এছাড়া অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহারের আরেকটি ক্ষেত্র হলো টেলিকমিউনিকেশনস। এতে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করার ফলে একই সাথে অনেকগুলো সংকেত প্রেরণ করা যায়। সংকেত যত দূরই যাক না কেন এর শক্তি হ্রাস পায় না।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস

কোনো উত্তল লেন্সের ফোকাস `i‡Zi মধ্যে কোনো e¯‘‡K ¯'vcb করে লেন্সের অপর পাশ থেকে e¯‘wU‡K †দখলে e¯‘wUi একটি সোজা, বিবর্ধিত ও Aev¯Íe বিম্ব দেখা যায়। এখন এই বিম্ব চোখের যত কাছে গঠিত হবে চোখের বীক্ষণ কোণও তত বড় হবে এবং বিম্বটিকেও বড় দেখাবে। কিন্তু বিম্ব চোখের নিকট বিন্দুর চেয়ে কাছে গঠিত হলে সেই বিম্ব আর ¯úó দেখা যায় না।

সুতরাং বিম্ব যখন চোখের নিকট বিন্দু অর্থাৎ ¯úó দর্শনের নিকটতম দরত্বে গঠিত হয় তখনই তা খালি চোখে সবচেয়ে ¯úó দেখা যায়। ফলে যে mg¯Í লেখা বা e¯‘ চোখে পরিষ্কার দেখা যায় না তা ¯úó ও বড় করে দেখার জন্য স্বল্প ফোকাস `i‡Zi একটি উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়। উপযুক্ত ফ্রেমে আবদ্ধ এই উত্তল লেন্সকে বিবর্ধক কাচ বা পঠন কাচ বা সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। এই যন্ত্রে খুব বেশি বিবর্ধন পাওয়া যায় না।

শিক্ষকের সহায়তায় তোমরা এ ধরনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস দেখতে পার।

চিত্র ১১.৮ : ম্যাগনিফাইং গ্লাস

পাঠ ৯ ও ১০: মানব চক্ষু (Human eye)

চোখ আমাদের cÂBw›`‡qi অন্যতম। চোখ দিয়ে আমরা দেখি। মানব চক্ষুর কার্যপ্রণালি ছবি তোলার ক্যামেরার মতো। চিত্রে মানব চক্ষুর বিশেষ বিশেষ অংশ দেখানো হয়েছে। প্রধান অংশগুলোর বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো (চিত্র ১১.৯)।

(ক) অক্ষিগোলক (**Eye-ball**) **:** চোখের কোটরে অবস্থিত এর গোলাকার অংশকে অক্ষিগোলক বলে। একে চক্ষু কোটরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমার চারদিকে ঘুরানো যায়।

(খ) শ্বেতমন্ডল (Sclera) : এটা অক্ষিগোলকের বাহিরের সাদা, শক্ত ও ঘন আঁশযুক্ত অস্ব"Q আবরণবিশেষ। এটি চক্ষুকে বাহিরের বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট হতে রক্ষা করে এবং চোখের আকৃতি ঠিক রাখে।

চিত্র ১১.৯ : চোখের অভ্যন্তরীণ গঠন

(গ) কর্নিয়া (**Cornea**), **:** শ্বেতমণ্ডলের সামনের অংশকে কর্নিয়া বলে। শ্বেতমণ্ডলের এই অংশ স্ব"Q এবং অন্যান্য অংশ অপেক্ষা বাহিরের দিকে অধিকতর উত্তল।

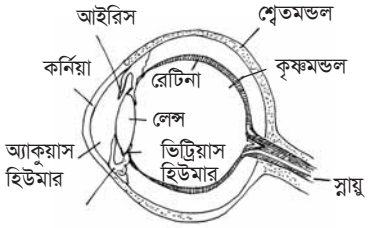

(ঘ) কোরয়েড বা কৃষ্ণমন্ডল (Choroid) : এটি কালো রঙের এক ঝিলি-দ্বারা গঠিত শ্বেতমণ্ডলের ভিতরের গাত্রের A¯"Q¯`bবিশেষ। এই কালো রঙের জন্য চোখের ভিতরে প্রবিষ্ট আলোকের প্রতিফলন হয় না।

(ঙ) আইরিস (Iris) : এটি কর্নিয়ার ঠিক পিছনে অবস্থিত একটি অস্ব"Q পর্দা। পর্দাটি স্থান ও লোকবিশেষে বিভিন্ন রঙের নীল, গাঢ়, বাদামি, কালো ইত্যাদি হয়ে থাকে।

(চ) মণি বা তারারন্ধ্র (Pupil) : এটি কর্নিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মাংসপেশি যুক্ত একটি গোলাকার ছিদ্রপথ। মাংসপেশির সংকোচন ও প্রসারণে তারা রন্ধ্রের আকার পরিবর্তিত হয়।

(ছ) স্ফটিক উত্তল লেন্স (Crystalline Convex lens) : এটি কর্নিয়ার পিছনে অবস্থিত জেলির ন্যায় নরম স্ব"Q পদার্থে তৈরি একটি উত্তল লেন্স।

(জ) অক্ষিপট বা রেটিনা (Retina) : এটি গোলকের পিছনে অবস্থিত একটি CI`"Q গোলাপি আলোকগ্রাহী পর্দা। রেটিনার উপর আলো পড়লে ঐ স্নায়ুতন্ত্রতে এক প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং g¯—‡®‹ দর্শনের Abf¶Z জাগায়।

(ঝ) অ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার (Aqueous hummour and vitreous humour) : লেন্স ও কর্নিয়ার মধ্যবর্তী স্থান এক প্রকার স্ব"Q জলীয় পদার্থে ভর্তি থাকে। একে বলা হয় অ্যাকুয়াস হিউমার। লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী অংশে এক প্রকার জেলি জাতীয় পদার্থে cY থাকে। একে বলা হয় ভিট্রিয়াস হিউমার।

আলোক-চিত্রগ্রাহী ক্যামেরা (Photographic Camera)

এই যন্ত্রে আলোকিত e¯'i চিত্র লেন্সের সাহায্যে আলোক চিত্রগ্রাহীপাতের উপর গ্রহণ করা হয়। এই কারণে যন্ত্রটি আলোক-চিত্রগ্রাহী ক্যামেরা সংক্ষেপে ক্যামেরা নামে পরিচিত। ক্যামেরার বিভিন্ন অংশ হলো : (১) ক্যামেরা বাক্স (২) ক্যামেরা লেন্স (৩) রন্ধ্র বা ডায়াফ্রাম (৪) সাটার (৫) পর্দা (৬) আলোকচিত্রগ্রাহী পেট (৭) ¯'¨vÛ|

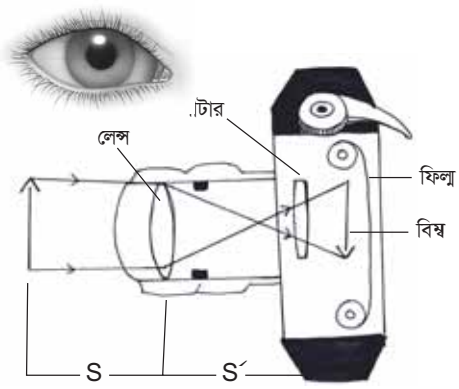

চিত্র ১১.১০ : আলোকচিত্রগ্রাহী ক্যামেরার গঠন

ক্রিয়া (Action) : কোনো e¯'i ফটো তোলার c‡e ক্যামেরায় ঘষা কাচের পর্দাটি বসিয়ে যন্ত্রটিকে j¶¨e¯' PQ এর দিকে ধরে সাটার খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর ক্যামেরা বাক্সের দৈর্ঘ্য কমিয়ে বাড়িয়ে এমন অবস্থায় রাখা হয় যাতে লক্ষ্যe¯'i উল্টা

প্রতিবিম্ব pq পর্দার উপর গঠিত হয়। ডায়াফ্রামের সাহায্যে প্রতিবিম্বটি প্রয়োজনমতো উজ্জ্বল করা হয়। এরপর ঘষা কাচের পর্দা সরিয়ে সাটার বন্ধ করা হয় এবং ঐ স্থানে আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটসহ স্লাইড বসানো হয়। এখন স্লাইডের ঢাকনা সরিয়ে নিয়ে সাটার ও ডায়াফ্রামের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটের উপর আলোক আপতিত হতে দিয়ে পুনরায় ডায়াফ্রেম বন্ধ করা হয়। এই প্রতিক্রিয়াকে এক্সপোজার বা আলোক m¤úvZ (exposure) বলে। এই আপতিত আলোকে আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটের রৌপ্য দ্রবণে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। এইবার স্লাইডের মুখের ঢাকনা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটটিকে স্লাইড হতে বের করে ডেভেলপার (developer) নামক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। প্লেটের যে অংশ সিলভার হ্যালাইডকে ডেভেলপার বিজারণ (reduction) প্রক্রিয়ায় রৌপ্য ধাতবে পরিণত করে। লক্ষ্যe¯‘i যে অংশ যত উজ্জ্বল, প্লেটের সেই অংশে তত রূপা জমা হয় এবং তত বেশি কালো দেখায়। আলোর তীব্রতা ও উন্মোচনকালের উপর রূপার স্তরের পুরত্বের তারতম্য নির্ভর করে। এখন প্লেটটিকে পানিতে ধুয়ে হাইপো (Sodium thiosulphate) নামক দ্রবণে ডুবানো হয়। এতে প্লেটের যে যে অংশে আলোক পড়ে না সেই সকল অংশের সিলভার হ্যালাইড গলে যায়। অতঃপর পরিষ্কার পানি দ্বারা প্লেটটি ধুয়ে ফেলা হয়। এভাবে প্লেটে লক্ষ্যe¯‘i একটি নিগেটিভ চিত্র পাওয়া যায়।

নিগেটিভ হতে প্রকৃত চিত্র অর্থাৎ পজিটিভ মুদ্রিত করার জন্য নিগেটিভের নিচে সিলভার হ্যালাইড দ্রবণের প্রলেপ দেওয়া ফটোগ্রাফের কাগজ স্থাপন করে অল্প সময়ের জন্য নিগেটিভের উপর আলোক m¤úvZ করতে হয়। এরপর c‡ei মতো হাইপোর দ্রবণে ফটোগ্রাফের কাগজ ডুবিয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে পজিটিভ পাওয়া যায়।

ক্যামেরার সাথে মানব চক্ষুর তুলনা

ক্যামেরা	চক্ষু
১) এতে একটি রুদ্ধ আলোক প্রকোষ্ঠ থাকে যার ভিতর দিক কালো রঙে রঞ্জিত। কালো রঙের জন্য ক্যামেরার ভিতর প্রবিষ্ট আলোকের প্রতিফলন হয় না।	১) চোখের অক্ষিগোলকের কৃষ্ণ প্রাচীর রুদ্ধ আলোকে প্রকোষ্ঠের ন্যায় ক্রিয়া করে। এই প্রাচীরের জন্য চোখের ভিতর আলোকের প্রতিফলন হয় না।
২) ক্যামেরার সাটারের সাহায্যে লেন্সের মুখ যে কোনো সময়ের জন্য খোলা রাখা যায়।	২) চোখের পাতার সাহায্যে চক্ষু লেন্সের মুখ যে কোনো সময়ের জন্য খোলা রাখা যায়।
৩) ডায়াফ্রামের বৃত্তাকার ছিদ্র পথ ছোট বড় করে প্রতিবিম্ব গঠনের উপযোগী প্রয়োজনীয় আলোক ক্যামেরায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।	৩) আপতিত আলোকের তীব্রতা ভেদে কর্নিয়ার ছিদ্র পথে আপনা আপনি সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে প্রতিবিম্ব গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আলোক প্রবেশ করতে দেয়।
৪) লেন্সের একটি নির্দিষ্ট ফোকাস `iZ থাকে।	৪) লেন্সের ফোকাস `iZ এর সাথে যুক্ত পেশি বন্ধনীর সাহায্যে পরিবর্তন করা যায়।
৫) এটির অভিসারী লেন্সের সাহায্যে লক্ষ্যe¯‘i প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা যায়।	৫) কর্নিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, চক্ষু লেন্স, ভিট্রিয়াস হিউমার একত্রে একটি অভিসারী লেন্সের ন্যায় ক্রিয়া করে লক্ষ্যe¯‘i প্রতিবিম্ব গঠন করে থাকে।
৬) আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটে লক্ষ্যe¯‘i একটি ev¯Íe, উল্টা ও খাটো প্রতিবিম্ব ফেলা হয়।	৬) আলোক সুবেদী অক্ষিপটে লক্ষ্যe¯‘i ev¯Íe, উল্টা ও খাটো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

নতুন শব্দ : আলোর প্রতিসরণ, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন, সংকট কোণ।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম–

-□□ একটি নির্দিষ্ট স্ব"Q মাধ্যমে আলো সরল রেখায় চলে কিন্তু অন্য মাধ্যমে প্রবেশের সাথে সাথেই মাধ্যমের ঘনত্ব অনুসারে এর দিক পরিবর্তন হয়।

-□□□ লম্বভাবে আলো এক মাধ্যম থেকে ভিন্ন অন্য স্ব"Q মাধ্যমে যাওয়ার সময় এর গতিপথের কোনো দিক পরিবর্তন হয় না।

-□□ আলোক রশ্মি যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন এটি অভিলম্বের দিকে সরে আসে। আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন এটি অভিলম্ব থেকে `‡i সরে যায়।

-□□ cY অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সময় ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ অবশ্যই এর মাধ্যম দুটির সংকট কোণের চেয়ে বড় হতে হবে।

-□□□ মানব চক্ষুর কার্যপ্রণালি আলোক চিত্রগ্রাহী ক্যামেরার মতো।

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ কর

১। ভিন্ন মাধ্যমে আলোক রশ্মির গতিপথের দিক নির্ভর করে মাধ্যমের ———— উপর।

২। অভিলম্ব বরাবর আপতিত আলোক রশ্মি ———— হয়ে নির্গত হয়।

৩। cY অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে ———— কোণ ———— কোণের চেয়ে বড়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আলো ভিন্ন মাধ্যমে গতিপথ পরিবর্তন করে কেন?

২। মরীচিকা কীভাবে সংগঠিত হয়?

৩। সংকট কোণ কী? এটি কখন সৃষ্টি হয়?

৪। মানব চোখ ও ক্যামেরার অমিলগুলো কী কী?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চোখের শ্বেতপ্রাচীরের সামনের অংশকে কী বলে?

ক. লেন্স খ. রেটিনা

গ. কর্নিয়া ঘ. আইরিস

২. অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হয়-

i. জ্বালানি কাজে

ii. পাকস্থলি পর্যবেক্ষণে

iii. টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

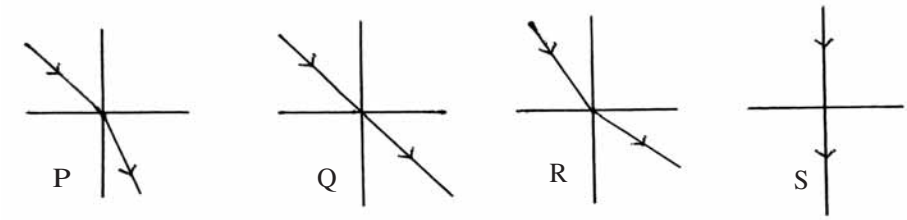

৩. কোন চিত্রে আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করছে?

ক. P খ. Q

গ. R ঘ. S

৪. কোন চিত্রে আপাতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের মান সমান-

ক. P ও R খ. Q ও R

গ. Q ও S ঘ. S ও P

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আনিস একদিন গোসল করতে পুকুর ঘাটে গেল। সে পুকুরের ¯^"Q পানিতে দৃশ্যমান সিঁড়িতে পা রাখল। কিন্তু সিঁড়িটি তার ধারণার চেয়ে নিচে থাকায় সে পড়ে গেল। অন্যদিকে তার ছোট ভাই পুকুরে সুড়কি দিয়ে মাছ ধরতে গেল। কিন্তু সঠিক অবস্থানে সুড়কি নিক্ষেপ না করায় সে মাছ ধরতে ব্যর্থ হলো।

ক. অক্ষিগোলক কাকে বলে?

খ. আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তনের কারণ কী?

গ. পুকুরে আনিসের পড়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করলে আনিসের ছোট ভাইয়ের মাছ শিকার করা সম্ভব হতো? যুক্তিসহ মতামত দাও।

২.

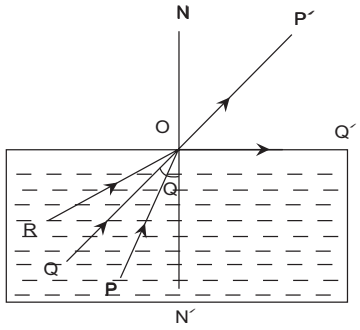

ক. আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে?

খ. অপটিক্যাল ফাইবার বলতে কী বুঝায়?

গ. চিত্রে সংকট কোণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. RO রশ্মির গতিপথ চিত্র এঁকে ব্যাখ্যা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

মহাকাশ ও উপগ্রহ

দিনের বেলা আকাশের দিকে তাকালে আমরা mh‡K দেখতে পাই। রাতের মেঘমুক্ত আকাশ আমাদের বিস্মিত করে। রাতের আকাশে থাকে চাঁদ ও মিটমিট করে জ্বলা অসংখ্য তারা। এদের সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। আমাদের মাথার উপর রয়েছে অনন্ত আকাশ, সীমাহীন ফাঁকা জায়গা বা মহাকাশ। mh, চাঁদ, গ্রহ, তারা, মহাকাশ, ছায়াপথ, গ্যালাক্সি ইত্যাদি দেখা নাদেখা সবকিছুকে নিয়ে মহাবিশ্ব। মহাবিশ্বের সকল কিছুকে বলা হয় নভোমণ্ডলিয় e¯‘ | এই অধ্যায়ে আমরা মহাবিশ্ব নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- মহাকাশ ও মহাবিশ্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উপগ্রহের কক্ষপথে চলার গতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- কৃত্রিম উপগ্রহের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ ১ : মহাকাশ

আমরা আকাশের দিকে তাকালে `i দূরান্তের অনেক e¯‘ দেখতে পাই। দিনের আকাশের সূর্য রাতের আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি আমাদের চোখে পড়ে। আমরা যদি দূরবিক্ষণ দিয়ে আকাশের দিকে তাকাই আরও অনেক কিছু দেখতে পাই। en¯úwZ গ্রহ তার উপগ্রহসহ জ্বলজ্বল করতে থাকে। গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, গ্যালাক্সি ইত্যাদির মাঝখানে যে খালি জায়গা তাকে মহাকাশ বা মহাশূন্য বলে। মহাকাশের দিকে তাকালে আমরা যেসব e¯‘ দেখতে পাই তা হলো পদার্থ, যেমন আমাদের এই পৃথিবী। মহাকাশ কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি নয়। মহাকাশ বলতে পদার্থের অনুপস্থিতি বোঝায়। এটা হলো সে ফাঁকা জায়গা বা AÂj যেখান দিয়ে পৃথিবী, চাঁদ, mh ও তারারা চলাচল করে।

মহাকাশ বা gnwk‡b¨i শুরু কোথা থেকে?

পৃথিবীর মতো এর বায়ুমণ্ডলও মহাকাশে Ni‡Q| এজন্য বায়ুমণ্ডলকে মহাকাশের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। একে পৃথিবীর অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাহলে কোথা থেকে বায়ুমণ্ডলের শেষ এবং মহাকাশের শুরু? অধিকাংশ বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বেশ কাছাকাছি। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে `iZ যত বাড়তে থাকে বায়ুমণ্ডল তত হালকা হতে থাকে এবং ১৬০ কিলোমিটারের পর বায়ুমণ্ডল থাকে না বললেই চলে। অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন যে, পৃথিবী থেকে ১৬০ কিলোমিটার D"PZwq বায়ুমণ্ডলের শেষ এবং মহাকাশের শুরু।

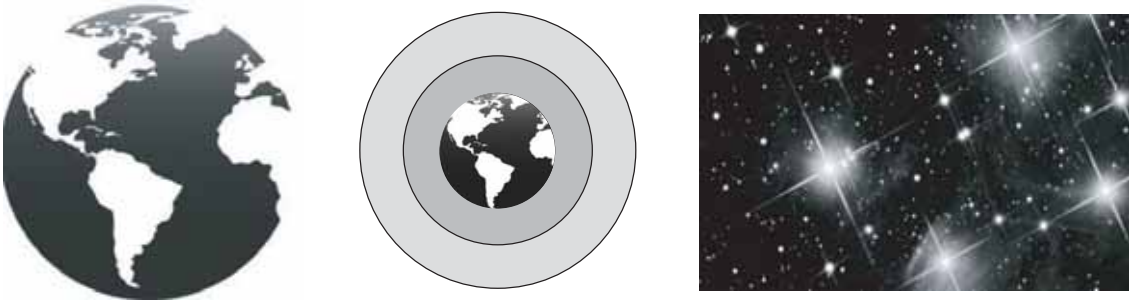

চিত্র ১২.১ : পৃথিবী, বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশ

মহাকাশ কত `i পর্যন্ত we¯ÍZ? মহাকাশের কি কোনো সীমা আছে? এক সময় মানুষ ভাবত, মহাকাশের সীমা আছে। তারা ভাবত যে, যত `i পর্যন্ত সবচেয়ে `‡ii e¯‘wU তারা দেখতে পায়, সে পর্যন্তই মহাকাশ we¯ÍZ এবং মহাকাশ বক্রাকৃতির। পরবর্তীতে `iwe¶Y যন্ত্র আবিষ্কারের পর তার দৃষ্টিসীমার বাইরের অনেক গ্রহ, নক্ষত্র, ag‡KZ ও গ্যালাক্সি দেখতে পেল। তারা সিদ্ধান্তে এলো যে, মহাকাশের কোনো শেষ নেই।

কাজ : বিভিন্ন বই ও ম্যাগাজিন থেকে জেনে নাও মহাকাশ কী? মহাকাশে কী কী আছে? সবকিছু তোমার খাতায় নোট কর। অন্য বন্ধুদের সংগৃহীত তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখ। কোনো অমিল পাওয়া গেলে তা শিক্ষকের উপস্থিতিতে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

পাঠ ২ : মহাবিশ্ব

মহাবিশ্ব কী?

যা কিছু আছে তার সবকিছু নিয়েই মহাবিশ্ব। ক্ষুদ্র পোকামাকড় ও awjKYv থেকে শুরু করে আমাদের এই পৃথিবী, দূর-দূরান্তের গ্রহ-নক্ষত্র, ধূমকেতু, গ্যালাক্সি এবং দেখা না দেখা সবকিছু নিয়েই মহাবিশ্ব। মহাবিশ্ব যে কত বড় তা কেউ জানে না। কেউ জানে না মহাবিশ্বের আকার বা আকৃতি কেমন? অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ নেই। কেউ কেউ এখনো বিশ্বাস করেন মহাবিশ্বের আকার ও আকৃতি আছে। মানুষ প্রতিনিয়তই মহাবিশ্ব m¤ú‡K নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করছে। তবু, এর অনেক কিছুই এখনো অজানা রয়ে গেছে। এই অজানা হয়তো চিরকালই থাকবে।

অনেক কিছু অজানা থাকলেও বিজ্ঞানীরা এটা জানতে পেরেছেন যে, মহাবিশ্বের অনেককিছুই মহাকাশ নামক সীমাহীন ফাঁকা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মহাবিশ্বের কোনো কোনো অংশে এসব e¯‘ বা পদার্থের উপস্থিতি অন্য অংশের চেয়ে বেশি। যেসব অংশে পদার্থ বা e¯‘ বেশি জড়ো বা NbxfZ হয়েছে তাদের বলা হয় M¨vjw· বা নক্ষত্রজগৎ। গ্যালাক্সি হলো গ্রহ ও নক্ষত্রের এক বৃহৎ দল। আমাদের evmfwg পৃথিবী যে গ্যালাক্সিতে অবস্থিত তার নাম ছায়াপথ। এরকম কোটি কোটি গ্যালাক্সি রয়েছে মহাবিশ্বে, যেখানে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র।

গ্যালাক্সিগুলো মহাকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়, ঠিক যেন বায়ুমন্ডলে উড়ে বেড়ানো মৌমাছির ঝাঁকের মতো। মহাকাশের সীমাহীনতার তুলনায় M¨vjw· নক্ষত্রগুলোকে খুব কাছাকাছি মনে হয় কিন্তু, আসলে তা নয়। এরা ci¯úi থেকে অনেক `‡i| এদের মধ্যকার `iZ m¤ú‡K তোমাদের একটু ধারণা দেওয়া যাক। আমরা জানি যে, আলো এক সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ যেতে পারে। পৃথিবী ও m‡hi `iZ প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার, mh থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিটের একটু বেশি প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। কিন্তু mh থেকে এর সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্র আলফা সেন্টোরিতে আলো পৌঁছাতে সময় লাগে ৪ বছরের চেয়ে বেশি। এক `ieZx নক্ষত্র থেকে অন্য `ieZx নক্ষত্রে আলোর পৌঁছাতে সময় লাগে কয়েক মিলিয়ন বছর। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ নক্ষত্রগুলোর মধ্যবর্তী `iZ কত বেশি আর মহাবিশ্ব কত বিশাল।

সৌরজগৎ ছায়াপথ নামক গ্যালাক্সির অন্তর্গত। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলোকে দপ্‌দপ্‌ বা মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলতে দেখা যায়। নক্ষত্রগুলো প্রত্যেকে এক একটি জ্বলন্ত গ্যাসপিন্ড বলে এদের সবারই আলো ও উত্তাপ আছে। মহাবিশ্বের নক্ষত্রগুলোকে তাদের আলোর তীব্রতা অনুসারে লাল, নীল, হলুদ এই তিন বর্ণে ভাগ করা হয়েছে। অতি বৃহৎ নক্ষত্রের রং লাল, মাঝারি নক্ষত্রের রং হলুদ এবং ছোট নক্ষত্রের রং নীল হয়ে থাকে।

মহাবিশ্বের উৎপত্তি হলো কীভাবে?

মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত যেসব তত্ত্ব আছে তার মধ্যে বহুল প্রচলিত হলো 'বিগব্যাঙ তত্ত্ব'। বাংলায় একে বলা হয় 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব'। এই তত্ত্বের মতে মহাবিশ্ব একসময় অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ঘনরূপে বা ঘন অবস্থায় ছিল যা অতি দ্রুত প্রসারিত হ"Qল। দ্রুত প্রসারণের ফলে মহাবিশ্ব ঠান্ডা হয়ে যায় এবং বর্তমান প্রসারণশীল অবস্থায় পৌঁছায়। অতি m¤úwZ জানা গেছে যে, বিগব্যাঙ বা মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছিল প্রায় ১৩.৭৫ বিলিয়ন বছর (১৩৭৫ কোটি বছর) c‡e এবং এটাই মহাবিশ্বের বয়স। বিগব্যাঙ তত্ত্ব একটি বহু পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যা বেশিরভাগ বিজ্ঞানী গ্রহণ করেছেন। এর কারণ, জ্যোতির্বিদদের পর্যবেক্ষিত প্রায় সকল ঘটনাই এই তত্ত্ব সঠিক ও ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। বর্তমান কালের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এই তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দেন এবং পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

পাঠ ৩ : প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক উপগ্রহ

চিত্র ১২.২ : সৌরজগৎ

আমরা আগেই বলেছি যে গ্যালাক্সিতে আমরা বাস করি তার নাম ছায়াপথ। এই ছায়াপথে রয়েছে mh ও এর পরিবার যাকে সৌরজগৎ বলা হয়। সৌরজগতে রয়েছে mh ও একে ঘিরে আবর্তনশীল ৮টি গ্রহ। যেসব e¯' m‡hi চারদিকে ঘোরে তাদের বলা হয় গ্রহ। mh‡K ঘিরে আবর্তনশীল আটটি গ্রহ হলো বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, en¯úwZ, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন।

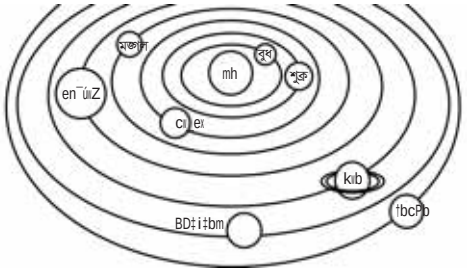

কোনো কোনো গ্রহের রয়েছে একাধিক উপগ্রহ। যারা গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘোরে এদের বলা হয় উপগ্রহ। যেমন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে চাঁদ তাই চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। সুতরাং, পৃথিবী m‡hi একটি গ্রহ এবং চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। নিচের কাজটি কর তাহলে গ্রহ ও উপগ্রহের গতি বুঝতে পারবে।

কাজ : গ্রহ ও উপগ্রহের আবর্তন সম্পর্কে জানা

পদ্ধতি : শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে একটি ফাঁকা জায়গায় যাও। তোমার কোনো বন্ধুকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াতে বল। তাকে কেন্দ্র করে একটি বড় বৃত্ত আঁক। এই বৃত্তের রেখার উপর তুমি দাঁড়াও। এবার তোমার অন্য কোনো বন্ধুকে তোমাকে কেন্দ্র করে একটি ছোট বৃত্ত আঁকতে বলো। তোমার বন্ধুকে এই বৃত্ত পথে তোমার চারদিকে ঘুরতে বল। এখন তুমি তোমাকে ঘিরে আবর্তনকারী বন্ধুসহ প্রথম বন্ধুর চারদিকে বড় বৃত্তপথে ঘুরতে থাক। এখানে তোমার প্রথম বন্ধু হলো mh, তুমি হলে পৃথিবী আর তোমার দ্বিতীয় বন্ধু হলো চাঁদ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা নক্ষত্রের জন্মের সময় একেকটি গ্রহকে ঘিরে কয়েকটি মহাজাগতিক মেঘ আবর্তিত হত। এরা নক্ষত্রের আকর্ষণে NbfZ হয়ে অবশেষে জমাট বেঁধে গ্রহদের জন্ম হয়। এভাবেই আবার গ্রহদের চারপাশে জমা মহাজাগতিক মেঘ থেকেই উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এসব উপগ্রহ হলো প্রাকৃতিক উপগ্রহ।

গ্রহ ও উপগ্রহের কোনো আলো ও উত্তাপ নেই। এদের উপর m‡hi আলো পড়ে তা প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীর ১টি, মঙ্গলের ২টি, en¯úwZi ৬৩টি, শনির ৩৪টি, ইউরেনাসের ২৭টি এবং নেপচুনের ১৩টি উপগ্রহ আছে। এরা এদের গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে গ্রহের চারদিকে ঘোরে।

পাঠ ৪ : কৃত্রিম উপগ্রহ ও এর ইতিহাস

মানুষের পাঠানো যেসব e¯' বা মহাকাশযান পৃথিবীকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে তাদের বলা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ। রকেটের সাহায্যে এদের উৎক্ষেপণ করা হয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টানের প্রভাবে চাঁদের মতো এরা এদের কক্ষপথে ঘোরে। কৃত্রিম উপগ্রহ চাঁদের তুলনায় অনেক ছোট এবং চাঁদের তুলনায় অনেক নিচু দিয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরার জন্য এদের প্রয়োজনীয় দ্রুতি থাকতে হয়। পৃথিবী থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের D"PZv যত বেশি হবে তার দ্রুতি হবে তত কম। ফলে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে এরা বেশি সময় নেবে। আমরা জানি পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় এর নিজ অক্ষের চারদিকে একবার পাঁক খায়। সুতরাং, কোনো কৃত্রিম উপগ্রহ যদি ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসে তাহলে একে পৃথিবী থেকে স্থির বলে মনে হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশ যাত্রার ইতিহাস খুব একটা পুরোনো নয়, একেবারেই নতুন। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, মহাকাশযাত্রার প্রথম পদক্ষেপটির mPbv হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। এই যাত্রার mPbv করে তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন। তারা ¯úUvbK-১ নামক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে। ¯úUvbK শব্দের অর্থ হলো ভ্রমণসঙ্গী। একই বছর ২রা নভেম্বর ¯úUvbK-২ নামক আরেকটি কৃত্রিম উপগ্রহ তারা মহাকাশে পাঠান। প্রথম মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের নাম এক্সপ্লোরার-১। এই উপগ্রহ ১৯৫৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মহাকাশে পাঠানো হয়। ভস্টক-১ নামক সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষ নিয়ে প্রথম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। যে মানুষটি প্রথম মহাকাশে গিয়েছিলেন তার নাম সোভিয়েট ইউনিয়নের ইউরি গ্যাগারিন। তিনি ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল ভস্টক-১ কৃত্রিম উপগ্রহে চড়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। স্টক-৬ নামক কৃত্রিম উপগ্রহে (মহাকাশযান) চড়ে প্রথম সোভিয়েট মহিলা মহাকাশচারি ভেলেনটিনা তেরেসকোভা মহাকাশে ঘুরে আসেন ১৯৬৩ সালে। ইনটেলসেট-১ কৃত্রিম উপগ্রহকে পাঠানো হয় বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য যোগাযোগ উপগ্রহ হিসেবে। রিমোটসেনসিং বা দূর অনুধাবনের জন্য পাঠানো প্রথম উপগ্রহ হলো ল্যান্ডসেট-১। একে পাঠানো হয় ১৯৭২ সালে। আন্তর্জাতিক †hvMmÎ স্থাপনের জন্য অ্যাপোলো-সয়োজ টেস্ট প্রজেক্ট নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রথম পাঠানো হয় ১৯৭৫ সালে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এ পর্যন্ত প্রায় হাজার হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে। কয়েক শত কৃত্রিম উপগ্রহ বর্তমানে ব্যবহার করা n‡"Q এবং হাজার হাজার অব্যবহৃত কৃত্রিম উপগ্রহ বা তাদের অংশবিশেষ মহাকাশ ধ্বংসাবশেষ হিসেবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

পাঠ ৫ : কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথে চলা বা ভ্রমণ

পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার জন্য কেন্দ্রমুখি বল বা টানের প্রয়োজন হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল বা অভিকর্ষ বলই এই কেন্দ্রমুখি বল জোগায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, যদি পৃথিবীর প্রায় ২৫০ কিলোমিটার উপরে তুলে পৃথিবী পৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৮ কিলোমিটার বেগ দেওয়া যায় তবে কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে। কিন্তু এত উপরে তুলে কোনো e¯‘‡K এত বেশি বেগ দেওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ, evq¯Í‡ii সাথে তীব্র সংঘর্ষে এত তাপ উৎপন্ন হবে যে, e¯ÍvU পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তিনটি রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে নির্দিষ্ট D"PZvq তুলে পরে fc‡ôi সমান্তরালে বেগ দেওয়া হয়। তখন কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে থাকে।

কৃত্রিম উপগ্রহ কীভাবে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তা জানতে নিচের কাজটি কর।

কাজ : পৃথিবীর চারদিকে কৃত্রিম উপগ্রহের আবর্তন m¤ú‡K জানা

পদ্ধতি : একটি টেনিস বলকে প্রায় ১ মিটার লম্বা একটি সুতার এক মাথায় শক্ত করে বাঁধ। এবার সুতার অপর মাথা এক হাতে শক্ত করে ধরে অপর হাতে বলটি fc‡ôi সমান্তরালে ছুড়ে দাও। দেখবে বলটি সামনের দিকে সামান্য গিয়ে বৃত্তাকার পথে যেতে চাইছে। সুতার মাথা ধরে বলটি ঘুরালে বলটি সুতার টানে বৃত্তাকার পথে ঘুরবে। এখানে তুমি হলে পৃথিবী, বল হলো কৃত্রিম উপগ্রহ এবং সুতার টান হলো অভিকর্ষ বল। বৃত্তাকার পথটি হলো কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ।

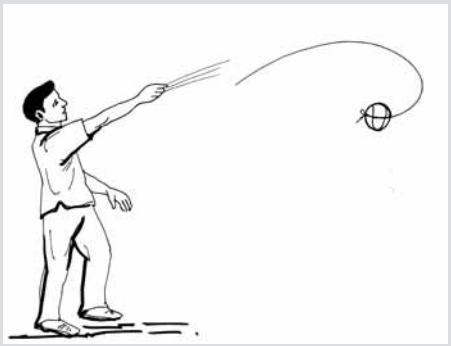

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ উৎক্ষেপণের পর কৃত্রিম উপগ্রহ কেন পৃথিবীর চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে।

পাঠ ৬ ও ৭ : কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার ও গুরুত্ব

কৃত্রিম উপগ্রহ নানান রকম কাজে ব্যবহার করা হয়। এদের ব্যবহার অনুসারে এদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন-

ক। যোগাযোগ উপগ্রহ

খ। আবহাওয়া উপগ্রহ

গ। পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ

ঘ। সামরিক বা গোয়েন্দা উপগ্রহ

ঙ। নৌপরিবহন উপগ্রহ

চ। জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক উপগ্রহ

যোগাযোগ উপগ্রহ

আমরা অনেকে ইংল্যান্ড, আমেরিকা বা অন্য যে কোনো দেশে আত্মীয়-স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলে থাকি। আমরা যখন টেলিফোনে অন্য দেশের কারো সাথে কথা বলি, তখন আমাদের দেশের কোনো ডিশ এরিয়েল থেকে একটি বেতার সঙ্কেত কৃত্রিম উপগ্রহে প্রেরিত হয়। উপগ্রহটি সঙ্কেতটিকে অপর দেশের কোনো একটি ডিশ এরিয়েলে পাঠিয়ে দেয়, সেখান থেকে যার সাথে কথা বলছি তার টেলিফোনে পৌঁছায়।

এছাড়া আমরা বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ বা Awj¤úK গেইম টেলিভিশনে দেখে থাকি। অন্যদেশ থেকে একইভাবে বেতার সঙ্কেত কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আমাদের টেলিভিশনে পৌঁছায়। যে দেশে খেলা n‡"Q সে দেশ থেকে ডিশ এরিয়েলের মাধ্যমে একটি সঙ্কেত উপগ্রহে পাঠানো হয়। উপগ্রহ সঙ্কেতটি পুনরায় আমাদের দেশের কোনো ডিশএরিয়েলে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে আমাদের টেলিভিশনে পৌঁছে। কৃত্রিম উপগ্রহ এখানে রিলে স্টেশনের কাজ করে। এই উপগ্রহ টেলিভিশন প্রোগ্রাম ও টেলিফোন সংবাদ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে বয়ে নিয়ে যায়। এর নাম তাই যোগাযোগ উপগ্রহ।

আবহাওয়া উপগ্রহ

আমরা টেলিভিশন ও রেডিওতে আবহাওয়ার খবর শুনি এবং পত্রিকায় আবহাওয়ার খবর পড়ি। এসব মাধ্যম আবহাওয়ার এই cevfwm কোথা থেকে পায়? আবহাওয়া উপগ্রহ আবহাওয়ার cevfwm`vbKvix ব্যক্তিদের জানিয়ে দেয় ঐ দিনের বা পরবর্তী কয়েক দিনের আবহাওয়া কেমন হবে? কোথায় মেঘ সৃষ্টি n‡"Q? কোন দিকে মেঘ hv‡"Q? কোথায় কখন বৃষ্টি হতে পারে? আবহাওয়া উপগ্রহ এসব দেখতে পায়। এই উপগ্রহ বায়ু প্রবাহ, সাইক্লোন সৃষ্টি হওয়া, কোথায় ঘনীভূত n‡"Q, কোন দিকে আঘাত হানতে পারে তার সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে cevfwm দিতে পারে। এজন্য এই উপগ্রহের নাম আবহাওয়া উপগ্রহ।

পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ

এই উপগ্রহ পৃথিবীপৃষ্ঠের m¯úó চিত্র দিতে পারে। সমুদ্রে কোথায় কোন জাহাজ থেকে তেল চুইয়ে পরিবেশ `IY করছে? কোন শহরের বায়ু `wIZ ও ময়লা, এই উপগ্রহের সাহায্যে ছবি তুলে জানা যেতে পারে। কোন মাঠে ফসল ভালো n‡"Q, কোনো ফসলে রোগ-বালাই বা পোকা-মাকড় আক্রমণ করেছে কি না, তা জানতে তথ্য ও ছবি এই উপগ্রহ পাঠাতে পারে।

বনে কোথায় আগুন লেগেছে, কোনো জাহাজের যাত্রাপথে হিমবাহ আছে তা জানতে এই উপগ্রহ সহায়তা করতে পারে। মাটি, পানি ও বায়ু `IY নির্ণয়ের জন্যও এই উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়।

সামরিক বা গোয়েন্দা উপগ্রহ

গোয়েন্দার কাজ করার জন্য সামরিক বাহিনীতে এই উপগ্রহ ব্যবহার করা হয় তাই এর নাম গোয়েন্দা উপগ্রহ। প্রতিপক্ষ যোদ্ধারা কোথায় লুকিয়ে আছে, গোপনে তারা কোনো অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে কি না, কোনো গোপন আক্রমণ হচ্ছে কি না ইত্যাদি খবর সংগ্রহের জন্য এই উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়।

নৌপরিবহন উপগ্রহ

আমরা গাড়ি, বিমান বা জাহাজে ভ্রমণ করে থাকি। বিশাল সমুদ্রে জাহাজ কী করে এর অবস্থান নির্ণয় করে? কোন বিমান আকাশে কোথায় আছে তা কী করে জানে? এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাবার সময় কী করে বুঝতে পারে কোথায় আছে? গাড়ি, সামুদ্রিক জাহাজ ও বিমান এদের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য নৌপরিবহন উপগ্রহের সহায়তা নিয়ে থাকে।

জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক উপগ্রহ

এই উপগ্রহে রাখা টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণযন্ত্র মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিভিন্ন অজানা তথ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দিয়ে থাকে।

নতুন শব্দ

মহাকাশ, মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সি, ছায়াপথ, সৌরজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ ও কৃত্রিম উপগ্রহ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম–

- গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, গ্যালাক্সি ইত্যাদির মাঝখানে যে খালি জায়গা তাকে মহাকাশ বা gnvkb¨ বলে। মহাকাশ কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি নয়।
- mh, চাঁদ, গ্রহ, তারা, মহাকাশ, ছায়াপথ, গ্যালাক্সি ইত্যাদি দেখা নাদেখা সবকিছুকে নিয়ে মহাবিশ্ব।
- মহাবিশ্বের যেসব অংশে পদার্থ বা e¯‘ বেশি জড়ো বা ঘনীভূত হয়েছে তাদের বলা হয় গ্যালাক্সি ।
- যে গ্যালাক্সিতে আমরা বাস করি তার নাম ছায়াপথ। এই ছায়াপথেই রয়েছে সৌরজগৎ ।
- mh একটি নক্ষত্র। m‡hi রয়েছে আটটি গ্রহ। এরা হলো- বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, en¯úwZ, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন।
- নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে যারা ঘোরে তাদের বলা হয় গ্রহ। গ্রহকে কেন্দ্র করে যারা ঘোরে তাদের বলা হয় উপগ্রহ।
- মানুষের পাঠানো যেসব মহাকাশযান পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে তাদের বলা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ।
- কাজ অনুসারে কৃত্রিম উপগ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে যেমন যোগাযোগ উপগ্রহ, আবহাওয়া উপগ্রহ, পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ, সামরিক বা গোয়েন্দা উপগ্রহ, নৌপরিবহন উপগ্রহ, জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক উপগ্রহ।

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ কর

১. মহাবিশ্বের অসীম ফাঁকা স্থানকে ———বলে।

২. গ্রহকে আবর্তনকারী e¯‘‡`i বলা হয়——— ।

৩. সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সিতে রয়েছে তার নাম ———।

৪. মানুষের তৈরি ———হলো কৃত্রিম উপগ্রহ।

৫. যে মহিলা প্রথম ———ভ্রমণ করেছেন তার নাম ভেলেনটিনা তেরেসকোভা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মহাকাশ ও gnvk‡b¨i মধ্যে পার্থক্য কী?

২. উপগ্রহ মানুষের অনেক কাজে লাগে– ব্যাখ্যা কর।

৩. গ্যালাক্সি কী? আমরা কোন গ্যালাক্সিতে বাস করি?

৪. মহাবিশ্বের বিশালতা ব্যাখ্যা কর।

৫. কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে কেন ঘোরে?

৬. সৌরজগৎ কাকে বলে? এখানে কী কী গ্রহ আছে?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বৃহস্পতি গ্রহের কয়টি উপগ্রহ?

ক. ১৩টি　　খ. ২৭টি

গ. ৩৪টি　　ঘ. ৬৩টি

২. গ্যালাক্সি হলো-

i. মহাবিশ্বের কোন ¯'ানে ঘনীভূত পদার্থের আধিক্য

ii. গ্রহ, নক্ষত্রের মাঝে অব¯'ত খালি জায়গা

iii. নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণকারী জ্যোতিষ্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও iii　　ঘ. ii ও iii

নিচের ছকটি অবলম্বনে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

কৃত্রিম উপগ্রহ	কাজ
M	জাহাজের যাত্রাপথে হিমবাহের উপ¯'তি নির্ণয়
N	আকাশে বিমানের অব¯'ান নির্ণয়
O	মহাবিশ্ব সম্পর্কে অজানা তথ্য নির্ণয়
P	ফসলে পোকামাকড়ের আক্রমণের তথ্য ও ছবি সংগ্রহ

৩. N উপগ্রহটি কী?

ক. যোগাযোগ উপগ্রহ
খ. নৌ পরিবহন উপগ্রহ
গ. জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উপগ্রহ
ঘ. পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ

৪. ছকে উল্লিখিত কাজের ভিত্তিতে কোন দুটি উপগ্রহ একই প্রকৃতির?

ক. M ও N
খ. N ও O
গ. O ও P
ঘ. M ও P

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মাছ ধরার নৌকার মালিক বকর সওদাগর রেডিওতে শুনতে পেলেন বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে ঘূর্ণিঝড় ঘনীভূত হ"Q। যে কোনো সময় উপকূলে আঘাত হানতে পারে। কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে তিন নম্বর বিপদ সঙ্কেত দেখাতে বলা হয়েছে এবং মাছ ধরার নৌকাকে উপকূলের কাছাকাছি থাকতে বলা হয়েছে।

ক. কৃত্রিম উপগ্রহ কাকে বলে?
খ. মহাবিশ্ব বলতে কি বুঝায়?
গ. রেডিও অফিস ঘূর্ণিঝড় ঘনীভূত হওয়ার তথ্য কোথা থেকে পেল? এ তথ্য পাওয়াতে বকর সওদাগরের কী উপকার হলো?
ঘ. আবহাওয়া বার্তাটি বকর সওদাগর ও উপকূলবাসীদের কীভাবে সতর্ক করতে পারে। ব্যাখ্যা কর।

২.

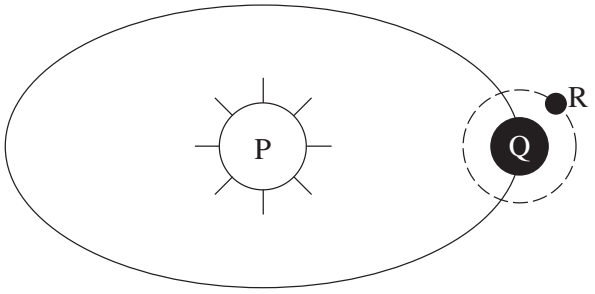

ক. মহাশূন্য কাকে বলে?
খ. চাঁদ ও কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।
গ. P কোন ধরনের জ্যোতিষ্ক? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. P, Q ও R m¤ú‡K তুলনামূলক আলোচনা কর।

প্রজেক্ট : সৌরজগতের একটি মডেল তৈরি কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

খাদ্য ও পুষ্টি

বর্তমানে পৃথিবীতে বাস করছে লাখ লাখ বিভিন্ন জাতের প্রাণী। এদের আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য যেমন ভিন্নতর তেমন বিচিত্র এদের জীবনধারা, স্বভাব, খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি। দেহের বৃদ্ধি, শক্তি ও বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি প্রাণীর খাদ্য অপরিহার্য। অতএব মানবদেহকে সু¯'-সবল রাখার জন্যও খাদ্য অপরিহার্য। খাদ্য ও পুষ্টি m¤ú‡K যথেষ্ট ধারণা অর্জন করা দেহকে সু¯' রাখার cekZ| আমিষ, শর্করা, তেল ও চর্বি ইত্যাদি জৈব-যৌগ আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি। আর এ সকল খাদ্য থেকে পুষ্টি পাই। খাদ্য বলতে সেই সকল জৈব উপাদানকে বুঝায় যেগুলো জীবের দেহ গঠন, ¶qciY ও শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। আর এ খাদ্য থেকে জীব পুষ্টি লাভ করে।

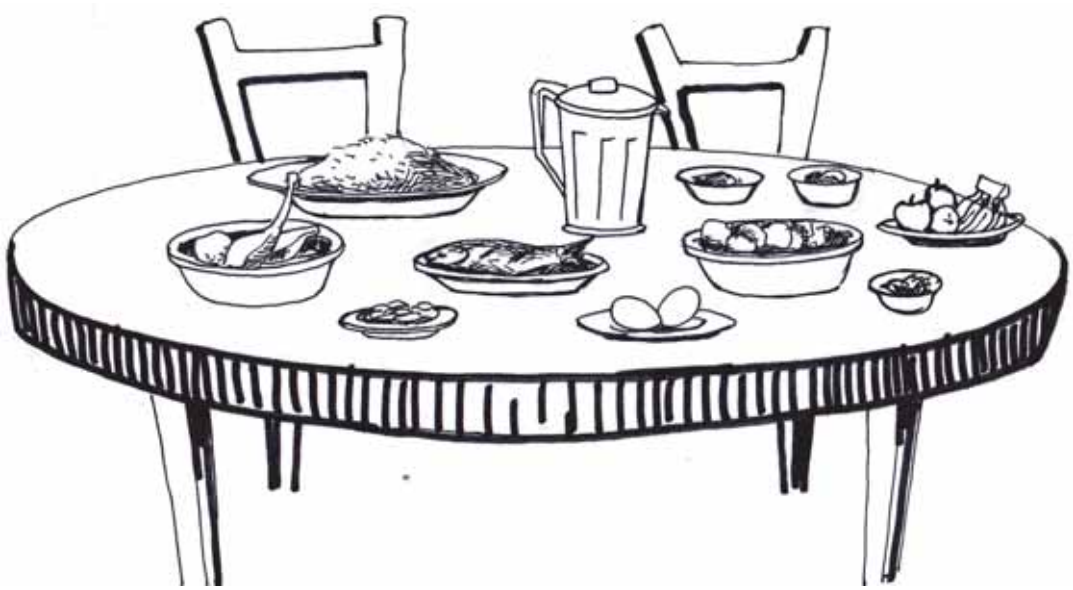

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগুণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুষ্টির অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচনে সক্ষম হব।

পাঠ ১

ইঞ্জিন চালানোর জন্য কয়লা, ডিজেল, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি উপাদান ব্যবহার করা হয়। বলতে পার এ জ্বালানিগুলোর কাজ কী? এ জ্বালানিগুলো পুড়ে শক্তি উৎপন্ন করে। আর এ শক্তি যানবাহনগুলোকে গতি দান করে। যানবাহনগুলো চলতে থাকে। মানবদেহকে একটি ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করা হয়। অন্যান্য ইঞ্জিনের মতো আমাদের দেহ নামক ইঞ্জিনটি চালানোর জন্য চাই শক্তি। মানবদেহ এ শক্তি কোথা থেকে পায়? খাদ্য আমাদের দেহের পুষ্টি চাহিদা ciY করে ও শক্তি যোগায়।

খাদ্যের gj উৎস সজীব দেহ। খাদ্য gjZ বিভিন্ন যৌগের সমন্বয়ে গঠিত। আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে gjZ খাদ্য পাই। খাদ্য বলতে সেই জৈব উপাদানকে বুঝায় যা জীবের দেহগঠন, শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যের মধ্যে যে সকল উপাদান বা পুষ্টিদ্রব্য থাকে তা আমাদের দেহে gL¨Z তিনটি কাজ করে। যথা–

- জীবের বৃদ্ধি সাধন, ¶qciY ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- তাপশক্তি ও কর্মশক্তি প্রদান।
- রোগ প্রতিরোধ, সুস্থতা বিধান ও শারীরবৃত্তীয় কাজ (যেমন : পরিপাক, শ্বসন, রেচন ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে।

পুষ্টি ও পুষ্টিমান

পুষ্টি একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াতে Lv`¨e¯' খাওয়ার পরে পরিপাক হয় এবং জটিল খাদ্য উপাদানগুলো ভেঙ্গে সরল উপাদানে পরিণত হয়। এসব সরল উপাদান দেহ শোষণ করে নেয়। শোষণের পরে খাদ্য উপাদানগুলো দেহের সকল অঙ্গের ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের পুনর্গঠন ও দেহের বৃদ্ধির জন্য নতুন কোষ গঠন করে। তাছাড়া তাপ উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুষ্টি যোগায়। দেহে খাদ্যের এই সকল কাজই পুষ্টি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত । অর্থাৎ পুষ্টি উপাদান n‡"Q প্রতিদিনের খাবারের ¸Ym¤úb সেসব উপাদান যা দেহের শক্তি ও যথাযথ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে, মেধা ও বুদ্ধি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ করে, অসুখ-বিসুখ থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে এবং মানুষকে কর্মক্ষম করে।

কোন খাদ্যে কী পরিমাণ ও কত রকম খাদ্য উপাদান থাকে তার উপর নির্ভর করে ঐ খাদ্যের পুষ্টিমান বা cy®ógj¨| যেমন- সেদ্ধ চালে ৭৯% শ্বেতসার, ৬% স্নেহ পদার্থ থাকে। এছাড়া সামান্য পরিমাণ আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। ১০০ গ্রাম চাল থেকে ৩৪৫-৩৪৯ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। সেদ্ধ চালে শ্বেতসার, আমিষ, ভিটামিন থাকে। কিন্তু এতে শ্বেতসারের পরিমাণ বেশি থাকে। অতএব চাল একটি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ।

কোনো খাদ্য উপাদানের পুষ্টিগুণ m¤ú‡K জানতে হলে ঐ খাদ্যের প্রকৃতি m¤ú‡K জানা প্রয়োজন। খাদ্যের প্রকৃতি বলতে এটা কি মিশ্র খাদ্য, নাকি বিশুদ্ধ খাদ্য তাকে বুঝায়। মিশ্র খাদ্যে একের অধিক পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। যেমন- দুধ, ডিম, খিচুড়ি, পেয়ারা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিশুদ্ধ খাদ্যে শুধুমাত্র একটি উপাদান থাকে। যেমন- চিনি, গ্লুকোজ। এতে শর্করা ছাড়া আর কোনো উপাদান থাকে না।

খাদ্য উপাদান

খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এ রাসায়নিক উপাদানগুলোকে খাদ্য উপাদান বলা হয়। কেবলমাত্র একটি উপাদান দিয়ে গঠিত এমন Lv`¨e¯'i সংখ্যা খুবই কম। এভাবে উপাদান অনুযায়ী Lv`¨e¯'‡K তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. আমিষ বা প্রোটিন - ¶qciY, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠন করে।
২. শর্করা বা শ্বেতসার - শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।
৩. স্নেহ বা চর্বি - তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে।

এছাড়া তিন প্রকার অন্যান্য উপাদান বিশেষ প্রয়োজন। যথা-

১. খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন - রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়, বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্দীপনা যোগায়।

২. খনিজ লবণ - বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

৩. পানি - দেহে পানির সমতা রক্ষা করে, কোষের গুণাবলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষ A½¨Ymgn‡K ধারণ ও তাপের সমতা রক্ষা করে।

নতুন শব্দ : পুষ্টিমান, ˆRegj¨, D"Pgv‡bi আমিষ।

পাঠ ২ ও ৩ : শর্করা/শ্বেতসার

আমরা bv¯—vq রুটি, মুড়ি, চিড়া, পাঁউরুটি ইত্যাদি খাই। এগুলো শর্করা জাতীয় খাদ্য। শর্করা শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। শর্করা সহজপাচ্য। সব শর্করাই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। শর্করা দেহের কর্মক্ষমতা যোগায়। গ্লুকোজ এক ধরনের সরল শর্করা।

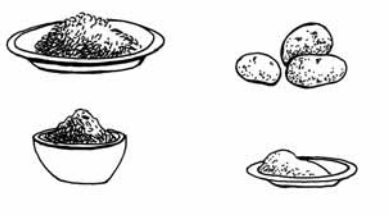

রাসায়নিক গঠনপদ্ধতি অনুসারে সব শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। একটি মাত্র শর্করা দিয়ে গঠিত হয় মনোস্যাকারাইড। একে মৌলিক শর্করাও বলে। দ্বি-শর্করী ও বহু শর্করী পরিপাকের মাধ্যমে সরল শর্করায় পরিণত হয়ে দেহের শোষণযোগ্য হয়। মানবদেহ পরিপুষ্টির জন্য সরল শর্করা অত্যধিক ¸iZcY| কারণ মানবদেহ শুধুমাত্র সরল শর্করা গ্রহণ করতে পারে। গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ এ তিনটি শর্করার মধ্যে গ্লুকোজ রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে পরিবাহিত হয়।

চিত্র ১৩.১ : শর্করা জাতীয় খাদ্য

শর্করা, স্নেহ ও আমিষের মধ্যে শর্করা সর্বাপেক্ষা সহজপাচ্য। দেহে শোষিত হওয়ার পর শর্করা খুব কম সময়ে তাপ উৎপন্ন করে দেহে শক্তি যোগায়। এর প্রথম ও প্রধান কাজ হলো শক্তি উৎপাদন করা। ১ গ্রাম শর্করা ৪ কিলোক্যালরি তাপ উৎপন্ন করে। মানবদেহে প্রায় ৩০০-৪০০ গ্রাম শর্করা জমা থাকতে পারে। এ পরিমাণ শর্করা ১২০০-১৬০০ কিলোক্যালরি তাপ উৎপন্ন করে দেহের শক্তি যোগায়।

বয়স, দেহের ওজন, D"PZv, পরিশ্রমের মাত্রার উপর শর্করার চাহিদা নির্ভর করে। একজন cY বয়স্ক পুরুষের শর্করা দৈনিক চাহিদা তার দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের ৪.৬ গ্রাম হয়ে থাকে। একজন ৬০ কেজি ওজনের পুরুষ মানুষের গড়ে প্রতিদিন শর্করার দৈনিক চাহিদা = (৬০×৪.৬) গ্রাম বা ২৭৬ গ্রাম। আমাদের মোট প্রয়োজনীয় ক্যালরির শতকরা ৬০-৭০ ভাগ শর্করা হতে গ্রহণ করা দরকার।

কাজ : সামান্য পরিমাণ এরারুট দ্রবণ বা ভাতের মাড় একটি টেস্টটিউবে নাও এবং এর সাথে সামান্য পরিমাণ পানি মেশাও। এবার এর ভিতর দুই-তিন ফোঁটা আয়োডিন দ্রবণ মেশাও। কী ঘটে দেখ?

দ্রবণটি নীল বর্ণ ধারণ করবে। এ থেকে উক্ত দ্রবণে শর্করা বা শ্বেতসারের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

অভাবজনিত রোগ

আহারে কম বা বেশি শর্করা গ্রহণ উভয়ই দেহের জন্য ক্ষতিকর। শর্করার অভাবে অপুষ্টি দেখা দেয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে দেহে বিপাক ক্রিয়ার সমস্যার সৃষ্টি হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গেলে হাইপোগ্লাইসমিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন-

- ক্ষুধা অনুভব করা
- বমি বমি ভাব
- অতিরিক্ত ঘামানো
- ü`K¤úb বেড়ে বা কমে যেতে পারে।

আমিষ বা প্রোটিন

আমিষ আমাদের দেহের গঠন উপাদান। আমিষ কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত। আমিষে ১৬% নাইট্রোজেন থাকে। কখনও কখনও ফসফরাস, লৌহ ও অন্যান্য মৌলিক উপাদানও আমিষে সামান্য পরিমাণে থাকে। কোনো কোনো সময় আমিষে অতি সামান্য পরিমাণ আয়োডিন থাকে। নাইট্রোজেন এবং শেষোক্ত উপাদানগুলোর উপস্থিতির কারণে এর গঠন ও গুরুত্ব অন্যান্য উপাদান থেকে স্বতন্ত্র। কেবলমাত্র আমিষ জাতীয় খাদ্য দেহে নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে পারে। তাই পুষ্টি বিজ্ঞানে এটা একটি ¸iZcY উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। আমিষ পরিপাক হওয়ার পর অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। আমিষ হলো অ্যামাইনো এসিডের একটি জটিল যৌগ। পরিপাক প্রক্রিয়া দ্বারা এটি দেহে শোষণ উপযোগী অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। অ্যামাইনো এসিড নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত যৌগ। এ পর্যন্ত প্রকৃতিজাত দ্রব্যে ২২ প্রকার অ্যামাইনো এসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমরা বাংলা বা ইংরেজি বর্ণমালাগুলো সাজিয়ে যেমন অসংখ্য শব্দ গঠন করতে পারি, তেমনি ২২টি অ্যামাইনো এসিড বিভিন্ন সংখ্যায়, বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে মিলিত হয়ে আমিষের উৎপত্তি ঘটায়। এ কারণে মাছ, দুধ, মাংস ইত্যাদি খাবারের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের তারতম্য দেখা যায়।

দেহের বৃদ্ধি, ¶qciY ও নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষার জন্য কয়েকটি অ্যামাইনো এসিড অত্যন্ত প্রয়োজন। এগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলে। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড দেহে তৈরি হতে পারে না। খাদ্য থেকে এ অ্যামাইনো এসিডগুলো সংগ্রহ করতে হয়।

দেহে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের অভাব বিশেষভাবে ক্ষতিকর। খাদ্যে প্রাণীজ আমিষ অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের অভাব ঘটলে নানা রোগ উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন- বমি বমি ভাব, g‡Î জৈব এসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, নাইট্রোজেনের ভারসাম্য বজায় না থাকা ইত্যাদি।

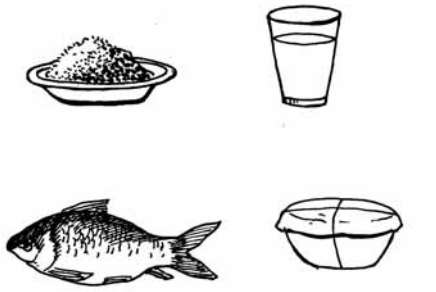

চিত্র ১৩.২ : আমিষ জাতীয় খাদ্য

সব আমিষ দেহে সমান পরিমাণে শোষিত হয় না। আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করার পর এর শতকরা যত ভাগ অন্ত্র থেকে দেহে বিশেষিত হয় তত ভাগকে সেই আমিষের সহজপাচ্যতার গুণক ধরা হয়। সহজপাচ্যতার উপর আমিষের পুষ্টিমান নির্ভর করে। যে আমিষ শতকরা ১০০ ভাগই দেহে শোষিত হয় এবং দেহের বৃদ্ধি ও ¶qci‡Y কাজ করে তার সহজপাচ্যতার গুণক ১। এক্ষেত্রে আমিষ গ্রহণ এবং দেহে ধারণের পরিমাণ সমান। সহজ অর্থে বলতে গেলে যতটুকু আমিষ গ্রহণ করা হয় তার m¤úYUvB দেহে বৃদ্ধি ও ¶qci‡Y কাজ করে। আর তা না হলে সহজপাচ্যতার গুণক ১ হতে কম হয়। মায়ের দুধ ও ডিমের আমিষের সহজপাচ্যতার গুণক ১। অন্যান্য সব আমিষেরই সহজপাচ্যতার গুণক ১ হতে কম।

কাজ : সামান্য পরিমাণ আমিষ (ডিমের সাদা অংশ) জাতীয় খাদ্য nvgvbw`¯Ívi সাহায্যে পিষে ফেলতে হবে। ভালো করে পিষে ফেলার জন্য সামান্য পরিমাণ পানি মেশানো যেতে পারে। এবার টেস্টটিউবে সামান্য পরিমাণ আমিষের দ্রবণ নাও। উক্ত দ্রবণে কয়েক ফোঁটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ এবং কয়েক ফোঁটা কপার সালফেট দ্রবণ মেশাও। এতে উক্ত দ্রবণে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কী?

আমিষের দ্রবণের সাথে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো মিশানোর পর দ্রবণটি বেগুনি রঙ ধারণ করেছে। এভাবে উক্ত দ্রবণে আমিষের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

আমিষের অভাবজনিত রোগ

খাদ্যে পরিমিত প্রয়োজনীয় জৈব আমিষ বা মিশ্র আমিষ না থাকলে শিশুর দেহে আমিষের অভাবজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন ক্ষতিগ্র¯Í হয়। দেহে বৃদ্ধি বন্ধ বা স্থগিত থাকলে শিশু পুষ্টিহীনতায় ভোগে। শিশুদের কোয়াশিয়রকর ও মেরাসমাস রোগ দেখা দেয়।

কোয়াশিয়রকর রোগের লক্ষণ

- শিশুদের খাওয়ায় অরুচি হয়।
- পেশি শীর্ণ ও `ej হতে থাকে, চামড়া, চুলের মসৃণতা ও রং নষ্ট হয়ে যায়।
- ডায়রিয়া রোগ হয়, শরীরে পানি আসে।
- পেট বড় হয়।

উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা এ রোগ নিরাময় হলেও দেহে মানসিক স্থবিরতা আসে। কোয়াশিয়রকর রোগ মারাত্মক হলে শিশুর মৃত্যু হতে পারে।

মেরাসমাস রোগের লক্ষণ

- আমিষ ও ক্যালরি উভয়েরই অভাব ঘটে, ফলে দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।
- শরীর ক্ষীণ হয়ে অস্থিচর্মসার হয়।
- চামড়া বা ত্বক খসখসে হয়ে ঝুলে পড়ে।
- শরীরের ওজন হ্রাস পায়।

শিশুদের জন্য এরূপ অবস্থা বিপজ্জনক। এছাড়া প্রোটিনের অভাবে বয়স্কদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ও রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।

নতুন শব্দ : সহজপাচ্যতার গুণক, গ্যালকটোজ, অ্যামাইনো এসিড।

পাঠ ৪ ও ৫ : স্নেহ পদার্থ

একে শক্তি উৎপাদনকারী উপাদান বলা হয়। স্নেহ পদার্থে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। কার্বনের দহন ক্ষমতা বেশি থাকায় স্নেহ পদার্থের অণু থেকে বেশি তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। স্নেহ পদার্থ ফ্যাটি এসিড ও গিস্নারলের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগ। স্নেহ পদার্থ পরিপাক হয়ে ফ্যাটি এসিড ও গিস্নারলে পরিণত হয়। ফ্যাটি এসিড

ও গিসারল ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের ভিতরে অবস্থিত লসিকা নালির মাধ্যমে শোষিত হয়। এই খাদ্যে ২০ প্রকার চর্বি জাতীয় এসিড পাওয়া যায়। চর্বি জাতীয় এসিড দুই প্রকার। যথা- ১. Am¤ú³ চর্বি জাতীয় এসিড ও ২. m¤ú³ চর্বি জাতীয় এসিড।

দেহে যকৃতের মধ্যে চর্বি জাতীয় এসিড তৈরি হয়। কিন্তু যকৃতের চর্বি জাতীয় এসিড তৈরির ক্ষমতা অত্যন্ত কম। কিন্তু কিছু কিছু চর্বি জাতীয় এসিড আছে যা দেহের জন্য অত্যাবশ্যক। এগুলো প্রধানত উদ্ভিজ তেলে পাওয়া যায়। খাদ্যে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ দ্বারা এর উপকারিতা যাচাই করা যায় না। যে স্নেহ জাতীয় খাদ্যে Am¤ú³ চর্বি জাতীয় এসিড বেশি থাকে তা বেশি উপকারী। যেমন- সয়াবিন তেল, mhgLx তেল, সরিষার তেল, তিলের তেল, fÆvi তেল ইত্যাদি। এসব তেল দিয়ে তৈরি খাবার উৎকৃষ্টতর স্নেহ জাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- মেয়নিজ, সালাদ ড্রেসিং, কাসুন্দি, তেলের আচার ইত্যাদি উৎকৃষ্টতর স্নেহ জাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। যে সব খাদ্যে m¤ú³ চর্বি জাতীয় এসিড বেশি থাকে সে সকল খাদ্যগুলোকে স্নেহবহুল খাদ্য বলা হয়। যেমন- মাংস, মাখন, পনির, ডালডা, চকলেট, বাদাম ইত্যাদি। পুষ্টিবিজ্ঞান মতে দৈনিক মোট শক্তির ২০%-৩০% শক্তি স্নেহ থেকে পাওয়া যায়। দৈনিক আহার্যে এমন স্নেহযুক্ত খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা অত্যাবশ্যকীয় চর্বি জাতীয় এসিড যোগাতে পারে এবং ভিটামিন দ্রবণে সক্ষম হয়।

খাদ্যে স্নেহ পদার্থের অভাব ঘটলে দেহে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাব পরিলক্ষিত হয় ফলে ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। যেমন- ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়ে দেহের সৌন্দর্য নষ্ট করে, অত্যাবশ্যকীয় চর্বি জাতীয় এসিডের অভাবে শিশুদের একজিমা রোগ হয় ও বয়স্কদের চর্মরোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়।

চিত্র ১৩.৩ : চর্বি জাতীয় খাদ্য

কাজ : একটি টেস্টটিউবে কয়েক ফোঁটা সয়াবিন তেল নাও। এর ভেতর সামান্য ইথানল মিশাও। এবার টেস্টটিউবটিকে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নাও। এবার দ্রবণটিতে সামান্য পানি মিশিয়ে টেস্টটিউবটি আবার ঝাঁকিয়ে নাও। কী ঘটে লক্ষ কর। তেলের দ্রবণটি ঘোলাটে বর্ণ ধারণ করবে।

এভাবে সরিষা, নারকেল ও তিলের তেলের সাহায্যে উক্ত পরীক্ষাটি কর এবং কী ঘটে তা বর্ণনা কর।

খাদ্যের ক্যালরি ও কর্মশক্তি

শর্করা, আমিষ ও স্নেহ পদার্থ খাদ্যের এ তিনটি উপাদান থেকে দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ জানার জন্য শর্করা, আমিষ ও চর্বি ক্যালরি বের করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির K¨vjwigj¨ kন্য ধরে হিসেব করতে হবে। এ তাপ আমাদের দেহে কাজ করার শক্তি যোগায়।

আমাদের দেহে

১ গ্রাম শর্করা থেকে ৪ ক্যালরি

১ গ্রাম আমিষ থেকে ৪ ক্যালরি

১ গ্রাম চর্বি থেকে ৯ ক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

আমাদের দেহের ভিতর খাদ্য পরিপাক, শ্বসন, রক্তসংবহন ইত্যাদি কার্যক্রম বিপাক ক্রিয়ার অন্তর্গত। বিপাক ক্রিয়া চালানোর জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তাকে মৌলবিপাক বলে। আবার শারীরিক পরিশ্রমেও আমাদের শক্তি ব্যয় হয়। আমরা খাবার থেকে শক্তি পাই।

খাদ্য থেকে দেহের ভিতর যে তাপ উৎপন্ন হয় তা আমরা ক্যালরিতে প্রকাশ করি। ১০০০ ক্যালরিতে ১ কিলোক্যালরি। খাদ্যে তাপশক্তি মাপের একক হলো কিলোক্যালরি। দেহের শক্তির চাহিদাও কিলোক্যালরিতে নির্ণয় করা হয়।

আমার, তোমার, তোমার ছোট ভাই, তোমার বাবার দেহের ক্যালরি চাহিদা এক রকম নয়। আমাদের দেহে দুই ভাবে শক্তি ব্যয় হয় যথা- ১. দেহের অভ্যন্তরীণ কাজে অর্থাৎ মৌলবিপাকে এবং ২. পরিশ্রমের কাজে। প্রতিদিন কার কত ক্যালরি বা তাপ শক্তির প্রয়োজন তা নির্ভর করে প্রধানত বয়স, দৈহিক D"PZ\ এবং দৈহিক ওজনের উপর। এছাড়া বিভিন্ন পেশা এবং ¯¿x-ci l ভেদে দৈনিক ক্যালরি চাহিদা কম বা বেশি হয়ে থাকে।

নিচের সারণীতে ক্যালরির ব্যবহার ও খাদ্য চাহিদা দেখানো হলো

শিশু নারী ও পুরুষের বিভিন্ন বয়সে দৈনিক ক্যালরির বরাদ্দ

বয়স বৎসর	গড় ওজন কিলোগ্রাম	গড় শক্তি কিলোক্যালরি	বয়স বৎসর	গড় ওজন কিলোগ্রাম	গড় শক্তি কিলোক্যালরি
বাচ্চা			নারী		
০.০-০.৫	৬	১১৫×কি: গ্রা:	১০-১২	৩০	১৯০০
০.৫-১.০	৯	১০০×কি: গ্রা:	১৩-১৫	৪২	২২০০
			১৬-১৯	৫১	২১০০
শিশু			২০-৩৯	৫৪	২০০০
১-৩	১৩	১৩০০	৪০-৪৯	৫৩	১৯০০
৪-৬	২০	১৫০০	৫০-৫৯	৫২	১৮০০
৭-১০	২৮	১৮০০	৬০-৬৯	৫১	১৬০০
পুরুষ			৭০+	৫১	১৪০০
১০-১২	৪০	২২০০			
১৩-১৫	৪৪	২৫০০	সন্তান m¤e\		+১৫০
১৬-১৯	৬৭	৩০০০	মাতার		+২০০
২০-৩৯	৬৭	২৭০০	অতিরিক্ত চাহিদা		+৩০০
৪০-৪৯	৭০	২৪০০	প্রথম ৩ মাসে		
৫০-৫৯	৬৮	২৩০০	দ্বিতীয় ৩ মাসে		+৪০০
৬০-৬৯	৬৫	২২০০	তৃতীয় ৩ মাসে		
৭০+	৬৫	১৯০০	প্রসূতি মাতার অতিরিক্ত চাহিদা		

একজন লোকের কী পরিমাণ শক্তি দরকার তা আমরা কেমন করে জানতে পারব? একজন লোকের দৈনিক কী পরিমাণ শক্তির দরকার তা প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ১. মৌলবিপাক ২. দৈহিক পরিশ্রম ও ৩. খাদ্যের প্রভাব।

আমাদের দৈনিক খাদ্য আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া উচিত। খাদ্য নির্বাচনের সময় আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যে, খাদ্য থেকে দেহ যেন প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যালরি পেতে পারে এবং ভিটামিন ও খনিজ লবণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো যেন এতে থাকে।

নতুন শব্দ : কিলোক্যালরি, মৌলবিপাক।

পাঠ ৬ : খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন যে, খাদ্যে শর্করা, আমিষ, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ ছাড়াও আরও কতকগুলো m2 উপাদানের প্রয়োজন। এর অভাবে শরীর নানা রোগে (যেমন- রাতকানা, বেরিবেরি, স্কার্ভি ইত্যাদি) আক্রান্ত হয়। ভিটামিন বলতে আমরা খাদ্যের ঐ সব জৈব রাসায়নিক পদার্থকে বুঝি যা খাদ্যে অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে উপস্থিত থাকে। ভিটামিনmgn প্রত্যক্ষভাবে দেহ গঠনে অংশগ্রহণ না করলেও এদের অভাবে দেহের ¶qciY, বৃদ্ধিসাধন বা তাপশক্তি উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াগুলো mm¤úb হতে পারে না।

ভিটামিনের প্রকারভেদ : দ্রবণীয়তার গুণ অনুসারে ভিটামিনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. স্নেহ জাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন- এ, ডি, ই, এবং কে।

২. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন- ভিটামিন বি-কমপেক্স এবং সি।

ভিটামিনের উৎস : গাছের সবুজ পাতা, কচি ডগা, হলুদ ও সবুজ বর্ণের সবজি, ফল ও বীজ ইত্যাদি অংশে ভিটামিন থাকে।

ভিটামিন এ

উৎস : মাছের তেল ও প্রাণীজ স্নেহে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়। ক্যারোটিন সমৃদ্ধ শাক-সবজি যেমন- লালশাক, পুঁইশাক, পালংশাক, টমেটো, গাজর, বীট ও মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন- পেঁপে, আম, কাঁঠালে ভিটামিন ‘এ’ থাকে। মলা ও ঢেলা মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ থাকে।

দেহে ভিটামিনের কাজ হলো- দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখা, ত্বক ও শ্লেষ্মাঝিল্লিকে সুস্থ রাখা এবং দেহকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করা, খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ও ক্ষুধার উদ্রেক করা, রক্তে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা ও দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

অভাবজনিত রোগ

১. রাতকানা : এ রোগের লক্ষণ স্বল্প আলোতে বিশেষ করে রাতে আবছা আলোতে দেখতে না পাওয়া। শিশুরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে চোখ m¤úYরূপে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত শিশুকে সবুজ শাকসবজি ও রঙিন ফলমূল খাওয়ানো উচিত। ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। আমাদের দেশে টিকা দিবসে বিভিন্ন টিকা কেন্দ্রে শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

২. জেরপথালমিয়া : ভিটামিন ‘এ’ এর অভাব ঘটলে চোখের কর্নিয়ার Av"Qv`b ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর্নিয়ার উপর শুষ্ক ¯—i পড়ে। তখন চোখ শুকিয়ে যায় এবং পানি পড়া বন্ধ হয়ে যায়। চোখে আলো সহ্য হয় না, চোখে পুঁজ জমে এবং চোখের পাতা ফুলে যায়।

এ অবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসা করালে এ রোগ থেকে উপশম পাওয়া যেতে পারে। তবে সময় মতো চিকিৎসা না হলে শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া ভিটামিন 'এ' এর অভাব ঘটলে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

ভিটামিন বি-কমপেক্স

ভিটামিন বি-কমপেক্স গোষ্ঠীর কাজ হলো বিশেষ বিশেষ উৎসেচকের অংশ হিসেবে আমিষ, শর্করা ও স্নেহ পদার্থকে বিশিষ্ট করা এবং এদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে মুক্ত হতে সাহায্য করা।

ভিটামিন বি১ (থায়ামিন) : এর প্রধান কাজ হলো শর্করা বিপাকে অংশগ্রহণ করে শক্তিমুক্ত করা। তাছাড়া স্বাভাবিক ক্ষুধা বজায় রাখতে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে সহায়তা করা।

ভিটামিন বি২ (রিবোফ্লাবিন) : এটা অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ও কার্বহাইড্রেডের বিপাকে অংশ নিয়ে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করা।

ভিটামিন বি৬ (পাইরিডক্সিন) : এটা শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।

ভিটামিন বি১২ (সায়ানোকোবালামিন) : এটা লোহিত রক্তকণিকা বৃদ্ধি ও উৎপাদনে সহায়তা করে। শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

পাঠ ৭ : ভিটামিন 'সি'

দেহের জন্য ভিটামিন 'সি' অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এ ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং সামান্য তাপেই নষ্ট হয়ে যায়। দেহে জমা থাকে না তাই প্রতিদিন ভিটামিন 'সি' খাওয়া দরকার। টক জাতীয় ফল আমলকি, আনারস, পেয়ারা, কমলালেবু, লেবু, আমড়া ইত্যাদি ফলে প্রচুর ভিটামিন 'সি' থাকে। সবুজ শাকসবজি ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, লেটুসপাতা থেকে আমরা ভিটামিন 'সি' পাই। পাকা ফল অপেক্ষা কাঁচা সবজি ও ফলে এ ভিটামিন বেশি থাকে।

ভিটামিন 'সি' পেশি, দাঁত মজবুত করে, ক্ষত নিরাময় ও চর্মরোগ রোধে সহায়তা করে, কণ্ঠনালি ও নাকের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

অভাবজনিত রোগ

প্রাপ্ত বয়স্কদের দেহে ভিটামিন 'সি'-এর অভাব প্রকট হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা দেয় :

- হাঁড়ের গঠন শক্ত ও মজবুত হতে পারে না।
- হাড় দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যায়।
- ত্বক খসখসে হয়, চুলকায়, ত্বকে ঘা হলে সহজে তা শুকাতে চায় না।

স্কার্ভি

- দাঁতের মাড়ি ফুলে নরম হয়ে যায়।
- দাঁতের গোড়া আলগা হয়ে যায় এবং গোড়া থেকে রক্ত পড়ে।

- দাঁতের এনামেল উঠে যায় এতে অকালে দাঁত পড়ে যেতে পারে। শিশু ও বয়স্কদের এ রোগ বেশি হয়।
- গ্রন্থি ফুলে যায় এবং মুখে ব্যথা হয়।
- রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ হয় না, ঘা শুকাতে দেরি হয়।
- অন্যান্য রোগ বিশেষ করে সর্দি, কাশি খুব সহজে আক্রমণ করে।

প্রতিকার

এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

প্রতিরোধ

কোলের শিশুকে মায়ের দুধের সঙ্গে অন্যান্য cwicik খাদ্য যেমন ফলের রস, সবজির স্যুপ ইত্যাদি খাওয়াতে হবে।

ভিটামিন 'ডি'

ভোজ্য তেল, দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য, বিভিন্ন মাছের তেল, ডিমের কুসুম, মাখন, ঘি, চর্বি এবং ইলিশ মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়।

কাজ

- অস্থি ও দাঁতের কাঠামো গঠন।
- অন্ত্রে ক্যালসিয়াম বিশোষণ বাড়ায়।
- রক্ত প্রবাহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

অভাব জনিত রোগ

ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে লোহার বিশোষণ, mÂq ও হিমোগোবিন তৈরিতে বিঘ্ন ঘটে।

রিকেটস

রিকেটস রোগের লক্ষণ

- ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের অভাবে শিশুদের হাড় নরম হয়ে যায় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- পায়ের হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যায় এবং দেহের চাপে অন্যান্য হাড়গুলোও বেঁকে যায়।
- হাত-পায়ের অস্থিসন্ধি বা গিট ফুলে যায়।
- বুকের হাড় বা পাঁজরের হাড় বেঁকে যায়।

প্রতিকার

এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

প্রতিরোধ

শিশুকে ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানো উচিত। mh রশ্মি থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। তাই শিশুকে কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রে খেলাধুলা করতে দেওয়া উচিত।

অস্টম্যালেশিয়া

বয়স্কদের রিকেটস অস্টম্যালেশিয়া নামে পরিচিত। এই রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ -

- ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে ক্যালসিয়াম শোষণে বিঘ্ন ঘটে।
- ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের mÂq কমতে থাকে।
- থাইরয়েড গ্রন্থির কাজের পরিবর্তন ঘটে।
- অস্থি `ej হয়ে অস্থির কাঠিন্য কমে যায় এবং হালকা আঘাতেই অস্থি ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

প্রতিকার

উপরের লক্ষণগুলো দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'ডি' যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে উক্ত উপাদানগুলোর জন্য ঔষধ সেবন করা একান্ত জরুরী।

প্রতিরোধ

- শিশুকাল থেকেই ভিটামিন 'ডি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুদেরকে কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রে খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভিটামিন 'ই'

ভোজ্যতেল ভিটামিন 'ই' এর সবচেয়ে ভালো উৎস। শস্যদানা, যকৃত, মাছ-মাংসের চর্বিতে ভিটামিন 'ই' পাওয়া যায়।

কাজ

- ভিটামিন 'ই' কোষ গঠনে সহায়তা করে।
- শরীরের কিছু ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
- খুব কম ক্ষেত্রে ভিটামিন 'ই' এর অভাব ঘটে এবং এর অভাব জনিত লক্ষণও কম।

ভিটামিন 'কে'

সবুজ রঙের শাকসবজি, লেটুসপাতা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ডিমের কুসুম, সয়াবিন তেল এবং যকৃতে ভিটামিন 'কে' পাওয়া যায়।

কাজ

- দেহে ভিটামিন 'কে' প্রথ্রোম্বিন নামক প্রোটিন তৈরি করে।
- প্রথ্রোম্বিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

অভাব জনিত সমস্যা

যকৃত থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়। পিত্তরস নিঃসরণে অসুবিধা হলে ভিটামিন কে-এর শোষণ কমে যায়। ভিটামিন 'কে'-এর অভাবে ত্বকের নিচে ও দেহাভ্যন্তরে যে রক্ত ক্ষরণ হয় তা বন্ধ করার ব্যবস্থা না নিলে রোগী মারা যেতে পারে। এ

ভিটামিনের অভাবে অপারেশনের রোগীর রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ হতে চায় না। এতে রোগীর জীবন নাশের আশংকা বেশি থাকে।

নিচের ছকটি ciY কর

ভিটামিন	উৎস	কাজ	অভাবজনিত রোগ
'এ'			
'সি'			
'ডি'			
'কে'			

পাঠ ৮

ভাত এবং তরকারীর সাথে আমরা প্রত্যহ যে খাবার লবণ খাই, এছাড়াও আরও অনেক প্রকার লবণ আছে যা আমাদের দেহের জন্য অতীব প্রয়োজন। খাদ্যে খনিজ লবণ আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থের মতো দেহে তাপ উৎপন্ন করে না। কিন্তু দেহকোষ ও দেহ তরলের জন্য খনিজ লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, আয়োডিন, লৌহ, সালফার ইত্যাদি লবণ জাতীয় দ্রব্য খাদ্যের সাথে দেহে প্রবেশ করে ও দেহ গঠনে সাহায্য করে। এসব উপাদান দেহে মৌলিক উপাদান হিসেবে থাকে না, অন্য পদার্থের সঙ্গে জৈব ও অজৈব যৌগরূপে থাকে। প্রধানত দুই ভাবে খনিজ লবণ দেহে কাজ করে। যথা- দেহ গঠন উপাদান রূপে ও দেহ অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মাংস, ডিম, দুধ, সবুজ শাকসবজি এবং ফল খনিজ লবণের প্রধান উৎস।

খনিজ লবণ দেহ গঠন ও দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, অস্থি, দাঁত, এনজাইম ও হরমোন গঠনের জন্য খনিজ লবণ অপরিহার্য উপাদান, স্নায়ু উদ্দীপনা ও পেশি সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের জলীয় অংশে সমতা রক্ষা করে ও বিভিন্ন এনজাইম সক্রিয় রাখে।

মানবদেহে খনিজ লবণের প্রয়োজনীতা

ক্যালসিয়াম দাঁত ও হাড় গঠনে, রক্ত জমাট বাঁধতে, স্নায়ু ব্যবস্থায় সুষ্ঠু কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে। ফসফরাস দাঁত ও হাড় গঠন, ফসফোলিপিড তৈরি করে। লৌহ রক্তের লোহিত রক্তকণিকা গঠন, উৎসেচক বা এনজাইমের কার্যকারিতায় সহায়তা করে। আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ও বিপাকের কাজ সুষ্ঠুভাবে m¤úv`‡b সহায়তা করে। দেহের অধিকাংশ কোষ ও দেহরসের জন্য সোডিয়াম প্রয়োজন। পেশি সংকোচনে পটাশিয়াম ¸iZcY fvwgKv পালন করে।

পাঠ ৯

অভাবজনিত রোগ

রিকেটস : দেহে ভিটামিন 'ডি'-এর সঙ্গে ক্যালসিয়াম শোষিত হয়। এই ভিটামিনের অভাবে রিকেটস রোগ হয়। ভিটামিন অংশে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

গলগন্ড : MjMÛ রোগকে ঘ্যাগ বলে। আমাদের দেশের DËivÂ‡j বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর, জামালপুর ও ময়মনসিংহে এ রোগের প্রকোপ বেশি। যখন আমাদের রক্তে কোনো কারণে আয়োডিনের অভাব ঘটে তখন গলায় অবস্থিত থাইরয়েডগ্রন্থি ক্রমশ আকারে বড় হতে থাকে। গলাটা ফুলে যায়। একে MjMÛ বা ঘ্যাগ বলে। এ রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ :

- থাইরয়েডগ্রন্থি ফুলে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
- শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় শব্দ হয়।
- গলার আওয়াজ ফ্যাঁসফেসে হয়ে যায়।
- গলায় অস্ব¯ি—বোধ, খাবার গিলতে কষ্ট হয়।
- আক্রান্ত ব্যক্তি অবসাদগ্র¯— ও `ej‡eva করে।

প্রতিকার

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া, সামুদ্রিক মাছ, মাছের তেল ও সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ক্রেটিনিজম

সাধারণত আয়োডিনের অভাবে শিশুদের এ রোগ হয়। এই রোগে আক্রান্ত শিশুর দেহে যে লক্ষণগুলো দেখা দেয় তা হলো–

- দেহের বর্ধন মন্থর হয়।
- পুরু ত্বক, মুখমণ্ডলের পরিবর্তন দেখা দেয়।
- পুরু ঠোঁট, বড় জিহ্বা, মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

প্রতিকার

যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা করা হলে শিশুদের দৈহিক অসুবিধাগুলো ও স্বাভাবিক বর্ধন ঠিক রাখা যায়।

প্রতিরোধ

খাবারে আয়োডিনযুক্ত লবণ দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

রক্তাল্পতা বা এ্যানিমিয়া

লোহা, লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের গঠন উপাদান। শিশু ও সন্তান সম্ভবা মায়ের খাদ্যে লোহার ঘাটতির জন্য রক্তাল্পতা দেখা যায়। সাধারণত শিশুদের পেটে কৃমি হলে রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে। এর লক্ষণগুলো হলো -

- `ejZv‡eva, মাথা, গা ঝিমঝিম করা।
- বুক ধড়ফড় করা।
- মাথা ঘোরানো, অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে ওঠা।
- ওজন হ্রাস ও খাওয়ায় অরুচি দেখা দেয়।

প্রতিকার

লৌহ সমৃদ্ধ শাকসবজি, ফল, মাংস, ডিমের কুসুম, যকৃত ও বৃক্ক ইত্যাদি বেশি করে খাওয়া। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা। রোগ কঠিন আকার ধারণ করলে হৃৎপিন্ডের দ্রুত রক্ত mÂvjb ও ü`¯úÛb বন্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পানি

পানি জীবন ধারণের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রাণী দেহের ৬০-৭০ ভাগই পানি। দেহ গঠনে পানির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। এ পানি অস্থি, মাংস, ত্বক, নখ, দাঁত ইত্যাদি কোষের ভিতরে ও বাইরে থাকে। প্রায় সব খাদ্যেই কম-বেশি পানি থাকে। তবে আমরা আলাদাভাবে পানি পান করে দেহের চাহিদা মেটাই।

দেহ গঠন ছাড়াও পানি দেহের সব অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। পানি ছাড়া দেহের ভিতরে কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া হতে পারে না। পানি দেহে দ্রাবক রূপে কাজ করে। বিভিন্ন খনিজ লবণ পানিতে `ePxfZ থাকে। পানিতে দ্রবণীয় অবস্থায় খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া চলে। আবার পানিতে দ্রবীভূত থেকেই খাদ্য উপাদান দেহে শোষিত হয়।

কাজ

- পানির জন্যই রক্ত mÂvjb ও তাপ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।
- পানি দেহ থেকে `wlZ পদার্থ অপসারণ করে। যেমন- gÎ ও ঘাম।

কলেরা ও উদরাময় রোগে মলের সঙ্গে বা বমির সঙ্গে দেহ থেকে হঠাৎ বেশ কিছু পানি বের হয়ে অসুবিধা ঘটায়। আমাদের নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুস থেকে দৈনিক প্রায় ৪৫০ মিলি. পানি বাইরে চলে যায়। কলেরা বা উদরাময় রোগ হলে রোগীকে স্যালাইন বা লবণ পানির শরবত খাওয়াতে হবে। এটা কলেরা বা উদরাময়ের সবচেয়ে সহজ চিকিৎসা। এছাড়া আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণাকেন্দ্র কর্তৃক তৈরি খাওয়ার স্যালাইনের প্যাকেট পাওয়া যায়। ওটা পানিতে গুলে রোগীকে খাওয়াতে হয়। সম্প্রতি শস্য স্যালাইন নামক আর একটি খাওয়ার স্যালাইন উদ্ভাবিত হয়েছে। ১ লিটার পানি, ৫০ গ্রাম চালের গুঁড়া ও এক চিমটি লবণ মিলিয়ে এ স্যালাইন তৈরি করা হয়।

> **কাজ** তোমরা আগের শ্রেণিতে খাবার স্যালাইন বানাতে শিখেছ। এবার তোমরা পুনরায় খাবার স্যালাইন তৈরি কর। স্যালাইন তৈরির সময় তোমরা কী কী সাবধানতা অবলম্বন করবে তা লিপিবদ্ধ করবে।

শুষ্কতা

কোনো কারণে দেহে পানির পরিমাণ কমে গেলে কোষগুলোতে পানির স্বল্পতা দেখা দেয়। কোষের পানি কমে গেলে অতিরিক্ত পিপাসা হয়, রক্তের চাপ কমে যায়, রক্ত mÂvj‡b অসুবিধা হয়, বিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। পানির অভাবে দেহের ওজন কমে যায় এবং পেশি ও স্নায়ুকোষ `ej হয়ে পড়ে। দেহে পানির পরিমাণ ২০ শতাংশের নিচে নেমে গেলে দেহের স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটে, ফলে রোগী বেহুশ হয়ে পড়ে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

রাফেজ বা আঁশযুক্ত তন্তু

শস্যদানা, ফলমূল, সবজির অপাচ্য অংশকে রাফেজ বলে। দেহের ভিতর রাফেজের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। রাফেজ কোনো পুষ্টি উপাদান নয়। তবে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এটা একটা গুরুত¡cY উপাদান। রাফেজ পৌষ্টিক নালির ভিতর দিয়ে সরাসরি স্থানান্তরিত হয়। ফল ও সবজির রাফেজ, সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর। আঁশযুক্ত খাবার থেকে রাফেজ পাওয়া যায়।

খাদ্য নির্বাচন

যে mg¯— Lv`¨e¯‘ দেহের ক্যালরি চাহিদা ciY করে, টিস্যু কোষের বৃদ্ধি ও গঠন বজায় রাখে এবং দেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে সুষম খাদ্য বলে। অর্থাৎ সুষম খাদ্য বলতে বুঝায় ৬টি উপাদান বিশিষ্ট পরিমাণ মতো খাবার যা ব্যক্তিবিশেষের দেহের চাহিদা মেটায়।

বয়স, লিঙ্গাভেদ, দৈহিক অবস্থা, শ্রমের পরিমাণ হিসেবে পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদনগুলো উপযুক্ত পরিমাণে সুষম খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। যে শর্ত পালনে খাবার সুষম হয় সেগুলো হলো-

১. প্রতিবেলার খাবারে আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ এই তিনটি শ্রেণির খাবার অন্তর্ভুক্ত করে খাদ্যের ছয়টি উপাদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা।

২. প্রত্যেক শ্রেণির খাদ্য বয়স, লিঙ্গ ও জীবিকা অনুযায়ী সরবরাহ করা।

৩. দৈনিক ক্যালরি ৬০-৭০% শর্করা, ১০% আমিষ ও ৩০-৪০% স্নেহ জাতীয় পদার্থ থেকে গ্রহণ করা।

সুষম খাদ্য তালিকা

কতকগুলো নিয়ম মেনে একটি সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হবে। যথা-

১. প্রথমত খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো ব্যক্তিবিশেষের বয়স, কর্ম ও শারীরিক অব¯’vভেদে যে বিভিন্ন ধরনের হয় সেদিকে লক্ষ রেখে খাদ্য তালিকা c¯‘Z করা।

২. দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের তাপমূল্য বা ক্যালরি তাপ শক্তির পরিমাণ নিশ্চিতকরণ।

৩. খাদ্যে দেহ গঠনের ও ¶qci‡Yi উপযোগী আমিষ সরবরাহ করা।

৪. খাদ্যে যথোপযুক্ত ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির উপস্থিতি।

৫. বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান ও খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন। প্রথমে খাদ্যের gj বিভাগগুলো থেকে খাদ্য বাছাই করা। খাদ্য বাছাইয়ে বৈচিত্র্য থাকা।

৬. খাদ্য তালিকা c¯‘vZi সময় খাদ্যাভ্যাস m¤ú‡K সচেতন থাকা।

৭. ব্যক্তি ও পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির দিক ভেবে খাদ্য তালিকা c¯‘Z করা।

৮. ঋতু ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে খাদ্য তালিকা c¯‘Z করা।

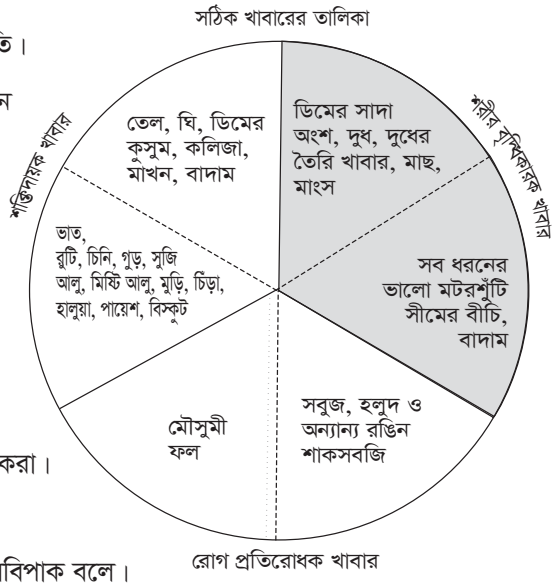

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা যা শিখলাম–

- বিপাকক্রিয়া চালানোর জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তাকে মৌলবিপাক বলে।
- ভিটামিন ও খনিজ লবণ আলাদা কোনো খাদ্য নয়। এগুলো অন্য খাদ্য উপাদান থেকে পাওয়া যায়।
- পানি দেহের জন্য অতি গুরুত্বcÝ উপাদান। পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান পানিতে `exfZ অবস্থায় দেহের সর্বত্র পরিবাহিত হয়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কিলোক্যালরি কী?

২. রিকেটস রোগের লক্ষণগুলো কী কী?

৩. ভিটামিন 'এ'-র অভাবে কী কী অসুবিধা দেখা দেয়?

৪. রক্তে হিমোগোবিনের প্রয়োজনীয়তা কী?

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোনটি দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে?

ক. পানি খ. ভিটামিন

গ. স্নেহপদার্থ ঘ. খনিজ লবণ

২. কোন ভিটামিনের অভাবে শিশুদের রিকেটস রোগ হয়?

ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন সি

গ. ভিটামিন ডি ঘ. ভিটামিন ই

নিচের Ab‡"Q`wU **পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও**

সুমি টক খেতে পছন্দ করে না। এমনকি সে সবুজ শাকসবজি এবং টমেটোও খায় না। ইদানীং দেখা যা"Q তার দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে।

৩. সুমির কী রোগ হয়েছে?

ক. স্কার্ভি খ. রিকেটস

গ. ম্যারাসমাস ঘ. কোয়াশিয়রকর

৪. উদ্দীপকের খাদ্যগুলোর অভাবে বয়স্কদের-

i. হাড় নরম হয়ে যায়

ii. ত্বক চুলকায় এবং ঘা হয়

iii. বুকের হাড় ও পাজরে ব্যথা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তালহা ইদানীং কিছুই খেতে চায় না। তার খাওয়ায় অরুচি এবং বমি বমি ভাব হয়। তার ত্বক খসখসে হয়ে h\‡"Q| ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার তাকে ডিম ও দুধ বেশি করে খেতে বললেন।

ক. খাদ্য কী?

খ. পুষ্টি বলতে কী বুঝায়?

গ. ডাক্তার তালহাকে উল্লিখিত খাবারগুলো খেতে বললেন কেন?

ঘ. ডাক্তারের পরামর্শমতে খাবার না খেলে পরবর্তীতে তালহার আরও কী সমস্যা হতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

২. নূরজাহান বেগম তার আট বছরের ছেলে বকুলের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। তিনি তার শারীরিক বৃদ্ধি ও m¯_Z\ নিশ্চিত করার জন্য তাকে বিশেষ ধরনের খাবার খাওয়াতে শুরু করেন। তবে তিনি নিজের এবং বকুলের বাবা, দাদা ও দাদীর খাদ্য তালিকায় ভিন্ন ধরনের খাবার রাখেন।

ক. কিলোক্যালরি কী?

খ. রাফেজ বলতে কী বুঝায়?

গ. নূরজাহান বেগম বকুলের খাদ্য তালিকা কীভাবে তৈরি করেন? বর্ণনা কর।

ঘ. নূরজাহান বেগমের পরিবারের সদস্যদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য নির্বাচনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র

আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ তা তোমরা জান। আরও জান একটি স্থানে যে সকল জড়বস্তু ও জীব থাকে সেগুলো নিয়েই সেখানকার পরিবেশ গড়ে ওঠে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ এই ভূ-মন্ডলে বিভিন্ন পরিবেশ রয়েছে। এসব পরিবেশকে আমরা স্বাদু পানি, লোনা পানি ও স্থল এই প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এই তিন রকমের পরিবেশের প্রত্যেকটিতে স্বতন্ত্র ধরনের অজীব ও জীব উপাদান থাকে।

এসব অজীব ও জীব উপাদানসমূহ একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তোমরা জান পরিবেশের জীব উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী। জীবন ধারণের জন্য এসকল উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বা¯‘তন্ত্রের উপাদান ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজাল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বা¯‘তন্ত্র শক্তিপ্রবাহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বা¯Ítন্ত্রের ভূমিকা বিশেষণ করতে পারব।

পাঠ ১ : বাস্তুতন্ত্র

পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জীব বসবাস করে। প্রতিটি বাসস্থানের বিভিন্ন এলাকায় জলবায়ু, আবহাওয়া ও অন্যান্য অজীব এবং জীব উপাদানের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এসব পার্থক্যের কারণে পৃথিবীজুড়ে স্থানভেদে বিচিত্র সব জীবের বসতি। বনজঙ্গালে তুমি যে ধরনের জীব দেখবে, পুকুরে বসবাসরত জীব তাদের থেকে ভিন্ন। এসব পরিবেশের জীব ও অজীব উপাদানের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। আবার একটি পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবন ধারণের জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এভাবে যে কোনো একটি পরিবেশের অজীব এবং জীব

উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া, আদান-প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশে যে তন্ত্র গড়ে ওঠে তাই বা¯‘তন্ত্র নামে পরিচিত।

পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবে e¯‘তন্ত্রের সকল উপাদানের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে। তোমার বাড়ি অথবা বিদ্যালয়ের কাছের বাগান একটি ছোট বা¯‘Zন্ত্রের উদাহরণ।

পাঠ ২ : বাস্তুতন্ত্রের উপাদান

তোমরা জেনেছ অজীব এবং জীব এই দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে বা¯‘তন্ত্র গঠিত।

অজীব উপাদান : বা¯‘তন্ত্রের প্রাণহীন সব উপাদান অজীব উপাদান নামে পরিচিত। এই অজীব উপাদান আবার দুই ধরনের। (ক) অজৈব বা ভৌত উপাদান এবং (খ) জৈব উপাদান। অজীব উপাদানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ, মাটি, আলো, পানি, বায়ু, তাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি। সকল জীবের মৃত ও গলিত দেহাবশেষ জৈব উপাদান নামে পরিচিত। পরিবেশের জীব উপাদানের বেঁচে থাকার জন্য এসব অজৈব ও জৈব উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

জীব উপাদান : পরিবেশের সকল জীবন্ত অংশই ব¯‘Zন্ত্রের জীব উপাদান। e¯‘Zন্ত্রের সকল জীব ও অজীব উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা তোমরা প্রথম পাঠে জেনেছ। e¯‘তন্ত্রকে কার্যকরী রাখার জন্য এ সকল জীব যে ধরনের ভূমিকা রাখে তার উপর ভিত্তি করে এসব জীব উপাদানকে (ক) উৎপাদক, (খ) খাদক এবং (গ) বিয়োজক এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) উৎপাদক : সবুজ উদ্ভিদ যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে তারা উৎপাদক নামে পরিচিত। যারা উৎপাদক তারা সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। যার উপর e¯‘Zন্ত্রের অন্যান্য সকল প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

(খ) খাদক বা ভক্ষক : যে সকল প্রাণী উদ্ভিদ থেকে পাওয়া জৈব পদার্থ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে বা অন্য কোনো প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে তারাই খাদক বা ভক্ষক নামে পরিচিত। e¯‘তন্ত্রে তিন ধরনের খাদক রয়েছে।

প্রথম স্তরের খাদক : যে সকল প্রাণী উদ্ভিদভোজী তারা প্রথম স্তরের খাদক। এরা তৃণভোজী নামেও পরিচিত। তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে ছোট কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে অনেক বড় প্রাণী। যেমন- গরু, ছাগল ইত্যাদি।

দ্বিতীয় স্তরের খাদক : যারা প্রথম স্তরের খাদকদেরকে খেয়ে বাঁচে। যেমন- পাখি, ব্যাঙ, মানুষ ইত্যাদি। এরা মাংসাশী বলেও পরিচিত।

তৃতীয় স্তরের খাদক বা সর্বোচ্চ খাদক : যারা দ্বিতীয় ¯—‡ii খাদকদের খায়। যেমন- K"Qc, বক, ব্যাঙ, মানুষ ইত্যাদি। এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রাণী আবার একাধিক ¯—‡ii খাবার খায়। এদেরকে বলা হয় সর্বভুক। আমরা যখন ডাল, ভাত, আলু ইত্যাদি খাই, তখন আমরা প্রথম ¯—‡ii খাদক। আবার আমরা যখন মাছ, মাংস খাই, তখন আমরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ¯—‡ii খাদক।

বিয়োজক : এরা পচনকারী নামেও পরিচিত। পরিবেশে কিছু অণুজীব আছে, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক যারা মৃত উদ্ভিদ ও মৃত প্রাণীর দেহের উপর ক্রিয়া করে। এসময় মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে মৃতদেহ ক্রমশ বিয়োজিত হয়ে নানা রকম জৈব ও অজৈব দ্রব্যাদিতে i পান্তরিত হয়। এসব দ্রব্যের কিছুটা ব্যাকটেরিয়া

ও ছত্রাক নিজেদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মৃতদেহ থেকে তৈরি বাকি খাদ্য পরিবেশের মাটি ও বায়ুতে জমা হয়। যা উদ্ভিদ পুনরায় ব্যবহার করে। এভাবে প্রকৃতিতে অজীব ও জীব উপাদানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়ে বা¯‘ সংস্থান সচল থাকে।

পাঠ ৩-৫ : বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ

প্রাকৃতিক পরিবেশে দু'ধরনের ev¯‘Z তন্ত্র রয়েছে। স্থলজ এবং জলজ ev¯‘ তন্ত্র। তোমরা এ পাঠে স্থলজ ev¯‘ তন্ত্র এবং জলজ ev¯‘Z তন্ত্র m¤ú‡K জানবে।

স্থলজ বাস্তুতন্ত্র

এ ধরনের ev¯‘Z তন্ত্র আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- বনভূমির ev¯‘Z তন্ত্র, মরুভূমির ev¯‘Z তন্ত্র ইত্যাদি। বনভূমির ev¯‘Z তন্ত্রের উদাহরণ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের বনভূমি অঞ্চলের কথা বলতে পারি। বাংলাদেশের বনভূমি আঞ্চলকে প্রধান দুটো অঞ্চলে ভাগ করা হয়। (ক) সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল এবং (খ) খুলনার সমুদ্র DcKjeZx সুন্দরবন অঞ্চল। নিচে সুন্দরবনের ব¯‘ তন্ত্রের সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সুন্দরবনের ebfwg অন্যান্য অঞ্চলের বনভূমি থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের। খুলনা জেলার দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল থেকে ভিতরের দিকে এ অঞ্চল বেশ কয়েক মাইল পর্যন্ত we¯—Z| জোয়ার-ভাটার কারণে এ অঞ্চলের মাটির লবণাক্ততা বেশি, কাজেই লবণাক্ত পানি সহ্য করার ¶gZvm¤úb উদ্ভিদই এ বনাঞ্চলে জন্মে। সুন্দরবনের বনাঞ্চল ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত। এ বনের মাটি বেশ কর্দমাক্ত। কাজেই এর ভিতর দিয়ে সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে না। তাই এখানকার উদ্ভিদের gj মাটির নিচে না গিয়ে খাড়াভাবে মাটির উপরে উঠে আসে। এসব g‡ji আগায় অসংখ্য ছিদ্র থাকে। যার সাহায্যে উদ্ভিদ শ্বসনের জন্য বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে। এ বনের উলেখযোগ্য উদ্ভিদ হলো সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, গোলপাতা ইত্যাদি। এরা এ বনের উৎপাদক। পোকামাকড়, পাখি, মুরগি, হরিণ এ বনের প্রথম ¯—‡ii খাদক। বানর, K"Qc, সারস ইত্যাদি দ্বিতীয় ¯—‡ii খাদক। এ বনের তৃতীয় ¯—‡ii খাদকদের মধ্যে রয়েছে বাঘ, শূকর ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে বানর সর্বভুক। এ বনের উলেখযোগ্য প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতা বাঘ, বানর, চিত্রল হরিণ, বন্য শূকর, কুমির, নানা ধরনের সাপ, পাখি এবং কীটপতঙ্গ।

জলজ ব¯‘ তন্ত্র

জলজ বা¯‘ তন্ত্র প্রধানত তিন ধরনের। যথা-

১. পুকুরের ev¯‘ তন্ত্র
২. নদ-নদীর ev¯‘ তন্ত্র
৩. সমুদ্রের ev¯‘ তন্ত্র

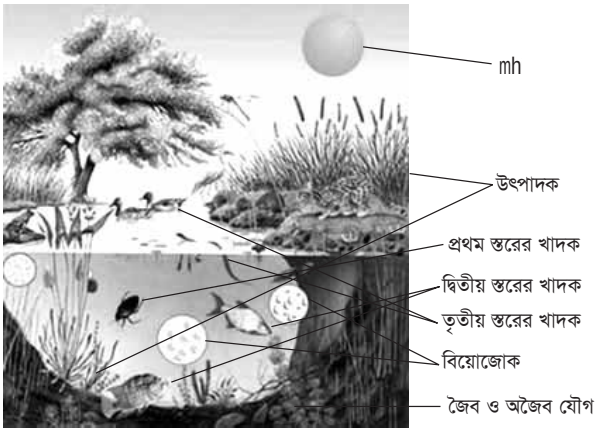

চিত্র ১৪.১ : একটি পুকুরের ev¯‘ তন্ত্র

তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে একটি পুকুরের e¨¯'Zন্ত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। স্বাদু পানির একটি ছোট পুকুর জলজ e¨¯'ms¯'v‡bi একটি ¯^qsm¤úY উদাহরণ। পুকুরে রয়েছে অজীব ও জীব উপাদান। অজীব উপাদানের মধ্যে পুকুরে রয়েছে পানি, দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং কিছু জৈব পদার্থ। এসব উপাদান জীব সরাসরি ব্যবহার করতে সক্ষম। জীব উপাদানের মধ্যে আছে উৎপাদক, প্রথম ¯—‡ii খাদক, দ্বিতীয় ¯—‡ii খাদক, তৃতীয় ¯—‡ii খাদক ও নানা রকমের বিয়োজক। পুকুরের ব¨¯'সংস্থানের উৎপাদক n‡"Q নানা ধরনের ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ যেমন ক্ষুদেপানা, এগুলোকে ফাইটোপাঙ্কটন বলা হয়। ভাসমান বড় উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে কচুরীপানা, শাপলা ইত্যাদি। ভাসমান ক্ষুদ্র উদ্ভিদ যেমন পুকুরের পানিতে রয়েছে তেমনি রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক প্রাণী। যারা জু-পাঙ্কটন নামে পরিচিত। বিভিন্ন প্রকার জলজ কীটপতঙ্গ, ছোট মাছ, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি যারা উৎপাদকদের খায় তারা প্রথম ¯—‡ii খাদক নামে পরিচিত। আবার এদেরকে যারা খায় আরও একটু বড় মাছ এরা দ্বিতীয় ¯—‡ii খাদক। এদেরকে আবার যারা খায় যেমন কচ্ছপ, বক, ব্যাঙ এরা তৃতীয় ¯—‡ii খাদক। পুকুরে মৃত জীবের উপর ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বিয়োজকের কাজ করে। বিয়োজিত দ্রব্যাদি আবার পুকুরের উৎপাদক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

পাঠ ৬ ও ৭ : খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্যজাল

তোমরা জেনেছ e¨¯'তন্ত্রে কোনো জীবই এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য একে অন্যের উপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। জীবের বেঁচে থাকার জন্য তার চারপাশের mg¯— উপাদান নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে। এ পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস সূর্যের আলো। e¨¯'Zন্ত্র উৎপাদক হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ। তোমরা জেনেছ প্রাথমিক ¯—‡ii খাদক খাদ্যের জন্য উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল। আবার দ্বিতীয় ¯—‡ii খাদক নির্ভরশীল প্রাথমিক ¯—‡ii খাদকের উপর। তৃতীয় ¯—‡ii খাদক খায় দ্বিতীয় ¯—‡ii খাদকদেরকে। এভাবে একটি e¨¯'Zন্ত্রে সকল জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) পুষ্টি চাহিদার দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত। ফলে গড়ে ওঠে L¨v`¨k•Lj| তাহলে দেখা h¨‡"Q উদ্ভিদ উৎস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির যে স্থানান্তর ঘটে তাই খাদ্যশৃঙ্খল ।

খাদ্যজাল

e¨¯'তন্ত্রে অসংখ্য খাদ্যশৃঙ্খল থাকে তা নিশ্চয়ই দেখেছ। এসব খাদ্যশ•Lল কোনো wew"Qb ঘটনা নয়। বরং বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল ci¯úi m¤úKh³| খাদ্যশৃঙ্খলের এ ধরনের সংযুক্তিকে খাদ্য জাল বলা হয়।

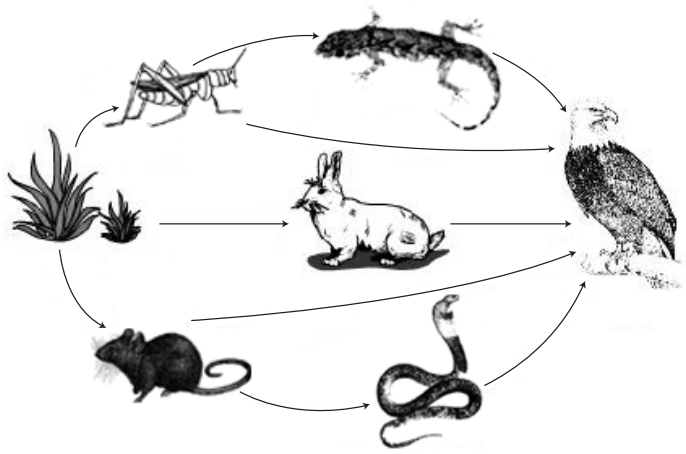

চিত্র ১৪.২ : খাদ্যজাল

পাঠ ৮ ও ৯ : বাস্তুতন্ত্র শক্তি প্রবাহ

তোমরা জেনেছ পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল জীবই সূর্যের আলোর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ জীবজগতের সকল শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্যের যত আলো পৃথিবীতে আসে তার মাত্র শতকরা ২ ভাগ সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়া চলার সময় সবুজ উদ্ভিদ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক মৌল যেমন- পানি (হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন), নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, আয়রন, সালফার ইত্যাদি ব্যবহার করে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জড় ও জীবজগতের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হয়।

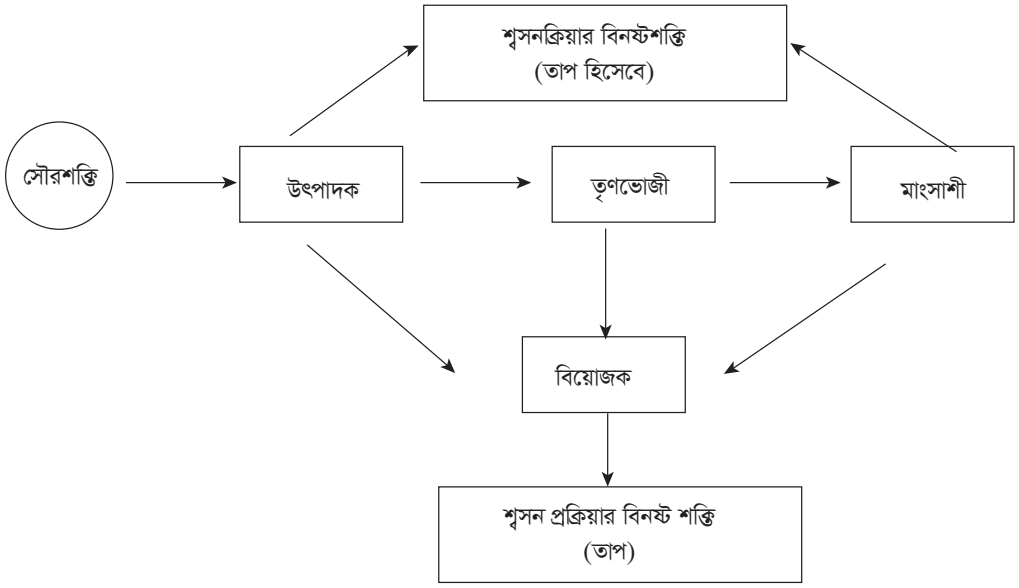

ev¯‘Zন্ত্রে শক্তির একমুখী এবং পদার্থের চক্রাকার প্রবাহ

সবুজ উদ্ভিদের মাধ্যমেই সূর্যশক্তি থেকে সৃষ্ট রাসায়নিক শক্তি বিভিন্ন প্রাণীতে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। উৎপাদক থেকে আরম্ভ করে m‡ev”P খাদক পর্যন্ত শক্তি রূপান্তরের সময় প্রতিটি ধাপে শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। তাহলে দেখা hv‡”Q উৎপাদক থেকে শক্তি যায় তৃণভোজী প্রাণীর দেহে। সেখান থেকে দ্বিতীয় ¯—‡ii খাদক এবং দ্বিতীয় ¯—‡ii খাদক থেকে যায় m‡ev”P খাদকে। এভাবেই শক্তি প্রবাহ চলতে থাকে। প্রতি ¯—‡i শক্তি হ্রাস পেলেও বিযোজক যখন বিভিন্ন মৃত জীবে বর্জ্য পদার্থে বিক্রিয়া ঘটায় তখন অজৈব পুষ্টিদ্রব্য পরিবেশে মুক্ত হয়ে পুষ্টিভান্ডারে জমা হয়। যা আবার সবুজ উদ্ভিদ কাজে লাগায়। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে ev¯‘ msস্থানে পুষ্টিদ্রব্য চক্রাকারে প্রবাহিত হয় এবং শক্তিপ্রবাহ একমুখী।

পাঠ ১০ : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের f‚মকা

পরিবেশে ev¯‘Zন্ত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। যে কোনো পরিবেশে ev¯‘তন্ত্র মোটামুটিভাবে স্বনিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতিতে যে কোনো জীবের সংখ্যা হঠাৎ করে বেশি বাড়তে পারে না। প্রতিটি জীব একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে এরা ci¯úi ci¯ú‡ii সাথে সম্পর্কযুক্ত। সহজে এর কোনো একটি অংশ একেবারে শেষ হতে পারে না।

কোনো একটি পরিবেশে বিভিন্ন ¯—‡ii জীব সম্প্রদায়ের সংখ্যার অনুপাত মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে। পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটলেও বহু দিন পর্যন্ত প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। এসো একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা এ বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করি। মনে কর যে কোনো একটি বনে বাঘ, হরিণ, শূকর ইত্যাদি বাস করে। এ বনে বাঘের খাদ্য হলো হরিণ ও শূকর। হরিণ ও শূকরের সংখ্যা বেড়ে গেলে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কারণ বাঘ প্রচুর খাদ্য পাবে। আবার বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে হরিণ ও শূকরের সংখ্যা কমে যাবে। হরিণ ও শূকরের সংখ্যা কমে গেলে বাঘের খাদ্যাভাব দেখা দিবে। ফলে বাঘের সংখ্যাও কমে যাবে। আবার বাঘের সংখ্যা যদি কমে যায় তবে হরিণ ও শূকরের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এভাবে হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে একটি এলাকার ev¯' Zন্ত্রের ভারসাম্য প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

কাজ : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ev¯' Z‡ন্ত্রi fvgKv m¤ú‡K জানা।

দল গঠন কর। যে কোনো একটি পরিবেশের ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা হয় তার উদাহরণ নোট খাতায় তৈরি কর। শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম–

- যে কোনো একটি পরিবেশের জড় এবং জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান-প্রদান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠে ev¯' Zন্ত্র।
- অজীব এবং জীব এই দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে ev¯' Zন্ত্র গঠিত।
- উদ্ভিদ উৎস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির যে স্থানান্তর ঘটে তাই Lv`¨k•Lj|
- প্রকৃতিতে বিভিন্ন Lv`¨k•Lj ci¯úi m¤úKh³। Lv`¨k•L‡ji এ ধরনের সংযুক্তি খাদ্যজাল নামে পরিচিত।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. যে সম¯— প্রাণী ——— তারা প্রথম ¯—রের খাদক।

খ. বা¯' Zন্ত্রের প্রাণহীন সব উপাদান ——— উপাদান নামে পরিচিত।

গ. প্রকৃতিতে জীব বিভিন্ন ——— মাধ্যমে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ঘ. প্রকৃতিতে অজীব ও জীব উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়ে ——— সচল থাকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক) প্রকৃতি কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে আলোচনা কর।

খ) চিত্রসহকারে একটি পুকুরের ev¯' Zন্ত্র বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি প্রথম ¯Í‡ii খাদক?

ক. ফাইটোপ্ল্যাংকটন খ. শামুক

গ. বাঘ ঘ. বক

২. নিচের কোন খাদ্যশৃ•Lলটি সঠিক?

ক. dvB‡Uvপ্ল¨vsKUb ⟶ ছোট মাছ ⟶ জুয়োপ্ল্যাংকটন

খ. ফল ⟶ পতঙ্গ ⟶ পাখি

গ. ঘাস ⟶ ক"Qপ ⟶ ছোটমাছ

ঘ. ক্ষুদেপানা ⟶ মাছ ⟶ শামুক

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

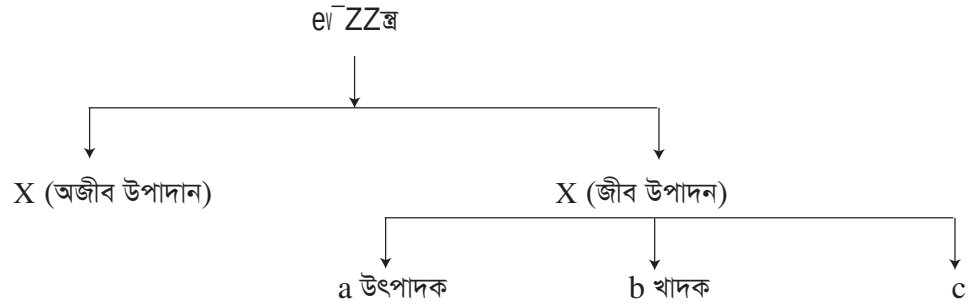

৩. নিচের কোনটি c এর অন্তর্ভুক্ত?

ক. ফাইটোপ্ল্যাংকটন খ. জুয়োপ্ল্যাংকটন

গ. ব্যাকটেরিয়া ঘ. কীটপতঙ্গ

৪. উপরের ছকে-

i. X এর উপর Y নির্ভরশীল

ii. a এর উপর b নির্ভরশীল

iii. a ও c ci¯úi নির্ভরশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফাহিম একটি বনে বেড়াতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছপালার মাঝে বিচিত্র ধরনের প্রাণীর উপস্থিতি লক্ষ করল। এদের মধ্যে ছিল খরগোশ, হরিণ, বানর, সারস, বাঘ, শূকর ইত্যাদি প্রাণী। সে খেয়াল করল বনের একটি অংশে বড় বড় গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে আর সে অংশে ঐসকল প্রাণীর উপস্থিতি খুবই কম।

ক. e/¯ZZন্ত্র কী?

খ. বিয়োজক বলতে কী বুঝায়?

গ. ফাহিমের দেখা জীবগুলো দিয়ে একটি খাদ্যশৃ•Lখল তৈরি করে শৃ•Lখলটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বড় বড় গাছপালা কেটে ফেলা অংশে প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২.

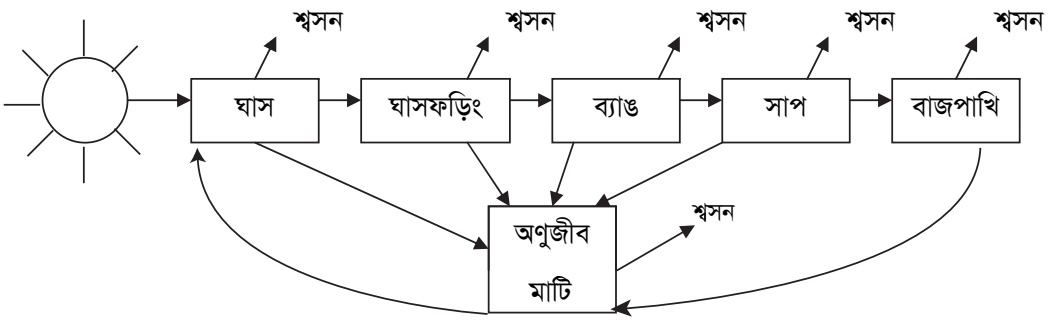

ক. জৈব উপাদান কী?

খ. খাদ্যজাল বলতে কী বুঝায়?

গ. উপরের শৃঙ্খলটিতে শক্তিপ্রবাহ কীভাবে চলে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে পুষ্টিপ্রবাহের চক্রটি কিরূপ হবে? বিশ্লেষণ কর।

প্রজেক্ট : পরিবেশের কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ কর। পর্যবেক্ষণ শেষে এসব খাদ্যশৃঙ্খল ব্যবহার করে পোস্টার কাগজে খাদ্যজাল তৈরি কর এবং শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

সমাপ্ত

২০১৩
শিক্ষাবর্ষ
৮–বিজ্ঞান

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম কখনও নিষ্ফল হয় না

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :